নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

পঞ্চম খণ্ড—১২৯৪।

২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৬১ নং মস্‌জিদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট, সমর্থকোষ প্রেসে,

শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য তিন টাকা মাত্র।

পঞ্চম খণ্ড নব্যভারতের সূচিপত্র।

(১২৯৪)

নব্যভারত

পঞ্চম খণ্ড।

নব্যভারতের কথা।

চারি বৎসর হইল, দেবোত্তম আর্য্যভূমি ভারতবর্ষকে আমরা নব্যভারত নামে অভিহিত করিয়াছি—চারিবৎসর অতীত হইল,-এই ক্ষুদ্র পত্রিকা কঠোর কর্ত্তব্য পথে দণ্ডায়মান হইয়াছে। দেখিতে না দেখিতে, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, ব্রত উদ্‌যাপিত হইতে না হইতে, চারিটী বৎসর—অনন্ত কালের অনন্ত স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে! সুখ এবং দুঃখ, আনন্দ এবং বিষাদ,—সকলই অনন্তের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে। শূন্য প্রাণে অবসন্ন হৃদয়ে আমরা কেবল সময়ের ঘোর ফের পরীক্ষা করিতেছি। কিন্তু বিধাতার লীলা কে বুঝিবে? আমাদের সকল পরীক্ষা শেষ হইতে না হইতেই,—কামনা ফুরাইতেছে—স্বপ্ন ভাঙ্গিতেছে। আমরা অবাক হইয়া বসিয়া রহিয়াছি। তবুও সময় ফেরে না—অবিরাম-গতি—অবিশ্রান্ত বেগেই অনন্তের পথে চলিয়াছে!!

মহাত্মা কটন সাহেবের প্রসাদে নব্যভারত নামের প্রতি আর লোকের বীতরাগ নাই। তিনি দুই বৎসর হইল বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ভারত এখন নববেশ ধারণ করিয়াছেন। এখন অনেকেই এই নামের পক্ষপাতী। সুতরাং আমাদের একটী কথায় সুফল ফলিয়াছে। মহাত্মা কটনের নাম সেই সঙ্গে সঙ্গে এদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। কালের গতি কে বুঝিবে! একের ছিন্ন-আশার স্বপ্নে অপরের গৌরব! কালের মহিমা কে বুঝিবে!!

এই চারি বৎসর ভারতবর্ষে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে। মানুষের কাজে শত দোষ, সহস্র কালিমা থাকিতে পারে, তাতে কিছু আসিয়া যায় না। সহস্র কালিমা, সহস্র কণ্টক বা সহস্র কলঙ্ক থাকিলেও, আকাশের চাঁদ বা কাননের গোলাপ, মৃণালের পদ্ম বা বসন্তের কোকিল, মানুষের নিকট চিরকাল আদরের জিনিস! সেইরূপ ধর্ম্ম কথা ও ধর্ম্মান্দোলন, স্বার্থযুক্ত হইলেও, চিরকাল আদরের। দেশ-সংস্কার বা দেশোদ্ধার, একতা বা সাম্য, স্বাধীনতা বা মৈত্রী, চরিত্র, নীতি ও ধর্ম্মের উৎকর্ষ ভিন্ন এ সকল

সুদূর-পরাহত। চারি বৎসর পূর্ব্বে আমরা একথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি—এই চারি বৎসর আর্য্যধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের জন্য দিগন্তব্যাপী আন্দোলন উঠিয়াছে! সম্প্রদায় বিশেষ দুঃখিত হইতে পারেন, কিন্তু আমরা এই শুভ লক্ষণের ভিতরে ভারতের উন্নতির এক মহতী শক্তিশালী বীজ নিহিত বলিয়া বুঝিতেছি। সুতরাং আমরা আশাতে আরো বুক বাঁধিতে পারিতেছি। এ সম্বন্ধে নব্যভারতের ক্রন্দন বৃথা হয় নাই।

ভারতে কি কেবল ধর্ম্মের দুন্দুভি-নিনাদ ধ্বনিত হইতেছে? না—কেবল তা নয়। গত দুই বৎসর ভারতে মিলনের এক অপরূপ স্বর্গীয় ছবি আমরা দেখিয়াছি। ভারতের জাতীয় মহাসমিতির মহা দুই অধিবেশনের পর কে আর সন্দেহ করিবেন যে, এই ভারতে জাতীয় মিলন অসম্ভব? এক তানে, এক তন্ত্রীতে, একভাবে, এক মদে আজ ভারত মাতোয়ারা। এখনও অসম্পূর্ণ আছে, তা জানি। এখনও নিম্নশ্রেণীর উত্থান হয় নাই, এখনও দরিদ্রের চক্ষের জল ঘুচে নাই, সে সব জানি। কিন্তু সকলই সময়-সাপেক্ষ। জাতীয় অভ্যুত্থানের এক বিজয় ভেরী ভারতে বাজিয়া উঠিয়াছে। যুবা বৃদ্ধ, জ্ঞানী মানী—আজ একপ্রাণ, একমন! এই একপ্রাণতায় সহৃদয়তা, চরিত্রবল ও ধর্ম্মবল যখন সংযোজিত হইবে, তখন না জানি কি অপূর্ব্ব শ্রী হইবে,—না জানি কি এক অপূর্ব্ব শ্রীতে আবার ভারত সজ্জিত হইবে! নব্যভারতের আশার কথা কেবল কুহেলিকা নয়, ইহাও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

তারপর জাতীয় ভাষা। ভাষার একতা যে জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথায় কাহারও আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই ভাষা যে জাতীয় ভাষা হওয়াই চাই, একথাতে অনেকের আজও গভীর সন্দেহ আছে। আছে, থাকুক। কিন্তু এই চারি বৎসরে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কত উন্নতি হইয়াছে, সংক্ষেপে ব্যক্ত করা যায় না। বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র আজ ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদরনীয় হইয়া উঠিয়াছে। দুই দশ জন ইংরাজি-ঘেঁষা লোকের কথা তুলিও না, আপামর সাধারণ লোক যে বাঙ্গলা ভাষার আদর করিতে শিখিতেছে, এই চারি বৎসরের সাময়িক পত্রের উন্নতিতেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যে প্রকার দ্রুত গতিতে এই ভাষার উন্নতি হইতেছে, কালে এই ভাষা যে ভারতের মিলনের মধ্যবিন্দু হইবে, তাতে সন্দেহ রাখা দূরদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে আর উচিত নয়। সংস্কৃতের চর্চ্চা অনেক কমিয়া গিয়াছিল, এই চারি বৎসরে অনেক বাড়িয়াছে, জাতীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি একান্ত অনুরাগ দেখিয়া এখন গবর্ণমেণ্ট টোলের সাহায্য করিতে অগ্রসর! সংস্কৃতভাষার অমৃতময় অনন্ত প্রস্রবণ যে ভাষার প্রাণ, সেই মধুর হইতেও মধুর বাঙ্গালা ভাষা কালে যে ভারতের অস্থি মজ্জা গ্রাস করিবে, আমাদের এখনও আশা আছে। তাই এই ভাষার উন্নতির জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছি। নিন্দা, তিরস্কার মুষলধারার ন্যায় বর্ষিত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তবুও এই ভাষার উন্নতি-চিন্তার বিরাম নাই। লক্‌, লক্‌, লক্‌ করিয়া—সর্ব্বগ্রাসিনী হুতাশনের ন্যায়, রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে বিস্তৃতি লাভ করিবে যে বাঙ্গালা ভাষা, তাহার প্রতি আজও যিনি বীতস্পৃহ, তিনি হিতৈষী হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তিনি

কখনও সহৃদয় প্রেমিক নহেন। নব্য-ভারত বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে আজও আশায় প্রদীপ্ত। কিন্তু সমগ্র দেশ একথায় আজও সায় দেয় নাই। তাই দুঃখ।

কিন্তু এ সকলও আশার অবান্তরিক আয়োজন মাত্র। নব্যভারতের লক্ষ্য যাহা, তাহা এখনও বহু দূরে!—শতাব্দীর পর শতাব্দী, তারও পরে। এখন আয়োজনের প্রয়োজন, তাই এখন আয়োজনের কথা লই য়াই আলোচনা করিয়া থাকি। লক্ষ্য-সিদ্ধি এখনও বহু দূরে।

লক্ষ্য এখনও ঘোরতমা গভীরা মহা আঁধারে সুষুপ্ত। এখন কেবল পূর্ব্বাভাস মাত্র। পূর্ব্বাভাসে যে প্রকার আয়োজন হইতেছে, ইহা কিছুই নয়। ইহাও বালকের ক্রীড়া মাত্র। নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা নাই, অথচ তাদের উত্থানের কথা,—প্রেম নাই মিলনের কথা,—প্রকৃত জ্ঞান চর্চা নাই জাতিত্বের কথা,—চরিত্র বল ও নীতি বল নাই, স্বাধীনতার কথা;—এ সকলও বালকের ক্রীড়া। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের পরীক্ষা শেষ হইতে না হইতেই কামনা ফুরাইতেছে। কত দুঃখে দিন কাটাইতেছি! এখনও যে লোক পাশব বলের প্রতীক্ষা করিতেছে, চারিত্র্য শাসনের পরিবর্ত্তে পাশব শাসনের আয়োজন করিতে চাহিতেছে, ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, প্রেম এখনও অনেক দূরে। সংসারের কঠোর যুদ্ধে মানুষকে বিজয়ী করিতে পারে—একমাত্র প্রেম। প্রেম আত্ম-সংযমের মূল মন্ত্র, প্রেম শত্রু পরাজয়ের মহা অস্ত্র। কে পর, কে মিত্র, কে আপন, কে পর?—প্রেমের নিকট সব একাকার। প্রেমের অভ্যুদয় ভিন্ন আমিত্ব ঘুচে না, স্বার্থ নিবে না, মহাজ্ঞান জন্মে না। প্রেমের অভ্যুদয় না হইলে জীবনাহুতি দিতে কেহই পারে না। তাই ত কেহই গা ঢালে না। তাই ত সকলেই হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, কিন্তু কিছুতেই মজে না। সভায় অসার বক্তৃতা—এখন দেশোদ্ধারের মূল অস্ত্র, সংবাদ পত্রে হৃদয়-শূন্য অত্যাচার-কাহিনী লেখা এখন জাতিত্ব-গঠনের অমোঘ ঔষধ। সকলেই প্রাণ দানের কথা বলে এবং লিখে, কিন্তু কেহই প্রাণ দান করে না। সকলেই বলে প্রেম নাই,— কিন্তু নিজে কেহই প্রেমিক হইতে চায় না। সুখ বিসর্জ্জন, আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ—এসকল যেন নিজের জন্য নয়, কেবল অন্যকে বুঝাইবার জন্য,—কেবল সভায় বক্তৃতার জন্য! বিসর্জ্জন—আত্মত্যাগ—স্বার্থত্যাগ ভিন্ন কি কখনও কোন দেশ জাগিয়াছে? কিন্তু সে সকল এখনও সুদূর-পরাহত। ডিনার-ক্লবের নৃত্য গীতে, বক্তৃতা সভার বৃথা করতালিতে, উচ্চ প্রশংসার কুহক-মন্ত্রে এখনও হিতৈষী দলের মন প্রাণ মন্ত্রমুগ্ধ। এখনও আত্মত্যাগের কথা—বাতুলের ক্রীড়া। তাই বলিতেছিলাম,—লক্ষ্য-সিদ্ধি এখনও অনেক দূরে। আত্মত্যাগ শিখাইতে নব্যভারতের জন্ম, তাহা এখনও শত শত বৎসরের পশ্চাতে লুক্কায়িত। আশায় নিরাশা,—সুখে দুঃখ জাগিবে না তবে কেন, বলত?

আমাদের এক একবার ইচ্ছা হয়, এ স্বার্থ-কলঙ্কিত মুখ অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলি। মরণকে কতবার তাই উল্লাসে আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু মরণ কিছুতেই আমাদের আব্দার শুনে না। এত নিরাশা, এত ক্রন্দন, এত বুক-পোড়া হাহাকার—তবুও পোড়া প্রাণ দেহ-মমতা, সংসার-মমতা ছিঁড়িতে পারে না। বিধাতার লীলা কে খণ্ডন করিবে!

মরিতে যাইয়াও মরা হয় না। এতই সংসার বিলাস-মমতা? কত মরণ আসে, আবার কত মরণ নিবিয়া যায়। তোমরা যে আমাদের মরণের জন্য চেষ্টা করিতেছ, সে ত মঙ্গলের জন্যই! তাহা বুঝিয়াছি। থাকিয়া ফল কি, বাঁচিয়া লাভ কি! যদি অহেতুকী প্রেমই না পাইলাম,—স্বার্থ ভুলিয়া যদি জগতের হইয়া যাইতে না পারিলাম—তবে জীবন ধারণ ত বৃথাই! তাই আমরা আরো মরণ, আরো অন্ধকার চাই। কিন্তু পাই কই? যে আসক্তি! এই দারুণ আসক্তির সেবা করিতে, এ শুষ্ক জীবন ধারণ করিয়া কি হইবে? তাই বন্ধু,—পায়ে ধরি, শত মরণের শত বজ্র সঘন নিক্ষেপ কর।—আমাদের কাছে তোমার ঐ হিংসার-বান নিক্ষেপ পুষ্প বর্ষণ! আমরা মরিতেই চাই। আমরা অন্ধকার হইতে আরো অন্ধকারেই যাইতে চাই। হিংসার আলোকে আর কাজ নাই! আমরা সব মায়া ভুলিতে চাই। ভালবাসা, মায়া, মোহ—সব অন্ধকার হউক। আত্মীয় বন্ধু সব পর, আরো পর, আরো পর, আরো পর হউক। যে কাছে ছিল, সে ঐ হিংসার কুটচাহনি লইয়া আরো দূরে, আরো দূরে চলিয়া যাউক। আমরা আসক্তিহীন মহা বৈরাগ্যের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আত্মত্যাগের মোহিনী মন্ত্রে দীক্ষিত হই! আমাদের ধারে নাই বা বসিলে, আমাদের কথা নাইবা শুনিলে! চাই না—তোমাদের পবিত্র দেহ মনে আমাদের কলঙ্ক ঢালিতে চাই না! মরণ, মরণ, কেবল মরণ! দুঃখ, দুঃখ, কেবল দুঃখ! অশ্রু, অশ্রু, কেবল অশ্রুপাত! আঁধার, আঁধার, কেবল আঁধার! দুঃখে থাকিয়া, অশ্রুতে ভাসিয়া, আঁধারে আমিত্ব ডুবাইয়া—স্বার্থ নিরাইয়া জগতের হইতে না পারিলে কিছুতেই আর নিস্তার নাই।

নব্যভারত আজও যে আত্মত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হয় নাই, একথা কি আবার লিখিয়া বুঝাইতে হইবে? এখনও আপনার উজ্জ্বল কলেবরের প্রতি দৃষ্টি, এখনও প্রশংসার দিকে কর্ণ, এখনও অবস্থার প্রতি মনোযোগ! এখনও হিংসার প্রবল পরাক্রম! কি ভণ্ডামী!! আমরা এই চাই,—কেহ আমাদের কথা শুনিতে চাহিবে না; কেহ এ দিকে করুণার কটাক্ষপাত করিবে না, কেহ প্রশংসার স্তুতি ধরিবে না, কেহ ভালবাসার আদর করিবে না;—সকলের ঘৃণা, সকলের অনাদর স্বত্তেও, ঐ মরণের কোলে বসিয়া দিবানিশি দেশের মঙ্গল চিন্তা করিব;—প্রাণের কথা গাইব! না থাকিয়া, থাকিব! মরিয়া বাঁচিব! রূপ না দেখিয়া মজা, ভালবাসা না পাইয়া ভালবাসা,—স্বার্থহীন হইয়া জীবন ভাসান—নব্যভারতের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য-সিদ্ধি এখনও বহুদূরে। অহেতুকী প্রেমের সাধনায় সিদ্ধি লাভ এখনও বহু শতাব্দীর পশ্চাতে! তাই নব্যভারতের হাহাকার এবং বিষাদ-সঙ্গীত। তাই এখনও পরাধীনতার তীব্র কষাঘাত নব্যভারতের অস্থি মজ্জাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে! নব্যভারত যদি বৈকুণ্ঠবাসী হইত, তবে এ হাহাকার থাকিত না। শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান! আগুন, আগুন, আগুন! আঁধার, আঁধার, আঁধার!—মহাবৈরাগ্যের আগ্নেয়মন্ত্রে মাতোয়ারা না হইলে নব্যভারতের কিছুতেই মঙ্গল নাই। স্বার্থত্যাগ বা আত্মত্যাগের মহাব্রত এখনও অন-উদ্যাপিত রহিয়াছে। অমৃত নব্যভারতের তাই আজও পৃথিবীতে অবস্থিতি। বিধাতার লীলা কে

বুঝিবে? কিছুতেই মায়াজাল ছিন্ন হয় না!! কিছুতেই দেহ-মমতা,জীবন-মমতা,—আপন মমতা ছিঁড়িয়া নব্যভারত জগতের হইতে পারিল না। এ দুঃখ কে বুঝিবে?

বেদান্তসার।

চিত্তবৃত্তি বিন্যাসের নাম উপাসনা। উপাসনা আত্মজ্ঞান সাধনের সোপান। কোন প্রকার সকাম বা নিষ্কাম কর্ম্মে মোক্ষ নাই। নিষ্কাম কর্ম্ম অন্যতর সোপান। মোক্ষ কেবল জ্ঞানে—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-অদ্বৈত জ্ঞানে। প্রার্থনা, উপাসনা নহে। প্রার্থনা, দ্বৈতজ্ঞান পরিচারক। প্রকৃতি, আত্মা ও পরমাত্মা সকলই ব্রহ্ম—"ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ"। প্রথমে সকাম কর্ম্ম করিবে, তাহার পর নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে, তাহার পর সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমাধিস্থ হইবে।

অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তা।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি হয়, আর জন্ম হয় না। দেবতাদেরও পুনর্জন্ম আছে, কর্ম্মফল কাটে নাই। ব্রহ্মজ্ঞানীর পুনর্জন্ম নাই।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্চিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে।

যদাপশ্য পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম যোনিং তদাবিদ্বান পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।

মন অবলম্বন শূন্য থাকে না। শুভাবলম্বন না পাইলে অসৎ কর্ম্মে ধাবমান হইবে, এজন্য অনুক্ষণ উপাসনা কর্ত্তব্য। মন ব্রহ্মপরায়ণ হইলে চক্ষু মন্দ দেখিবে না, কর্ণ মন্দ শুনিবে না। পদার্থ ইন্দ্রিয়ের সম্মুখীন হইলেও মনের অভাবে প্রত্যক্ষ হইবে না।

উপাসনা দ্বিবিধ, যজ্ঞ ও ধ্যান। কোন পদার্থকে দান করার নাম যজ্ঞ। যে যত উৎকৃষ্ট পদার্থ দান করিতে পারে, তাহার যজ্ঞ তত ভাল। কামনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সংসারে মানুষের কিছু নাই। সর্ব্ব কামনা ব্রহ্মকে উৎসর্গ করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। যে করে, সেই সন্যাসী। যজ্ঞ সাধন করিতে হইলে, বাক্য ও মন, এ উভয়ের সংস্কার আবশ্যক। একচক্র-রথের ন্যায় ইহাদের অন্যতর যজ্ঞ সাধনে সমর্থ নহে। পরন্ত চেষ্টা করিলে আপনিও বিনষ্ট হয়।

প্রবৃত্তি না হইলে কর্ম্ম হয় না। কামনা-ত্যাগ নিবৃত্তি মাত্র, সুতরাং উহা কর্ম্ম নহে। সকল প্রবৃত্তির সম্যক পরিচালনা করিতে হইবে; এ উপদেশ ভাল নহে। প্রবৃত্তির উৎকর্ষণ পাশ্চাত্য উপদেশ। প্রবৃত্তি মার্গে-স্বর্গ আছে, মোক্ষ নাই। জ্ঞানী লোক স্বর্গের আকাঙ্খা করে না। মূর্খের প্রার্থনা স্বর্গলাভ। মোক্ষলাভ নিবৃত্তি মার্গে। প্রবৃত্তি যত চালিত হইবে, বাসনা তত বাড়িবে, বাসনা হইতেই পুনর্জন্ম। প্রবৃত্তি যত নিরাশ হইবে, মোক্ষ তত নিকট হইবে। প্রবৃত্তির নিরাশ ইহাই উপনিষৎসিদ্ধ। ইহাও বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ।

যে যেমন সাধনা করে, তাহার তেমনি গতি হয়। যে ব্রহ্ম সাধনা করে, সে ব্রহ্মর

লাভ করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে দেবত্ব সাধন করে, তাহার দেবযান হয়, যে বাসনার সাধন করে, সে পিতৃযান লাভ করে। কর্ম্মমার্গে স্বর্গ, জ্ঞান মার্গে দেবত্ব ও ব্রহ্মত্ব। পূর্ণজ্ঞানে ব্রহ্মত্ব, অপূর্ণ জ্ঞানে দেবত্ব। একবার দেবত্ব লাভ করিলে আর নীচ জন্ম হয় না। উত্তরোত্তর পূর্ণজ্ঞান লাভ হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। স্বর্গ ক্ষয়ে কর্ম্মী পুরুষ পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্ম লাভ করে।

মৃত্যুর পরে কি, সবাই জিজ্ঞাসা করে; জন্মের পূর্ব্বে কি, কেহ জিজ্ঞাসা করে না। অথচ উভয়ই কুটিল রহস্য। আত্মার অমরত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন, অনন্তত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা আত্মাকে সৃষ্ট বলেন বা দ্বৈতবাদ স্বীকার করেন। তাঁহাদের জন্ম-পূর্ব্ব-ঘটনা অনুসন্ধান করিতে হয় না। মানুষের জনন প্রবৃত্তির অপেক্ষায় ঈশ্বর এক একটী আত্মা হাতে করিয়া বসিয়া থাকেন। বস্তুত অনন্তত্ব-বিহীন অমরত্ব অতি অকিঞ্চিৎকর। যাহা অনন্ত, তাহা আদিতেও অনন্ত, অন্তেও অনন্ত, একথা বলিবার আবশ্যক নাই। অমরত্বের এক দিকে শূন্য।

যাঁহারা আত্মার অনন্তত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা স্ফটিকে ফুলের রঙের মত, বুদ্‌বুদে আদিত্য জ্যোতির ন্যায়, আত্মাকে পরমাত্মার জ্যোতি ভিন্ন, অদ্বৈত ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার করিতে পারেন না। হয়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে আত্মাকে দেহের জ্যোতি বলিতে হইবে, না হয়, আত্মাকে অনন্ত ব্রহ্ম বলিতে হইবে। তৃতীয় পন্থা নাই। আত্মাকে অমর বলিয়া পরকালের ন্যায় পূর্ব্ব কালের ব্যবস্থা না করিলে শশকের পত্রাচ্ছাদনে শিরোরক্ষা ঘটে। দুর্জ্ঞেয় সুতরাং অচিন্ত্য-কর্ত্তব্য, ইহা না ভক্তির না জ্ঞানের কথা।

বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক উভয়েই কর্ম্ম ফল স্বীকার করেন, কর্ম্ম ও বাসনা পুনর্জন্মের কারণ। বাসনার নিরাশ হইলে জন্ম হয় না, বাসনা থাকিলেই জন্ম হইবে। সে বাসনা যে কোন প্রকার। ধার্ম্মিক হইবার বাসনা কর, পুনর্জ্জন্ম হইবে; মোক্ষ পাইবার বাসনা কর, পুনর্জ্জন্ম হইবে। বাসনা জন্ম-প্রসূতি। কি রকমের জন্ম হইবে, মনুষ্যরূপে, পশুরূপে, কীট কি পতঙ্গরূপে, তাহা কর্ম্মফলে নিশ্চিত হয়। সাংখ্যকার বলেন, কর্ম্মফল অকাট্য,-"অবশ্যমেব-ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং"। বৈদান্তিকেরা তিন প্রকার কর্ম্ম স্বীকার করেন— প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী। যাহা করিতেছ ও যাহা করিবে, জ্ঞানযোগে ইহাদের ব্যত্যয় হইতে পারে। কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মফল ভোগে কাটে। প্রারব্ধ কর্ম্মফল-ভোগ শেষ হইলে জ্ঞানজনিত মোক্ষ লাভ হয়। যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে অথচ কর্ম্মফলভোগ কাটে নাই, তাহাকে মোক্ষের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। এজন্য জীবন্মুক্তি—জীবিতাবস্থায় মোক্ষ ঘটে না। কর্ম্মফল-ভোগী জ্ঞানবান কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন বলিয়া কাতর নহেন। স্বাস্থ্যের সোপান জানিয়া তিনি রোগকে বিড়ম্বনা মনে করেন না।

জগৎ সৃষ্ট কি অনাদি, ঈশ্বর আছেন কিনা, আত্মা আছে কিনা, বৌদ্ধেরা এ সকল গূঢ় রহস্যের আলোচনা করেন না। যাহা আছে, যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাই স্বীকার করিয়া নামরূপের আলোচনাতেই বৌদ্ধ দর্শন সমাপ্ত। জগৎ দুঃখময়, দুঃখের কারণ

কি, কিরূপে দুঃখের বিনাশ হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসাতেই বৌদ্ধদর্শন পরিপূর্ণ। ত্রিবিধ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নাম মোক্ষ—"ত্রিবিধ দুঃখস্যাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ"—এই খানে বৌদ্ধ ও সাংখ্যদর্শনের একতা, বেদান্তদর্শনে পরব্রহ্মে আত্মার বিলয়ের নাম মোক্ষ।

তথাপি বৌদ্ধদর্শনের মর্ম্মে আত্মার অস্বীকার। বৌদ্ধেরা আত্মা স্বীকার করে না, অথচ পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করে। ইহা আপাতত বিসম্বাদী বলিয়া বোধ হইতে পারে। মৃত্যু হইলে দগ্ধ করিয়া শরীরের বিনাশ করা হয়, আত্মা স্বীকার না করিলে পুনর্জন্ম কাহার হয়, একথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। বৌদ্ধদর্শনে স্পষ্টত আত্মা স্বীকার করাও হয় নাই, অস্বীকার করাও হয় নাই। সুতরাং এ প্রশ্নেরও স্পষ্ট কোন মীমাংসা করা হয় নাই। তথাপি আত্মা অস্বীকারের মত, অস্পষ্টভাবে, এ প্রশ্নেরও উত্তর বৌদ্ধদর্শনে পাওয়া যায়। বৈদান্তিকেরা দুই প্রকার রূপ স্বীকার করেন—স্বরূপ রূপ ও প্রবাহ রূপ। আমি যখন বলি যে "কাল গঙ্গার এই ঘাটে স্নান করিয়াছিলাম" তখন সত্য কথা কহি কিনা? কালিকার আমি আজিকার আমি নহি, কালিকার ঘাট আজিকার ঘাট নহে, কালিকার সে গঙ্গা আজি নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অথচ কালি এই ঘাটে আমি স্নান করিয়াছিলাম, একথাও সত্য। কালিকার কিছুই স্বরূপ রূপে আজি নাই, কিন্তু প্রবাহরূপে সকলেই আছে। কালিকার আমি স্বরূপত আজি নাই, কিন্তু প্রবাহরূপে আজ আছি, কাল থাকিব, দশদিন পরেও থাকিব, জন্মে জন্মে থাকিব। বৃক্ষাদির আত্মা নাই, সকল দার্শনিকেই বলে, সে বৃক্ষাদি প্রবাহরূপে বহুদিন থাকে। আত্মা আছে বলিয়া কালিকার আমি আজি আছি, একথা সত্য নহে। আত্মা না থাকিলেও, প্রবাহরূপে জীব জন্ম জন্ম থাকিতে পারে। এই জন্য আত্মা স্বীকার না করিলেও, বৌদ্ধগণের জন্মান্তর স্বীকারে বাধা ঘটে না। এখানে বৌদ্ধমত বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা প্রাচীন বৌদ্ধমত।

অনেকে আত্মা ও পরমাত্মার একতা স্বীকার করিলেও, প্রকৃতির সহিত আত্মার একতা, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" স্বীকার করিতে চাহেন না। বৈদান্তিকেরা ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ বলিয়া নির্ণয় করেন। ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার, উপাদান কারণ মৃত্তিকা প্রভৃতি। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বুঝাইবার জন্য বেদান্ত "ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন" এরূপ কথা না বলিয়া "ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে" এইরূপ বলেন। "জন্মাদ্যস্য যতঃ।" কর্ত্তৃকারকের পরিবর্ত্তে অপাদান কারক ব্যবহার হয়। জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ব্রহ্ম বলিয়া জগতকে ব্রহ্মময়—জগতই ব্রহ্ম—এরূপ বুঝিতে বৈদান্তিকের কোন আপত্তি হয় না। জগত মিথ্যা বলিয়াও বেদান্তে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহার নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ব্রহ্ম, তাহা মিথ্যা কিরূপে হইবে, বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইতে পারে। বস্তুত ব্রহ্ম ভিন্ন যখন আর কিছু নাই, সকলই যখন ব্রহ্ম, তখন জগত আর কোথায় রহিল? রজ্জুকে যদি রজ্জু বলা যায়, তাহা হইলে ভ্রম হয় না। কিন্তু

রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম মিথ্যা। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় অজ্ঞানী লোকে ব্রহ্মকে জগত বলিয়া ভ্রম করে। সকলই ব্রহ্ম, জগত বলিয়া কিছু নাই।

ইতি পূর্ব্বে যজ্ঞ ও ধ্যানের কথা বলিতেছিলাম। অনেকের সেই কথাই ভাল লাগিবে, তুমি আমি নাই, ভেদাভেদ নাই, সকলই ব্রহ্ম, ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইতে পারে। এজন্য হিন্দু শাস্ত্রে অধিকারী ভেদে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে। অধিকারী ভেদ না করিয়া ব্রাহ্মসমাজের মত, সকলকে এক প্রকার উপদেশ দিলে কাহারও সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। আবার আচার্য্যকে কাহারও নিকট প্রতিমার আবশ্যকতা, কাহারও নিকট অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে দেখিয়াছি। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন সূত্রে লিখিত হইয়াছে যে, দুঃখ দুঃখের কারণ ও দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার উপায় সংসারাসক্ত অসংস্কৃত লোকে বুঝিবে না বলিয়া বুদ্ধদেব বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলেন। বৈদান্তিকেরা বলেন, যাহারা রাগ দ্বেষ, আসক্তি ও ঘৃণা হইতে মুক্ত হয় নাই, তাহারা ব্রহ্ম নিরূপণে অসমর্থ। যোগবাশিষ্ঠে একটী আখ্যায়িকা আছে। এক ব্যক্তি পৃথিবীর অন্ত নিরূপণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। বহুশত বৎসর ভ্রমণ করিয়াও পৃথিবীর অন্ত নিরূপণে অসমর্থ হইলে, সে দ্রুততর গতি লাভের জন্য হরিণ রূপ ধারণ করিয়াছিল। সেইরূপে সে একদা শীকারীর বাগুরাবদ্ধ হইয়া রাজার গৃহে বন্দী হয়। যে পৃথিবীর অন্ত নিরূপণে সমর্থ নহে, সে মায়ার অন্ত নিরূপণে কিরূপে সমর্থ হইবে? তাহার পর মায়ার অতীত ব্রহ্ম কত দূরে!

যজ্ঞ ও ধ্যান দ্বিবিধ হইলেও, কোন স্পষ্ট রেখায় দুইটী বিচ্ছিন্ন নহে। ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ। যজ্ঞ সমাধিকে সাহায্য করে, আবার সমাধি যত উন্নত হইবে, যজ্ঞ তত মহত্তর হইবে। যতই উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিতে পারিবে, সমাধি তত একাগ্র হইবে। মানুষের দুটী পা, ভিন্ন হইলেও, দক্ষিণে ও বামে বিভক্ত হইলেও, একটীকে ছাড়িয়া একটীতে চলে না। একের পতনে দুয়েরই পতন হয়। মনের মধ্যে আসিয়া দুই জনে যুক্ত হইয়াছে, তাহার পর একটী বাক পথে, অন্যটী অবাক্ পথে নামিয়া গিয়াছে। মৌনাচরণ ও মনন করিব বলিয়াই আমাদের নাম মানব হইয়াছে।

যাগ যজ্ঞে জীব পিতৃলোক লাভ করে, জ্ঞানে দেবলোক লাভ করে। যজ্ঞে চন্দ্র মণ্ডলে বাস হয়, জ্ঞানীর পরিণাম সূর্য্য মণ্ডলে। যজ্ঞের ফল ভোগ হইলে, পাপের ফল ভোগ আরম্ভ হয়। চন্দ্র মণ্ডল হইতে বৃষ্টিরূপে জীব ভূতলে পতিত হয়। কর্ম্ম ফলানুসারে যে জন্ম লাভ করিতে হইবে, সেই জাতীয় কোন জীব সেই বৃষ্টি জল গ্রহণ করে। সেই জীবের ঔরসে ফলভোগীর জন্ম হয়। জ্ঞানমার্গে যাহারা দেবলোক লাভ করে, তাহাদের আর পতন হয় না।

কর্ম্মে অবিদ্যার বিনাশ হয় না, পুনশ্চ উত্তরোত্তর তাহার বৃদ্ধি হয়। পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভের কারণ ঘটে। জ্ঞানেই কেবল অবিদ্যার বিনাশ হয়, বাসনা নাশ হইলে পুনর্জন্মের কারণ ঘটে না। এই জন্য জ্ঞান মার্গ সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মমার্গের শ্রেষ্ঠ। নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানের সোপান, জ্ঞান অবিদ্যা-বিনাশ হেতু। এই খানে উত্তর ও পূর্ব্ব মীমাংসার মিলন।

আত্মা কর্ম্মফল ভোগ করে না। আত্মা নির্ব্বিকার, নির্গুণ ও নির্লিপ্ত। আত্মা সুখেরও ভাগী নহে, দুঃখেরও ভাগী নহে। কর্ম্ম-ফল-ভাগী জীবের সূক্ষ্মদেহ। সূক্ষ্মদেহ পঞ্চ-প্রাণ মনোবুদ্ধি ও দশেন্দ্রিয় সমন্বিত। আত্মা নিরুপাধি। নীলকুসুম সন্নিধানে স্ফটিককে যেমন নীলবর্ণ বোধ হয়, অবিদ্যা বশত আত্মাকেও উপাধি বিশিষ্ট বোধ হয়। তাই অজ্ঞান লোক আত্মাকে পঞ্চ কোষময় বা ইন্দ্রিয় ব্যাপারে ব্যাপারী বলিয়া মনে করে। আত্মার অবস্থিতি হেতু ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করে বটে, কিন্তু সে কর্ম্ম আত্মার নহে। আত্মা নিষ্কর্ম্মা, সূর্য্যোদয়ে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাই বলিয়া সূর্য্য সে সকল কর্ম্মের কারণ নহে। আত্মা কূটস্থ শুদ্ধ চৈতন্য।

আত্মা দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, মন নহে, বুদ্ধি নহে, প্রকৃতি নহে, তাহাদের সকলের সমষ্টিও নহে। ইহাদের সকলে লয় পাই-লেও আত্মার কোন ক্ষতি হয় না। আত্মার মৃত্যু নাই। অবিদ্যাজনিত দেহাদি মরণ-শীল, আত্মার আদিও নাই, অন্তও নাই। আত্মা কাহারও সৃষ্ট নহে, আত্মা পরমাত্মার অংশ নহে। সূর্য্যকিরণে স্ফটিক যেমন জ্যোতির্ম্ময় হয়, জীবদেহে আত্মা তেমনি পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। আত্মা স্বপ্র-কাশ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তবে অস্বচ্ছ পদার্থে যেমন জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয় না, তেমনি অবিদ্যা কলুষিত ক্ষেত্রে আত্মা প্রকাশিত হয় না। যেমন নিষ্কলঙ্ক দর্পণে সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত হয়, তেমনি কেবল মাত্র বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আত্মা ভিন্ন আর কাহারও চৈতন্য নাই। আত্মার চৈতন্য হেতু দেহাদি সচেতন বলিয়া প্রতীত হয়। মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি জড় পদার্থ। ইহারা কেহ আপনাকে প্রকা-শিত করিতে পারে না। প্রদীপ যেমন ঘটাদি প্রকাশিত করে, তেমনি আত্মা তাহা-দিগকে প্রকাশিত করে। প্রদীপ যেমন আপনাকে আপনি প্রকাশিত করিতে পারে, প্রকাশিত হইবার জন্য অন্য প্রদীপের আবশ্যকতা রাখে না, আত্মা তেমনি স্বপ্রকাশ, আপনাকে আপনি জানিতে পারে।

কর্তৃত্বাদি মনের ধর্ম্ম, রাগ দ্বেষাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম, আত্মার কোন ধর্ম্ম নাই, কোন গুণ নাই, আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য নির্ম্মল চিৎ-স্বরূপ। আকাশের নীলিমার ন্যায় আত্মার গুণ, কল্পনা মাত্র। আত্মার আকার নাই, বিকার নাই, ইন্দ্রিয় নাই, মন নাই, গুণ নাই, অভিমান নাই। আত্মা নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, শুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য ও অদ্বিতীয়। আত্মা আছে তাই সত্য, স্বপ্রকাশ তাই জ্ঞান-ময়, জন্ম মৃত্যু নাই তাই অনন্ত। পরমা-নন্দ পরমাত্মার বিদ্যমানতাই আনন্দস্বরূপ। আত্মাই ব্রহ্ম। আনন্দ আত্মার গুণ নহে, জ্যোতি যেমন সূর্য্যের গুণ নহে, সূর্য্য যেমন জ্যোতির্ম্ময়, আত্মা তেমনি আনন্দ-ময়।

যাঁহারা অনুশীলন ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাঁহারা বেদান্ত-বিরোধী। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধি বা তাহাদের সমষ্টি আত্মা হইলে, তাহাদের উৎকর্ষণে আত্মার উৎকর্ষ সাধিত হইত। বস্তুত আত্মার উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতা নাই। বেদান্ত মতে ঐ সক-লের নিবৃত্তিতেই জীবের মঙ্গল। ইহারাই দুঃখ সহিবার ক্ষমতাকে মোক্ষ পাইবার উপায় বলিয়া, অশ্ব গর্দ্দভাদি ভারবাহিকে

মোক্ষ লাভের অধিকার দিয়াছেন। (প্রচার —পৌষ)।

আত্মস্বরূপ অনুভব হইলেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, জ্ঞানের উৎপত্তি হইলেই যোগী আত্মাকে সর্ব্বময় জ্ঞান করেন। যোগীর সাংসারিক সুখে অনুরাগ থাকে না। যাঁহাকে লাভ করিলে অন্য লাভকে লাভ বলিয়া বোধ হয় না, যাঁহাকে পাইবার সুখ হইতে অন্য সুখ অধিক নয়, যাঁহার জ্ঞান হইলে অন্য জ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয় না, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। যাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া জ্যোতিষ্কগণ প্রকাশ পাইতেছে, বাহ্য ও অভ্যন্তর সমস্ত জগতকে যিনি প্রকাশ করেন এবং স্বয়ং প্রকাশিত হন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ব্রহ্ম জগতের অতিরিক্ত, কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। আমরা যাহা কিছু দেখি ও শুনি, সে সমুদয়ই ব্রহ্ম স্বরূপ। ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হইলে আর উপাসনার আবশ্যকতা থাকে না।

উপাসনার প্রধান সহায়, বিবেক অথবা আত্মানাত্ম জ্ঞান। বিবেক হইতে বৈরাগ্য জন্মে। স্থাবর বিষয়ে ইচ্ছাভাবের নাম বৈরাগ্য। বৈরাগ্য ছয় প্রকার, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান। দর্শন শ্রবণাদি প্রবৃত্তি নিরোধের নাম দম। শব্দাদি বিষয় গ্রহণে অপ্রবৃত্তির নাম উপরতি। শীত গ্রীষ্ম রাগ দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের সহনকে তিতিক্ষা বলে। উপদেশে অচল বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা এবং পরব্রহ্মে চিত্তের একাগ্রতাকে সমাধান বলে। এইরূপ বৈরাগ্য যিনি সাধন না করিয়াছেন, তাঁহার উপাসনা হয় না। উপাসনা না করিলে জ্ঞান জন্মে না। জ্ঞান পূর্ণ না হইলে মুক্তি হয় না। কর্ম্মফল-ভোগী লিঙ্গ-দেহের কারণ অজ্ঞানতা। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানতার বিনাশ হইলে, লিঙ্গ-দেহের লয় হয়। সর্ব্বাবশিষ্ট আত্মা তখন পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়। ব্রহ্মই জগতের কর্ত্ত, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। যাহারা উপাস্য ও উপাসকরূপে আত্মা ও পরমাত্মার ভেদ কল্পনা করে, তাহাদের মোক্ষ হয় না। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান হইলে জীবজ্ঞানের ভ্রম দূরীভূত হয়। এই জন্যই অজ্ঞানতার বিনাশ হইলে, জীবন্মুক্তি হয়, বলা যায়। বৌদ্ধ ও বেদান্ত ধর্ম্ম, গৃহীর নহে। রাগ দ্বেষ সমাজ বন্ধনের কারণ ও স্থিতি হেতু। লিপ্সুবৃত্ত লোক, অসামাজিক। বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বৌদ্ধ ও বেদান্ত ধর্ম্ম তাহাদের অবস্থান, নিয়মবদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত করে। সংসারের সুখ, প্রবৃত্তির উৎকর্ষণ যাহাদিগের অভিলষণীয়, এই দুই ধর্ম্ম তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করে নাই। এইজন্য পৌরাণিক ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। অদ্বৈতমতাবলম্বী চৈতন্যদেব কি জন্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, বেদান্ত ধর্ম্মে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই কেন, চৈতন্য ও সার্ব্বভৌম সম্বাদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সংসারে যাহাদের কার্য্য ফুরাইয়াছে বা যাহাদের কার্য্য নাই, চিন্তাশীল সেই মহানুভবগণের পরিতৃপ্তি এতদ্ভিন্ন আর কিছুতেই নাই। প্রেমপরায়ণ পৌরাণিক ধর্ম্ম যুবকের, জ্ঞানপরায়ণ বৃদ্ধের জন্য বেদান্ত বা বৌদ্ধধর্ম্ম। শঙ্কর বা সুপনার ভিন্ন ইহাদের মধুরতা আর কে বুঝিবে?

বেদান্ত ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে প্রাচীন-

তর কে? জিজ্ঞাসা করিলে, বেদান্তকেই প্রাচীনতর বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ধর্ম্মই বেদান্ত, ব্রহ্ম মীমাংসা বা পূর্ণ প্রজ্ঞ দর্শন উপনিষৎ সূত্র সকলকে বিস্তৃত বা ব্যাখ্যা করিয়াছে মাত্র। উপনিষৎ হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি। কর্ম্মফল, জন্মান্তর বাদ, দুঃখ বিনাশে জীবমুক্তি, এসকল মত বেদান্ত ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে একই ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে ভিন্ন নহে। আচার ব্যবহার ও সাধারণ গ্রাহ্য মতামতে ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীর বিভিন্নতা অতি অল্প। এই জন্য হিন্দু-আচার্য্য বুদ্ধদেবকে হিন্দু-অবতারের শ্রেণী মধ্যে গণনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। দার্শনিক গূঢ় রহস্যে শঙ্কর ও শাক্যের যুগান্তর প্রভেদ। সাধারণ লোকের সে রহস্যের মর্ম্ম অবধারণ করিবার সাধ্য ছিলনা। তাহারা ভক্তিভাবে উভয়ের চরণে প্রণাম করিয়া এক জনকে বিষ্ণুত্ব অন্যকে শিবত্ব প্রদান করিয়াছে। শঙ্কর ও শাক্যের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, বিচার করিবার সাধ্য আমাদের নাই। ইহাঁদের অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। উভয়েই অতীন্দ্রিয় অমানুষী অপ্রমাণসিদ্ধ মতের অবতারণা করিয়াছেন। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান কষ্টি প্রস্তরে পরীক্ষা করিয়া লওয়া যায় না। কোনও দিন এ প্রশ্নের মীমাংসা হইবে কিনা, কে বলিতে পারে?

প্রেমিক ঈশ্বরকে, ভাবুক, ভাবগ্রাহী, দয়াময়, বাঞ্ছাপূর্ণকারী ব্যক্তিত্বে পরিণত করেন। রাগ দ্বেষ বিবর্জ্জিত জ্ঞানী তাঁহাকে নির্ব্বিকার নিরঞ্জন বলিয়া অভিহিত করে। "সৎ" এই ক্লিবলিঙ্গ ভিন্ন তাহার অভিধানে আর কোন শব্দ নাই। যে যেমন, সে আপন ঈশ্বরকে তেমনি করিয়া লয়। কে আগে মুক্তি পাইবে, সে প্রশ্নের উত্তর কে দিতে পারে? সংসার বিসর্জ্জন করিয়া, প্রবৃত্তির শ্বাস রুদ্ধ করিয়া, স্নেহ, মায়া, মমতা যাহা কিছু কমনীয়, সকলি পরাস্ত করিয়া যিনি পরকালের সুখের মুখাপেক্ষা করেন, তিনি বীর পুরুষ, তাহার সন্দেহ নাই। নিশ্চিত অপেক্ষা অনিশ্চিতে যিনি অধিক নির্ভর করেন, তিনি বিশ্বাসী, সন্দেহ নাই। যিনি প্রতিমূর্ত্তিকে জীবিতের ন্যায় পূজা করিতে পারেন, তিনি সাধক সন্দেহ নাই। পরকালের আশায় ইহকাল ঘুচাইব, প্রাণের প্রতিমা অতল জলে ডুবাইব, আমার যে সাধ্য নাই। বাসনার তৃপ্তি হয়না বুঝি, সুখের মরিচীকার অন্বেষণে দুঃখের কণ্টকে বিদ্ধ হই বুঝি, বাসনা সংযত করিতে পারিলে যে সুখের অন্বেষণ করিতেছিলাম সেই সুখই পাই বুঝি, তবু বাসনা সংযত করিতে চাহি না। চাহিলে পারি কিনা, সেটা এখন দেখা হয় নাই। এক সুখ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি উদ্দেশ্য উভয়েরই। উপস্থিত প্রেমিকের, অনুপস্থিত জ্ঞানীর। পরিণামে কে পাইবে, জানি না। যখন দুঃখের জগদ্দল পাষাণে হৃদয় নিষ্পেষিত করে, তখন আমি জ্ঞানী হই, বাসনাকে উপেক্ষা করি, ঠেকিয়া শিখি। যখন সুখের কুসুম-কাননে সুরভি-শ্বাসে প্রাণ মন পুলকিত করে, তখন ইহকাল ছাড়িয়া পরকাল চাহি না। সেই প্রেমময়ীর চরণ তলে অনন্ত বিসর্জ্জন দেই। ইহা দুর্ব্বলতা। কিন্তু এই দুর্ব্বলতার উপর সমাজ গঠিত। মহাবল দেবতার জন্য সমাজ নহে, অল্পবল, মধ্যবিত্ত লইয়াই সমাজ।

সমাজ ভাবুকের, সন্ন্যাস জ্ঞানীর। সমাজ রক্ষা করিতে হইলে, বৌদ্ধ ও বেদান্ত ধর্ম্ম যুগপৎ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। তখন মনকে প্রবোধ দিবার জন্য ভগবৎগীতার নিষ্কাম কর্ম্মকে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া—সোপানকে চূড়ামণি বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে হইবে। যিনি প্রেমের উপাসনা করিয়া সমাজ রক্ষা করেন, তিনি গুণবান, যিনি জ্ঞানী হইয়া পরকাল বিসর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাস উপেক্ষা করিয়া প্রেমিক হন, তিনি মহাবীর, তিনি জগতের বন্দনীয়। কেহ কি তাহা হইয়াছে বা হইতে পারে?—পাঠক জানেন।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম (১২শ)

বঙ্গদেশ গমন।

দিগ্বিজয়ী জয়ের পর নিমাই পণ্ডিতের যশে চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইল। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী একেবারে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন; বড় বড় বিষয়ী লোক সকল তাঁহাকে দেখিয়া দোলা হইতে নামিয়া অশেষ প্রকারে অভিবাদন করিতে লাগিলেন; সর্ব্বত্রে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল; এবং ধনাগমের দ্বার উন্মুক্ত হইল। এখন হইতে যাহার বাটীতে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত, তাহার ভোজ্যবস্ত্র দ্রব্যাদির এক এক অংশ তাঁহার বাটীতে আসিয়া পৌঁছিত।

"সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্বলোকে হৈল ধ্বনি;
নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি।
বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হৈতে;
নামিয়া করেন নমস্কার ভালমতে।
প্রভু দেখি মাত্র জন্মে সবার সাধ্বস;
নবদ্বীপে হেন নাহি যে না হয় বশ।
নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে;
ভোজ্য বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু ঘরে।"

চৈঃ ভাঃ ১২ অ।

শিশুকাল হইতেই গৌরের হৃদয় মহা উদার; দুঃখীকে প্রেম করিতে তাঁহার মত কেহ জানিত না। যেমন এক দিক্ দিয়া তাঁহার ধনাগম হইতে লাগিল, তেমনি অন্য দিকে অজস্র ব্যয় হইতে লাগিল। সঞ্চয় কাহাকে বলে তাহা তিনি তখন জানিতেন না; এবং অর্থ লইয়া যে সাংসারিক সুখভোগ করিতে হয়, তাহা তাঁহার শাস্ত্রে লেখে নাই। এখন হইতে তিনি দুঃখী দরিদ্র দেখিলেই অন্নবস্ত্র দিয়া তাহাদের অভাব মোচন করিতে লাগিলেন; এবং সন্ন্যাসী উদাসীন অতিথিদিগের জন্য বাটীতে এক সদাব্রত খুলিয়া দিলেন। সংসারাসক্তি প্রথম জীবনেও তাঁহার জীবনকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। পর জীবনে যখন সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে চলিয়া গিয়াছিলেন, তখনকার ত কথাই নাই। এখন যে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রম করিতেছিলেন, এখনও এক দিনের জন্য সংসার চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিতে পারে নাই। প্রেমই তদীয় জীবনের মহামন্ত্র। প্রেমে আরম্ভ এবং প্রেমেই শেষ।

তখন নবদ্বীপে উদাসীন সন্ন্যাসী পরমহংস সর্ব্বদাই আগমন করিত এবং দুঃখী দরিদ্রেরও অপ্রতুল ছিল না। টোলে অধ্যাপনা করিতে করিতে এই সকল লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তিনি মহা সমাদরে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিষ্য দ্বারা জননীকে আহার সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য বলিয়া পাঠাইতেন। এইরূপে প্রতিদিন ২০।২৫ জন নিরাশ্রয় ও সাধুভক্ত লোক তাঁহার বাটীতে আহার পাইতেন। দ্রব্যাদি আয়োজনের ভার জননীর উপর ছিল। তিনি সে সমস্ত আহরণ করিয়া নব বধূকে রন্ধন করিতে দিতেন। লক্ষ্মীদেবী অল্পবয়সেই অতি সুন্দর পাক করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি সে সমস্ত রন্ধন করিলে নিমাই পণ্ডিত অভ্যাগতদিগকে লইয়া জাহ্নবীজলে মধ্যাহ্নাদি সনাপন করত পরম সুখে ভোজন করিতে আসিতেন। বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন যে, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গৌরাঙ্গসুন্দর দৃষ্টান্তাদির দ্বারা গৃহস্থদিগকে গৃহীর কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার জন্য এই সকল অনুষ্ঠান করিতেন।

লক্ষ্মীদেবীও তখনকার বঙ্গীয় বধূকুলের আদর্শ ছিলেন। তখন তাঁহার নবীন যৌবন, সে সময়ে সামান্য স্ত্রীদিগের কত আমোদ ও বিলাসের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর তাহা কিছুমাত্র ছিল না। তিনি কায়মনোবাক্যে শ্বশ্রূ ও স্বামীর সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন ও আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা ভুলিয়া গিয়া, শশ্রূর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে যত্নবতী হইতেন। তিনি প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহসংস্কারাদি করিতেন; তৎপরে স্নানান্তে বাটীর বিগ্রহ সেবারও স্বামী ও শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পূজার আয়োজনাদি করিয়া, রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন; এবং সকলকে আহারাদি করাইয়া ও আপনি ভোজন করিয়া গৃহকার্য্য সমাপনান্তে স্বামীর পাদ সম্বাহন ও ক্ষণকাল স্বামী সঙ্গে অবস্থিতি করিতেন। নিমাই পণ্ডিতের নিয়ম ছিল যে, আহারান্তে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় টোলে অধ্যাপনা করিতে যাইতেন। এই অবসর সময়ে তিনি ভার্য্যার সহিত সম্মিলিত হইয়া পরস্পর মধুরালাপ করিতেন। তখনকার দেশের প্রথানুসারে দিবাভাগে স্বামী স্ত্রীতে একত্র থাকা দূষণীয় হইলেও, উদার-মতি শচীর গৃহে সেরূপ কঠোর শাসন ছিল না। বরং পুত্র ও পুত্রবধূকে একত্রিত দেখিলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না।

"কোন দিন সেই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ;
বসিয়া থাকেন পাদমূলে অনুক্ষণ।
অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র পদতলে;
মহাজ্যোতির্ম্ময় অগ্নি পঞ্চ শিখা জ্বলে।"

এই সময়ে গৌরচন্দ্রের পূর্ব্বদেশ গমনের ইচ্ছা হইল। তাহার সম্বন্ধে যে ইচ্ছা, সেই কাজ। তাঁহার জীবনে এই এক অসাধারণ গুণ ছিল যে, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া একবার বুঝিতেন, তাহা হইতে কিছুতেই তাঁহাকে পশ্চাৎপদ করিতে পারিত না। পূর্ব্বাঞ্চল গমনে তাঁহার কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা ভাল করিয়া জানা যায় না, তবে পরবর্ত্তী কার্য্য দৃষ্টে বোধ হয় যে, শিক্ষা বিস্তার করাই তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। জননীর আজ্ঞা লইয়া ও ভার্য্যাকে মাতৃ সেবার জন্য বিশেষ সতর্ক করিয়া, কতকগুলি প্রিয় শিষ্য সমভিব্যাহারে বাটী হইতে বাহির হইলেন; এবং কিয়দ্দিনান্তর পদ্মানদীর তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। পদ্মানদীর কোন্

ভাগে গমন করিয়া ছিলেন ও কোন্ কোন্ দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ইহা জানা যায় যে, কয়েক মাস ধরিয়া ঐ দেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার যশঃসৌরভ সমস্ত বাঙ্গলা দেশে বিকীর্ণ হইয়াছিল; তাই তাঁহার আগমন বার্ত্তা রাষ্ট্র হইবা মাত্র বহুসংখক পাঠার্থী আসিয়া তাঁহার নিকট পড়িতে লাগিল। কথিত আছে যে, এই সকল লোক তাঁহার কৃত টীপ্পনির সাহায্যে অধ্যয়ন করিতেছিল, ও অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া নবদ্বীপে তাঁহার নিকট অধ্যয়নার্থে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। এক্ষণে তাঁহাকে স্বদেশে পাইয়া তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনিও টোল করিয়া রীতিমত শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

"সবে আসি প্রভুরে করিয়া নমস্কার;
বলিতে লাগিলা করি স্তুতি পরিহার।
আমরা সভার অতি ভাগ্যোদয় হৈতে।
তোমার উদয় আসি হৈল এ দেশেতে।
অর্থ বৃত্তি লই সর্ব্ব গোষ্ঠের সহিতে,
যার ঠাঁই নবদ্বীপে যাইব পড়িতে;
হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে
আনিয়া দিলেন আমা সভার গোচরে।
সবে এক নিবেদন করি যে তোমারে;
বিদ্যাদান কর কিছু আমা সবা কারে।
উদ্দেশে আমরা সব তোমারি টিপ্পনি;
সেই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি।"

নিমাই পণ্ডিত তৎ প্রণীত কোন্ টিপ্পনি এক্ষণে দেখা যায় না; কিন্তু এত দ্বারা জানা যাইতেছে যে, তিনি অনেক শাস্ত্রের ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশে অবস্থিতি কালে তপন মিশ্র নামে এক নিরীহ সারগ্রাহী ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। কথিত আছে যে, তপনমিশ্র অনেক শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্ম জীবন লাভের প্রকৃত পথ কি ও ঈশ্বর তত্ত্বই বা কাহাকে বলে, তৎ সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার প্রকৃত উপায় জানিবার জন্য সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছিলেন। এই সময়ে এক দিন রজনীতে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, নিমাই পণ্ডিতের নিকট যাইলে তাঁহার সকল সংশয় অপনোদন হইবে। স্বপ্নের আদেশানুসারে ব্রাহ্মণ নিমাইয়ের নিকট আগমন করিয়া, আত্ম বিবরণ নিবেদন করিলে, গৌরচন্দ্র বলিলেন যে, "প্রতিযুগের অবস্থা ও শিক্ষানুসারে ভগবান যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন; সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞাদি, দ্বাপরে ঈশ্বর সেবা ও কলিতে নাম সংকীর্ত্তন এইরূপে যুগচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম নিরূপিত আছে। আমার বিবেচনায় আর সমস্ত কুটিনাটী পরিত্যাগ করিয়া কেবল নাম সংকীর্ত্তন করিতে থাকুন, নাম সাধন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেম হইবে, তখন আপনি অনায়াসে ঈশ্বর তত্ত্ব জানিতে সক্ষম হইবেন। ঈশ্বর তত্ত্ব কি, তাহা কেহ কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে পারে না; আপনা আপনি অনুভব করিতে হয়।" কথিত আছে যে, গৌরের এই উপদেশ বাক্যে ব্রাহ্মণের চক্ষুরুন্মিলিত হইল। তখন সে তাঁহার সহিত থাকিবার জন্য ইচ্ছা জানাইলে গৌরাঙ্গ দেব তাঁহাকে বারাণসী গমন করিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন যে, ভবিষ্যতে ঐ নগরীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। তপনমিশ্র তদনুসারে বারাণসী নগরীতে চলিয়া

গেলেন। চৈতন্য-জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনায় জানা যাইবে যে, সন্ন্যাসের পর যখন তিনি কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন দুই মাস কাল এই তপনের গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং এব্যক্তি তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

উপরোক্ত আখ্যায়িকা পাঠে স্বভাবতই মনোমধ্যে কয়েকটী কথা উপস্থিত হয়। প্রথমত, তখন পর্য্যন্ত ত গৌরচন্দ্র ধর্ম্মোপদেষ্টার ভার গ্রহণ করেন নাই। তবে কিরূপে তপনমিশ্রকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া সম্ভব হয়? দ্বিতীয়ত, তিনি কি তখন জানিতেন যে, পর জীবনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীতে তপনের গৃহে অবস্থিতি করিবেন? যদি তাহা জানিতেন, তবে ইহার পরে পুনরায় দারপরিগ্রহ করা সম্ভব হয় কি না? বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করত তাঁহার মর্ত্ত্যলীলার ইচ্ছাই ইহার মূলীভূত কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা সে সিদ্ধান্তে সায় দিতে পারি না; তবে আমরা এসম্বন্ধে কি বলিব? আমরা কি বলিব যে, তিনি পূর্ব্বে হইতেই সমস্ত জানিয়া তপনমিশ্রকে কাশী যাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন? বড় কঠিন সমস্যা। তবে যদি উপাখ্যানটীকে অত্যুক্তিতে অনুরঞ্জিত বলা যায়, তাহা হইলে মীমাংসার বিষয় অনেকটা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। তপনমিশ্রের সহিত পরিচয় ও তাঁহার উপদেশে তপনের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়া ও বৈরাগ্যের উত্তেজনায় কাশী গমন করা, ইহার কিছুই অসম্ভব নহে। তবে গৌরাঙ্গ যে স্বীয় ভবিষ্যৎ সন্ন্যাস জানিয়া তাঁহাকে কাশী যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজও ইহার মীমাংসা করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন;—

"প্রভুর অনন্ত লীলা বুঝিতে না পারি;
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেন পাঠান কাশীপুরী।"

গৌরচন্দ্র পরম সুখে পূর্ব্বাঞ্চলে বসতি করিতেছেন, এদিকে নবদ্বীপে তাঁহার গৃহে যে বিপদ উপস্থিত, তাহা জানিতে পারেন নাই। তাঁহার বাটী ত্যাগের কিছুদিন পরে দৈবাৎ রজনীযোগে সর্পাঘাতে তাঁহার পত্নীর প্রাণ বিয়োগ হইল। বিকাশোন্মুখ কুসুম কলিকাতেই শুকাইয়া গেল। শচীর গৃহ বিষাদের অন্ধকারে আবৃত হইল। প্রাণের সদৃশ প্রিয়তমা বধূর বিয়োগে শচীমাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং তাঁহার কাতর ক্রন্দনে কঠিন পাষাণও বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে? বোধ হয়, সন্ন্যাসে গেলে পতির বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই বিশ্বজননী আপনার প্রিয়কন্যাকে অমৃতময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। যাহা হউক, আত্মীয় স্বজন একত্রিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক জাহ্নবী তীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং অপ্রিয় সংবাদ দিয়া গৌরচন্দ্রকে ব্যথিত করা অবৈধ বোধে কোন সমাচার পাঠাইলেন না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সর্পদংশনে লক্ষ্মীর পরলোক যাত্রা স্পষ্টত স্বীকার না করিয়া বলেন যে, স্বামী বিরহই ভুজঙ্গ রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দংশন করিয়াছিল।

'প্রভুর বিরহ সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল;
বিরহ সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল।'

চৈঃ চঃ ১৬ পঃ

কিয়ৎ দিন পরে গৌরচন্দ্র দেশে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, বঙ্গদেশীয়

ছাত্রগণ তাঁহাকে নানা প্রকার ধন সামগ্রী উপঢৌকন দিতে লাগিলেন। তিনি সে সমস্ত গ্রহণ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। বোধ হয়, এই তাঁহার জীবনের প্রথম ও শেষ উপার্জ্জন।

'তবে প্রভু গৃহে আসিবেন হেন শুনি ;
যার যেন শক্তি তেঁই ধন দিলা আনি।
সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র দিব্যাসন ;
সুরং কম্বল ভোট, উত্তম বসন।
উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে ;
সবেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে।'

চৈঃ ভাঃ

বহু শিষ্য ও ধন সম্পত্তিতে পরিবৃত হইয়া নিমাই পণ্ডিত স্বভবনে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ এবং অনেক দিনের পর জননী ও ভার্য্যার সহিত মিলিত হইবেন, এই আশায় প্রাণ আশান্বিত। কিন্তু হায়! তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার আশা ভীষণ নিরাশায় পরিণত হইবে। বাটী আসিয়া জননীকে প্রণাম করত তাঁহার হস্তে অর্থ সামগ্রী প্রদান করিলেন। বুদ্ধিমতী শচী ঠাকুরাণী হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং তিনি যাহাতে অন্তত কিছু সময়ের জন্য পত্নীবিয়োগ সংবাদ জানিতে না পারেন, সেরূপ উপায় অবলম্বন করিলেন। গৌরচন্দ্র আহারান্তে বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া আত্মীয়দিগের নিকট বঙ্গদেশের কথা বলিতে লাগিলেন এবং বাঙ্গালের কথা অনুকরণ করিয়া কতরূপ কৌতুক করিতে লাগিলেন। আত্মীয়গন কেহই অপ্রিয় সংবাদ বলিতে সাহসী হইলেন না। ক্ষণকাল পরে তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, তাঁহার জননী অতি বিষণ্ন চিত্তে বসিয়া আছেন। বহু দিনের পর বাটী আসিয়াছেন, ইহাতে জননীর মনে কত আনন্দ হইবে ; তাহার পরিবর্ত্তে তিনি বিমর্ষ চিত্তে রহিয়াছেন দেখিয়া,তাঁহার মনে কতকটা সন্দেহ হইয়াছিল। পরে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জনৈক প্রতিবেশী তাঁহাকে পত্নীর বিয়োগ সংবাদ বলিয়া ফেলিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণে গৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নীরবে অবিরল অশ্রুধারা গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি কিছু অভিভূত হইয়া পড়িলেন ; পরক্ষণেই জননীর কাতর ক্রন্দন শ্রবণ ও নিজের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া মাতাকে শান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

'প্রভুবলে মাতা দুঃখ ভাব কি কারণ।
ভবিতব্য যে আছে তা খণ্ডিবে কেমন।
এই মত কাল গত কেহ কারও নয় ;
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কয়।
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার ;
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর।
অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায় ;
সেই সে হইল, কি কার্য্য দুঃখ তায়।
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি ;
তার বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী।"

চৈঃ ভাঃ।

পুত্রের মধুর শান্ত্বনায় শচীদেবী ক্রমে ক্রমে শোক সংবরণ করিতে পারিলেন।

ক্রমশঃ শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

শ্মশান-সঙ্গীত।

কে বলে ভয়ের বাস ভীষণ শ্মশান ভূমি,
যেথানে মিশিয়া আছ প্রাণের প্রেয়সি তুমি!
যেথানে তোমারে গিয়ে
হৃদয়ে পাইব প্রিয়ে;
কে জানে তাহারে আহা কত ভালবাসি আমি!
যেথানে তোমার কাছে
প্রাণের প্রমদা আছে
মেয়ে নিয়ে খেল প্রিয়ে আদরে বদন চুমি!
জনক জননী যথা
ভগিনী মমতা লতা
ডাকিছে লইতে কোলে "এস বৎস! এস তুমি!"
ডাকিছে প্রাণের ভাই
"এস দাদা! ভয় নাই,
আমরা সকলে আছি—কেনগো একাকী তুমি!"
সুখ শান্তি যদি থাকে,
যদি কোথা স্বর্গ থাকে,
তবে সে শ্মশান ভূমি! তবে সে শ্মশান ভূমি!
প্রজ্জলিত সে অনলে
শোক তাপ যাবে জ্বলে।
আনন্দ—অমৃত—প্রেম দিবে সে
শ্মশান ভূমি!

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

মিছা কথা।

নিষ্ঠুর সংসারে আহা কেহ কারো নয়,
"তুমি আমার আমি তোমার" মুখে শুধু কয়!
কতদিন বলিয়াছি,
তুমি আছ ব'লে আছি,
প্রাণ গেলে ভুলিবনা—অভিন্ন-হৃদয়!
কত দিন বলিয়াছি
তুমি আছ ব'লে আছি,
জীবনে মরণে মাথা উভয়ে উভয়!
কিন্তু আজি হায় হায়
ভুলেছি সে সমুদায়,
ভুলিয়াছি সরলার সরল প্রণয়!
দিনান্তে একটী বার
এক বিন্দু অশ্রুধার
দেই কি না দেই তারে যদি মনে হয়!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

শেষ বিদায়।

আমি—যাই যাই যাই নাথ, অনন্তে মিশাই,
কে জানে আর তোমার দেখা পাই কি না পাই!
যত ছিল মনে আশা
যত ছিল ভালবাসা
সকলি শ্মশানে আজি পুড়ে হলো ছাই!
রহিল প্রাণের "মনি"
রাখিও স্নেহ তেমনি,
তুমি বিনে অভাগিনীর আর কেহ নাই!
করেছি যে অপরাধ
ক্ষমা কর প্রাণনাথ!
আজিই বিদায় শেষ—এই ভিক্ষা চাই!
জানি না যেতেছি কই,
জানি না যেতেছি বই,
জানিনা অজ্ঞাত রাজ্য, তবু তথা যাই!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

সংসার।

আজিও নারিনু তোমা চিনিতে সংসার!
কত ভাবে, কত বেশে দেও দরশন
মুগ্ধ মানবের কাছে,—কিসাধ্য আমার
বুঝিব স্বরূপ তব? বুঝে কি কখন,
সিন্ধুর স্বরূপ তৃণ, যবে ভাসমান
আকুল তরঙ্গ-বক্ষে,—আপনা-বিহীন?
জীবনের দিবা ওই ক্রমে অবসান;
ঘুরিব আবর্ত্ত-চক্রে আর কত দিন?
এই নিদাঘের রৌদ্র—প্রচণ্ড-দাহন,
এই শরতের জ্যোৎস্না—মধুর-উজ্জ্বল,
কভু শ্রাবণের ধারা—অশ্রান্ত প্লাবন,
কভু মলয়ের শ্বাস, পিকের সুস্বর;
আমি হে সংসার! তব ভক্ত উপাসক,
কিন্তু বল সত্য, তুমি স্বর্গ কি নরক?

শ্রীহেমনাথ মিত্র।

শাক্যসিংহের পুরনিষ্ক্রম।

অর্দ্ধরাত্র অতীত, পুরবাসীগণ মায়া-নিদ্রায় অভিভূত, শাক্যসিংহ ভাবিলেন, অয়মেব সময়ঃ—এই আমার উত্তম সময়, উত্তম অবসর। অনন্তর তিনি মনে মনে সংকল্প ধারণ করিয়া শয্যাস্তৃত পর্য্যঙ্ক হইতে অবতরণ করিলেন। পূর্ব্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা রত্নজালিকা অবনামিত করিলেন। অর্থাৎ শরীরস্থ রত্নাভরণ সকল উন্মুক্ত করিলেন। অনন্তর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া, হস্তদ্বয় পুটবদ্ধ করত পূর্ব্ব বুদ্ধদিগকে স্মরণ করতঃ "নমঃ সর্ব্ববুদ্ধেভ্যঃ" আমি সমুদায় বুদ্ধদিগকে নমস্কার করি; এই বলিয়া পূর্ব্ব বুদ্ধদিগকে নমস্কার করিলেন। ঐ সময়ে গগণতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখেন, আকাশে দেবগণ তাঁহার পূজার্থ আগমন করিয়া নতকায়ে অবস্থান করিতেছেন এবং নক্ষত্ররাজ চন্দ্র পুষ্যনক্ষত্রের সহিত সহাবস্থান করিতেছে। কার্য্যসাধক সুসময় সমাগত দেখিয়া, তিনি ছন্দক নামক স্বানুচরকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন,—

"ছন্দকা চ খলুমা বিলম্বহে অশ্বরাজ দদমে অলঙ্কতং,
সর্ব্বসিদ্ধি মমএতি মঙ্গলা অর্থসিদ্ধি ধ্রুব মদ্য-ভেষ্যতে॥"

ছন্দক! বিলম্ব করিওনা, শীঘ্র আমার একটী সজ্জীকৃত অশ্ব দাও। আমার সমুদয় সিদ্ধি আগত বা নিকট হইয়াছে। নিশ্চিত অদ্য আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে।

শুনিয়া ছন্দক উদ্বিগ্নমনে কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, অনন্তর বলিলেন,নৃপসিংহ! রাজন! কোথায় জাইবেন?

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—ছন্দক! যাহার জন্য আমি পূর্ব্বে বারবার শরীর পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, রাজ্যধন ও উত্তমা-ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়াছি, এবং শীল, ক্ষমা, দয়া ও প্রভা প্রভৃতি পরিগ্রহপূর্ব্বক ধ্যান-রত থাকিয়া কালকর্ত্তন করিয়াছি, অদ্য আমার সেই সময় বা সেই উদ্দেশ্য উপস্থিত।

আমি পিঞ্জরাবস্থিত জীবনিবহের জরা মরণ রূপ পাপ মোচনার্থ বহুকল্প কোটী

ব্যাপিয়া যে শিবশান্তি বোধ লাভের স্পৃহা করিয়া আসিতেছি, সেই শিবশান্তি বোধ লাভের সময় আজ উপস্থিত হইয়াছে।

ছন্দক বলিলেন,—আমি শুনিয়াছি, আপনি প্রসূত হইবা মাত্র দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের সম্মুখে নীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাও আপনার ভবিষ্য বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আপনি দৈবজ্ঞগণের সম্মুখে নীত হইলে, দৈবজ্ঞগণ বলিয়াছিলেন, মহারাজ! আপনার এই রাজকুলের উন্নতি উপস্থিত। আপনার এই পুত্র শত পুণ্য লক্ষণে লক্ষিত হইতেছেন, সুতরাং ইনি চক্রবর্ত্তী চতুর্দ্বীপেশ্বর ও সপ্তধনে অন্বিত হইবেন। যদি ইনি জীবজগতের দুঃখে দুঃখিত হইয়া অন্তঃপুর পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে ইনি বুদ্ধ হইয়া, এই পাপদগ্ধ প্রজাসমূহকে ধর্ম্মসলিলে অবসিক্ত ও তৃপ্ত করিবেন। যাহাই হউক, এক্ষণে আমার একটা কথা শুনিলে আমি সুখী হইব, কৃতার্থ হইব।

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, বল।

ছন্দক বলিতে লাগিলেন,—দেব! ইহসংসারে লোক সকল যে উদ্দেশে অনেক প্রকার ব্রত তপস্যাদি করিয়া থাকে, জটাবল্কলধারী ও বায়ুভক্ষ হইয়া উৎকটতর তপস্যা করিয়া থাকে, আপনি সেই দেবমনুষ্য-সম্পত্তি বিনা তপস্যায় লাভ করিয়াছেন। আপনি রাজা ও রাজপুত্র, যুবা ও দর্শনীয়, তরুণ ও কোমল শরীর, আজও আপনার কেশপাশ ভ্রমরকৃষ্ণ রহিয়াছে, ক্রীড়া কৌতুক ও কাম ভোগ অদ্যাপি অসমাপ্ত আছে। এই জন্যই বলিতেছি, এখন আপনি অমরাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় রমমান থাকুন, সুখ বিশেষ ভোগ করুন, পশ্চাৎ যখন বৃদ্ধ হইবেন, তখন আপনি নিষ্কণ্টকে নিষ্ক্রম অর্থাৎ সন্যাসার্থ পুর পরিত্যাগ করিবেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—"ছন্দক! কাম্য ও কাম সমস্তই অনিত্য, অস্থির ও অশাশ্বত। সমস্তই অপরিণামধর্ম্মী; নীহারের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, রিক্তমুষ্টির ন্যায় অসার, কদলীকাণ্ডের ন্যায় ভঙ্গুর ও দুর্ব্বল, অপক্ক ভোজনের ন্যায় বেদনাপ্রদ, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, বিষভোজনের ন্যায় পরিণাম দুঃখদ, মারুতলতার ন্যায় অসুখপ্রদ, ফেনবুদ্বুদের ন্যায় বিপরিণামধর্ম্মী, মায়া মারীচি সদৃশ, জ্ঞান বিপর্য্যায় হইতে উদ্ভূত, স্বপ্নের ন্যায় দুর্ভোগ্য, দুঃখপূরিত সাগরের ন্যায় দুরবগাহ এবং সর্পমস্তকের ন্যায় দুস্পৃশ্য। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে সভয়, সদোষ ও বিবর্জ্জনীয় বলিয়া উপদেশ করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞগণ ইহার নিন্দা করেন, শ্রেষ্ঠজন ইহাকে পরিহার করেন। অজ্ঞান ও মূর্খ লোকেরাই ইহার পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

ছন্দক দণ্ডাহতের ন্যায় ও শল্যবিদ্ধের ন্যায় বেদনা প্রাপ্ত হইয়া সাশ্রুনয়নে পুনর্ব্বার বলিলেন;—দেব! সংসারের শত শত লোক তীব্রতর ব্রত নিয়ম ধারণ করিতেছে, অজিন-পরিধায়ী, জটাধর, কেশশ্মশ্রুধর ও পিণ্যাক-ভক্ষ হইয়া গোব্রত প্রভৃতি বহন করিতেছে। তাহাদের কামনা, আমরা শ্রেষ্ঠ হইব, বিশিষ্ট হইব, চক্রবর্ত্তী রাজা হইব, লোকপালক হইব, অথবা দেবত্ব লাভ করিব। দেবগণের সহচর হইব। হে নরবর্য্য! আপনি সে সমস্তই লাভ করিয়াছেন, আপনার রাজ্য স্ফীত, সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব।

আপনার উদ্যান মনোহর, প্রাসাদ সুরম্য, স্ত্রী সুন্দরী, অনুরোধ করি, আপনি এসকল ত্যাগ করিয়া যাইবেন না, যথা সুখে ও স্বচ্ছন্দে ঐ সকল ভোগ করুন, দেবরাজের ন্যায় বিহার করুন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, ছন্দক! শুন, পূর্ব্ব জন্মান্তরে আমি অসংখ্য দুঃখ ভোগ করিয়াছি; পূর্ব্বে ঐ সকল কাম্য কামনা দোষে বন্ধন, অবরোধ, তাড়ণ, তর্জ্জন ও জরা ব্যাধি প্রভৃতি জনিত দুঃসহ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছি। ছন্দক! এ সমস্তই মিথ্যা, মিথ্যা প্রত্যয়-সমুৎপাদিত, অজ্ঞান-মূলক, অভ্রের ন্যায় অনিত্য, বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণবিনাশী, নীহারের ন্যায় লয়শীল এবং রিক্ত, তুচ্ছ ও অসার। ইহা আত্মা নহে, আত্মাতে নাই, আত্মার সহিত ইহাদের সম্পর্কও নাই। এসমস্তই অনাত্মা ও অধ্রুব। এই নিমিত্তই আমার মন বিষয়ে সংরক্ত হয় না, সংসক্ত হয় না। অতএব হে ছন্দক, তুমি আমায় শীঘ্র একটী সজ্জিত অশ্ব দাও।

ছন্দক পুনরপি বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করিল,—শাক্যরাজ, কিছুকাল এসকল ভোগ করুন, সুখ অনুভব করুন, পরে আপনি বনে যাইবেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন,—ছন্দক! এসকল কাম্য কাম আমি অপরিমিত ও অনন্ত কল্প অনেক উপভোগ করিয়াছি, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ,—সমস্তই অনুভব গোচর করিয়াছি। দিব্য-ভোগ ও মানুষ-ভোগ উপভোগ করিয়াছি। তথাপি আমার তৃপ্তি হয় নাই, তৃষ্ণার অন্ত হয় নাই। পূর্ব্বে আমি চতুর্দ্বীপের রাজা হইয়া স্ত্রী-গৃহ মধ্যে বসতি করিয়াছি। ইন্দ্রত্ব করিয়াছি, যমত্বও করিয়াছি। আমি অনন্ত কাম উপভোগ করিয়াছি, কিন্তু আমার তৃপ্তি হয় নাই। ছন্দক! পূর্ব্বে অততেও তৃপ্তি হয় নাই, আজ কেন এই অল্পতর কামে তৃপ্তি হইবে? ছন্দক! আমি যাইব, নিশ্চিত যাইব, সংবিৎ পদে গমন করিব। ছন্দক, আমি দৃঢ়তর ধর্ম্মরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া এই ভয়ানক ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইব। জগৎকাণ্ড উত্তীর্ণ করিব, তুমি বাধা দিও না।

ছন্দক এবার অনেকক্ষণ রোদন করিলেন, অনন্তর বলিলেন, "তবে কি উহাই নিশ্চয়?

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, নিশ্চয়। শুন, ছন্দক! জীবের মোক্ষার্থ ও হিতার্থ আমি যাহা নিশ্চয় করিয়াছি, তাহা দৃঢ়, অচল, সুমেরুর ন্যায় অটল। কিছুতেই তাহা বিচলিত হইবে না।

ছন্দক পুনর্ব্বার দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্যপুত্রের নিশ্চয় কিরূপ দৃঢ়?

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, বজ্রের ন্যায়, অশনির ন্যায়, শক্তির ন্যায়, কুঠারের ন্যায় ও প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ়।

"বজ্রাশনি পরশু শক্তি শরাশ্ম বর্ষে
বিদ্যুৎপ্রভান জ্বলিতং কথিতঞ্চ লৌহং
আদীপ্তশৈল শিখরাঃ প্রপতেয়ুর্মূর্দ্ধি
নোবা অহং পুনর্জনেয় গৃহাভিলাষম্।

বজ্রপাত, অশনিবৃষ্টি, কুঠার শক্তি, শর ও শীলাবর্ষণ হইলেও আমি স্বাভিলাষ প্রচ্যুত হইব না। মস্তকে বিদ্যুৎ বজ্র, তপ্ত লৌহ ও প্রজ্বলিত শৈলশিখর নিপতিত হইলেও পুনর্ব্বার গৃহাভিলাষ উৎপাদন করিব না।

শুনিয়া ছন্দক অবাক্, নিস্পন্দ ও সংজ্ঞাহীন।

শ্রীরামদাস সেন

বোম্বে ও পুনা ভ্রমণ। (১)

নাগপুর হইতে অতি প্রত্যুষে যাত্রা করিলাম। পথে অনেক দৃশ্য দেখা গেল, কিন্তু বিশেষ বিস্ময়কর ও লোচনাভিরাম কিছু দেখা গেলনা। বিরার রাজ্যের গ্রামস্থ কুটীর নিচয় কৃষকদিগের দারিদ্র্যের পরিচয় দিতে লাগিল। এ রাজ্যের গ্রামগুলি বঙ্গদেশের পল্লীর ন্যায় বহুবিস্তৃত নয়। বঙ্গদেশের এক খানা বাড়ীতে যতটুকু স্থান অধিকার করে, তাহাতেই প্রায় এক খানা গ্রাম বসিয়াছে। এই গ্রামগুলির একটী বিশেষ লক্ষণ আছে; প্রায় প্রত্যেক গ্রামের মধ্যস্থলেই এক একটী অনতিবৃহৎ মৃণ্ময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইবে। প্রত্যেক গ্রামেই দুর্গ কেন? এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়। যখন পিণ্ডারী দস্যুরা তাহাদের অমানুষিক ক্রিয়াকলাপে মধ্যভারতকে বিজন অরণ্যে পরিণত করে, তখনই এই সমস্ত দুর্গ নির্ম্মিত হয়। তাহাদের ভগ্নাবশেষ আজও পিণ্ডারীদিগের দস্যুবৃত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গ্রামবাসীরা ইহাদের উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া, আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া, গ্রাম্য পাটেলকে এক প্রকার সৈন্যাধ্যক্ষে নিযুক্ত করিয়া, এক এক দল ক্ষুদ্র সৈন্যসহ ঐ সমস্ত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত। মধ্যভারত চিরকালই দস্যুদিগের নিবাসভূমি। আজ কালও তাঁতিয়া, ভীল ইংরেজ-শান্তিরক্ষকদিগের ভ্রূকুটীতে ভীত না হইয়া, স্বীয় বৃত্তির পরিচালনা করিতেছে। সংবাদপত্রে তাহার বহুল বিবরণ প্রচারিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্য। ঐ দুর্গগুলি সমস্তই মৃত্তিকা নির্ম্মিত, কিন্তু শুনিলাম, দৃঢ়তায় প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গকে পরাস্ত করে। এই সমস্ত বিবরণ ঐ প্রদেশীয় সহযাত্রী কোন মহারাষ্ট্রীয় যুবকের নিকট শ্রুত হই। সেই সময়ে, ব্রিটিসরাজ কি কূটনীতি অবলম্বন করিয়া এই রাজ্যটী নিজামের হস্ত হইতে গ্রহণ করেন, তাহার কালিমাময় ইতিহাস মনে হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও শষ্যক্ষেত্রের শষ্যসমৃদ্ধি দেখিতে দেখিতে দিনমনি অস্তাচলাবলম্বী হইলেন।

রজনী-মুখে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীস্থ ভোসোয়াল ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। তথায় গাড়ী হইতে নামিয়া বিশ্রাম গৃহে (Waiting room) কিছু কাল বিশ্রাম করিলাম, সেখানে কথঞ্চিৎ জলযোগও হইল। শেষে রাত্র নয়টার সময় মেলট্রেনের এক তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। স্থানাভাবে শয়ন দূরে থাকুক, বসিতেও যথেষ্ট কষ্ট হইতে লাগিল, সমস্ত রাত্রে একটু ঘুম হইল না। নিম্ন শ্রেণীর লোকের রসিকতায় মন প্রাণ ভাসাইয়া, রজনী অতিবাহিত করিলাম। রেলওয়ে কর্ম্মচারী ধবলকায় পশুদিগের দুর্ব্বল গরিব দুঃখীর প্রতি ২।১টী চিরপ্রসিদ্ধ অত্যাচারের উদাহরণ প্রত্যক্ষ করিলাম। উষাকালে ঐ গাড়ীস্থিত একটী মহারাষ্ট্রি ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তিনি ও বোম্বে যাত্রী। প্রাতকালে জানিতে পারিলাম, বহু পর্ব্বত শ্রেণী ভেদ করিয়া আসিয়াছি। তখন ভগ্না-

নক শীত বোধ হইতে লাগিল। বস্ত্রাদিতে সে শীত নিবারণ করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। রজনীর অন্ধকার বিদূরিত হইলে, কল্যাণ ষ্টেশনে আসিলাম। ইহার পরেই মহাদেশ ছাড়িয়া সালসিটি (Salsete) দ্বীপে উপস্থিত হইলাম। টানা প্রণালী এই দ্বীপটীকে মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। মহাদেশের সহিত একটী প্রকাণ্ড বাঁধ দ্বারা সংযোজিত।

এখান হইতেই বোম্বাইর শোভা সমৃদ্ধি দেখিতে আরম্ভ করিলাম, বোম্বাই, সালসিটী, এলিফাণ্টা ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ পাহাড় পর্ব্বতে পরিপূর্ণ, এখান হইতে সমুদ্রের শোভা কিছুই দেখা যায় না। ক্রমে ক্রমে নগরে কোলাহল শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল, কারখানা নিচয়ের ধূমোদগমনকারী চিমনি-শ্রেণী দেখা দিল। সহজেই বোম্বাই ভারতের সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্য-স্থান বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। লোকের ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয় অল্পেতেই পাইতে লাগিলাম। ২।১টী ষ্টেশন বাকী থাকিতে,একটী পারসী ভদ্রলোক ২।১খানা পুস্তক, কতকগুলি কার্ড হস্তে, আমরা যে গাড়ীতে ছিলাম, সেই গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। নানাবিধ আলাপ করিয়া শেষে বলিলেন, আমার একটী হোটেল আছে, সেখানে আপনারা স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন। হোলেটের প্রশংসা পত্রগুলি দেখিলাম। তন্মধ্যে হিন্দুপেট্রিয়টের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর একখানি প্রশংসাপত্র দেখিতে পাইলাম। আমরা হোটেলরক্ষককে বলিলাম যে,তাহার অভ্যর্থনায় যথেষ্ট প্রীত হইয়াছি, কিন্তু একটী মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক তাহাদের বাড়ীতে আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবেন, তাই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। ঐ উদ্দেশ্যে আর ও ২।১ টী লোক উপস্থিত ছিলেন।

ষ্টেসনে অবতরণ করিয়াই মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। ষ্টেসনটীর বর্ণনা স্থানান্তরে করা যাইবে। অনেক দিন হইল কলিকাতা ছাড়িয়াছি, লোকের ভীষণ কোলাহল, গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ অনেক দিন শুনিতে পাই নাই, এখানে আসিয়াই মনে হইল যেন আবার কলিকাতায় আসিয়াছি। ষ্টেসনের বাহির হইলে সে ভ্রম সহজেই অপনোদিত হইল। প্রথমে মনে করিলাম, ট্রামকারে গন্তব্যস্থানে যাইব তাই রাস্তার পার্শ্বে আসিলাম। ট্রামকারগুলি অতি সুন্দর, তবে কলিকাতার গাড়ী অপেক্ষা অনেক ছোট। ট্রামের গাড়ীতে এই কয়েক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাইলাম,—ঈষৎ বঙ্কিম টুপিযুক্ত পারসী, নানা রঙ্গে রঞ্জিত রেশমী সাঁড়ি-পরিহিতা পারসী রমণী, প্রকাণ্ড পাগড়ীযুক্ত মহারাষ্ট্রী; মাঝে মাঝে ২।১ জন অঙ্গরক্ষা-বিশিষ্ট ভাটিয়া, আর পূর্ব্ব পরিচিত গৌরাঙ্গেরা। শেষে ট্রাম গাড়ীতে যাওয়া হইল না, ভিক্টোরিয়া নামক ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। ভিক্টোরিয়া এক চমৎকার গাড়ী। কলিকাতার বড় বড় লোকেরাও এ রকম গাড়ীতে সান্ধ্যসমীরণ সেবনে যাইতে পারেন কিনা, সন্দেহ। ভাড়াও কলিকাতার ছেক্ড়া গাড়ীর ভাড়া অপেক্ষা নিতান্ত অধিক নয়। দেখিতে কতকটা বগী গাড়ীর মত, অতি সুন্দর ও পরিস্কার, তিন জন বসিতে পারে। এখানে আর এক শ্রেণীর ভাড়াটিয়া গাড়ী পাওয়া যায়,তাহাকে রেক্লা বলে। তাহাতে

নিতান্ত দরিদ্র লোকেরাই চলিয়া থাকে। এলাহাবাদের এক্কা গাড়ীর সহিত ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইলাম। যে বাড়ীতে গেলাম, সে একটী প্রকাণ্ড চৌতল বাড়ী। সেখানে অনেক গুলি ছাত্র নিবাস আছে। বলিতে হইবে না যে, আমরা একটী ছাত্র নিবাসেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ছাত্রদিগের সৌজন্য ও আতিথ্যে নিতান্ত আপ্যায়িত হইলাম। ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরেজী জানে, তাহাদের সহিত ইংরেজীতেই আলাপ চলিতে লাগিল; আর তাহা যাহারা না জানে, তাহাদের সহিত, আমাদের ভাঙ্গা হিন্দীতে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এত দিন মহারাষ্ট্রীয় দেশে বাস করিতেছি, কিন্তু লজ্জার বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত কথা বলা দূরে থাকুক, ছুটী কথা বুঝিতে পারি না। যে দেশে ভ্রমণ করিতে যাওয়া হয়, সে দেশের ভাষা না জানা অতি দুর্ভাগ্যের বিষয়। দেশ ভ্রমণ শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। তদ্দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতা ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য-সংসাধন পক্ষে একটী বিশেষ অন্তরায়। এসম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক লর্ড বেকন যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, ইহার প্রত্যেক বাক্যই সত্য।

"He that travelleth into a country before he hath some entrance into the language, goeth to school and not to travel."

যিনি দেশীয় ভাষায় কিঞ্চিত অধিকার লাভ না করিয়াই,কোন দেশে ভ্রমণ করিতে যান, তাঁহার পক্ষে ও ভ্রমণ ভ্রমণ নয়,বিদ্যালয়ে (ভাষা শিক্ষার জন্য) শিক্ষার্থ গমন করার ন্যায়। ভাষা সম্বন্ধে এই সঙ্গে ২।১টী কথা মনে হইতেছে। ভারতীয় জাতিসমূহ কালের গতিতে এক প্রকাণ্ড রাজনৈতিক জাতিতে পরিণত হইবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস, ইহাই আমাদের আশা। ভারতের সভ্যতা সময়ে জগতের সমস্ত সভ্যতাকে পরাভূত করিবে, ইহাও আমরা আশা করি। সেই শুভ দিনের চিহ্ন একটু একটু ভারতে প্রকটিত হইতেছে। তবে আশায় উদ্দীপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে, কতকগুলি বিষয় অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মগত বিভিন্নতা জাতীয় একতার একটী প্রধান অন্তরায়, সে অন্তরায় কোন দিন দূর হইবে কি না, কে বলিতে পারে? তবে আশা করি, রাজনীতিকে ধর্ম্মে পরিণত করিতে পারিলে এক প্রকার ধর্ম্মগত একপ্রাণতা জন্মিবে। তারপরে ভাষা;—যাহারা আমাদিগের কথা বুঝিতে পারে না এবং যাহাদের কথা আমরা বুঝিতে পারি না, তাহাদিগকে ভাই ভাই বলিয়া কি প্রকারে আলিঙ্গন করিব? যাঁহারা বঙ্গদেশের চতুঃসীমার বাহিরে যান নাই, তাহারা এই প্রশ্নের গাম্ভীর্য্য ও কাঠিন্য কখনও অনুভব করিতে পারিবেন না। মধ্যভারতের যে কোন স্থানে আসিবেন, সেখানেই ভারতের বিভিন্নভাষী লোক দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইবেন। ইহুদীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থোক্ত বেবিলনের টাওয়ার ধ্বংশের পর, লোক সমূহের যে দশা হইয়াছিল, ভারতীয় জাতি সমূহেরও কতক পরিমাণে সেই দশা। শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইংরেজীর সাহায্যে তাহাদের মনোভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করেন; কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার যতই বহুল প্রচার হউক

না কেন, ইহা কখনও কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী লোক পর্য্যন্ত পৌঁছিবে না। যদি কোন ভাষা এই দেশের জাতি সমূহের পরস্পরের ভাব-বিনিময়ের অধিকতর উপযোগী হয়, তাহা হিন্দিভাষা। তাই ভারতবাসী মাত্রেরই হিন্দিভাষা কিছু কিছু শিক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বোম্বাই অবস্থান কালে, কোন বন্ধু আমাদিগের নিকট প্রস্তাব করেন যে, বাঙ্গলা অক্ষরের পরিবর্ত্তে দেবনাগর অক্ষরে বাঙ্গলা পুস্তকাদি প্রচার করা কর্ত্তব্য, তাহাতে কিছুই অনিষ্ট হইবে না, বরং লাভ যথেষ্ট আছে। উদাহরণ স্থলে তিনি বলিলেন যে, এই বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে সমস্ত ভাষাগুলি সম্বন্ধে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে। কানাড়ী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী ইত্যাদি ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থাদি প্রচারিত হয়, তাহাতে ঐ পদ্ধতি অবলম্বিত হইতেছে। অবশ্য চিঠি পত্র লেখালেখি পূর্ব্বেও যে ভাবে হইত, এখনও সেই ভাবে হইতেছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, পরস্পরের ভাষা বুঝিবার পথ অনেক সুগম হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষার ধুরন্ধরেরা এই বিষয়টী একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি? নূতন বলিয়া প্রস্তাবটী অবহেলা করিলে চলিবে না, নূতন পথে নূতন ভাবে না চলিলে আমাদের গতি কি হইবে? এটী যে নিতান্ত দুষ্কর ব্যাপার তাহা নয়, বাঙ্গলা অক্ষর ও দেবনাগর অক্ষর প্রায় এক রকমই, বাঙ্গলা অক্ষর দেবনাগর অক্ষর হইতেই সমুদ্ভূত। পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিবেন; ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়া এসব কেন? কেবল কি দেখিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ না করিয়া, ভ্রমণ কালে যে সমস্ত ভাব ও চিন্তার স্রোত মনোমধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাও কথঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

তারপরে স্নান করিলাম, যদিও শীতের দিন, তবুও অনেক জলরাশি গাত্রে সিঞ্চন করিয়া সুস্থ হইলাম। এই স্থলে বোম্বের জল বায়ু সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিব। পাহাড় পর্ব্বত ভেদ করিয়া আসিতে পূর্ব্ব রাত্রে ভয়ানক শীত অনুভব করিয়াছি, কিন্তু প্রাতঃকালে বোম্বে আসিয়া দেখি, শীত একেবারে নাই। বোম্বের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। প্রায় সমস্ত বৎসর এক ভাবেই থাকে, কেবল মনসুন বায়ু প্রবাহিত হইলে একটু পরিবর্ত্তন হয়। জলবায়ু অতি মনোরম, শীত গ্রীষ্মের প্রখরতা একবারেই নাই। অতি প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে কলিকাতার বাবুরা যেমন গড়ের মাঠে, কি ইডেন উদ্যানে শরীর স্নিগ্ধ করিতে ভ্রমণ করেন, সন্ধ্যাকালে বোম্বের অনেকে সেইরূপ এই শীত কালে সমীরণ সেবনের জন্য সমুদ্রতীরে গমন করেন। রাত্রিকালেও লেপের প্রয়োজন হইত না।

তারপরে আহার্য্য উপস্থিত। যদিও ৩।৪মাস মহারাষ্ট্র দেশে অবস্থান করিতেছি, কিন্তু মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণদিগের খাদ্য এই বারে প্রথমে খাই। দস্তার একখানি থালায় কিছু আতব চালের ভাত, কয়েকখানা রুটী, পার্শ্বে একটু তুপ (ঘি) চিলি (লঙ্কা) ও সৈন্ধব লবণ, তরকারীর মধ্যে বেগুন, আলু ও পেঁয়াজ পূর্ব্ব পরিচিত, আর সমস্তই নূতন। বলিতে হইবে না যে, এখানকার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় পেঁয়াজ খাইতে কিছু আপত্তি করেন না। বরং ইহারা প্রচুরপরিমাণে পিয়াজ খাইয়া থাকেন। মৎস্য

মাংসাহারকে ইহারা প্রাণের সহিত ঘৃণা করেন। একটী বাটীতে কড়ি (দধি ও অন্যান্য জিনিষ মিশ্রিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের একটী উপাদেয় খাদ্য), আর একটী বাটীতে ডাল। মৎস্যাভাবে কিছুই অসুবিধা হইল না। নাগপুরে থাকিতে২ প্রায় নিরামিষাশী হইয়া উঠিয়াছি। আহারের সমস্ত সময় কয়েকটী মহারাষ্ট্রীয় বালক পার্শ্বে বসিয়া থাকিল। ইহাও তাহাদিগের আতিথেয়তার একটী নিদর্শন। আহারান্তে তাম্বুল ভক্ষণ করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিলাম। তার পরেই নগর দর্শনে বাহির হইব। ভিক্টোরিয়ার জন্য অর্ডার হইল। নগরটী দেখিলেই কলিকাতা হইতে অনেক সমৃদ্ধিশালী বলিয়া মনে হয়। বাড়ীগুলি দেখিতে একেবারে ছবির ন্যায়, অত্যন্ত পরিষ্কার, কলিকাতার নেটিভ্ কোয়ার্টর অপেক্ষা ইহার সমস্ত অংশই সুন্দর। এখানে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট নেটিভ কোয়ার্টর নাই। বাড়ীগুলি প্রায় ৬।৭ তলা। যথা সময়ে ভিক্টোরিয়া উদ্যানে উপস্থিত হইলাম। এটী ইডেন উদ্যান অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এখানে একটী পশুশালা আছে। কলিকাতার পশুশালার পশু সংখ্যা অপেক্ষা এখানকার পশুর সংখ্যা অনেক কম, তবে এখানে কয়েকটী অতি বৃহৎ ব্যাঘ্র দেখা গেল। এখানকার সিংহটী খুব বড় ও অত্যন্ত বলশালী। আমরা যখন গেলাম, তখন পশুরাজ লোক-কোলাহল অগ্রাহ্য করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ভিক্টোরিয়া উদ্যান দেখিয়া বোম্বের এলফিন্ষ্টোন কলেজ (বোম্বের প্রেসিডেন্সি কলেজ) দেখিতে গেলাম। কলেজ তখন বন্দ, একটী ভৃত্য আমাদিগকে সকল দেখাইতে লাগিল। কলেজের ঘরটী প্রেসিডেন্সী কলেজের ঘর অপেক্ষা আয়তনে ছোট হইলেও, শোভা ও সৌন্দর্য্যে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।

প্রথমে ছাত্রদিগের বসিবার স্থান দেখিলাম। সমস্তগুলিই ক্রমোচ্চ (Gallery); কেবল বিজ্ঞান শ্রেণীর স্থান নয়। অধ্যাপকের দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা করিবার স্থান গুলিও বেশ পরিপাটী। গৃহটী চৌতল, উহার মধ্যে কলেজের ব্যয়ে প্রতিপালিত ছাত্রদিগের (Fellows) থাকিবার বন্দোবস্ত আছে। তখন কয়েকটী ছাত্র সেখানে ছিল, তাহারা মৌমাছির ন্যায় ভন্ ভন্ শব্দ করিতেছিল; অর্থাৎ পরীক্ষার জন্য ইংরেজী গলাধঃকরণ করিতেছিল। পুস্তকাগার (Library) দেখিলাম, বেশ্ জাঁকালো রকমের। প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরী অপেক্ষা ছোট বোধ হইল। একখানি টেবিলে বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র গুলি দেখিতে পাইলাম। এ বন্দোবস্তটী বেশ। বিজ্ঞাপন বোর্ডে অনেক বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইলাম, সমস্তই অধ্যাপক ওয়ার্ডসোয়ার্থের নামাঙ্কিত, তিনিই কলেজের অধ্যক্ষ। সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাকে মনে মনে নমস্কার করিলাম, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময়াভাবে হইয়া উঠিল না। কলেজ গৃহের উচ্চতম স্থানে যাইয়া নগরের শোভা ও আরব সাগরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম।

সেখান হইতে ট্রাম গাড়ীতে ক্রফোর্ড মারকেট (Crawford market) বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইটী বোম্বের মিউনিসিপ্যাল মারকেট; দেখিতে অতি সুন্দর, আর সেদিনকার সাজ সজ্জার কথা কি বলিব? সমস্ত বাজারটী ফুলমালায় সুশোভিত,

কেননা সেই দিন বড় দিন। কলিকাতার মিউনিসিপাল মারকেট অপেক্ষা এটা অনেক বড়। ইহা নির্ম্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছে। মিঃ ক্রফোর্ড অর্থাৎ যাহার নামে এই বাজারটী পরিচিত, তিনি নাকি আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ইহা নির্ম্মাণে যথেচ্ছ ভাবে সাধারণের বহুল অর্থ অপব্যয় করিয়াছিলেন। নিরো, সিরাজদৌল্লা প্রভৃতি অনেক ভূপতি আপনাদের নারকীয় ক্রিয়া কলাপ দ্বারা আপনাদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন! ধন্য যথেচ্ছাচার! সেখানে যৎকিঞ্চিৎ ফল ক্রয় করিয়া, প্রিন্সেস্ ডক দেখিতে চলিলাম। সেটী একটী বিস্ময়কর দৃশ্য বটে। এখানে আসিয়া বুঝিলাম, ইংরেজ জাতি কেন সমুদ্রের অধীশ্বর। অপার জলনিধি প্রিয় সন্তানের ন্যায় কেন ইহাদিগকে ক্রোড়ে রক্ষা করে, কেন তাহারা এত ধনী, আর কোন্ শক্তি প্রভাবে ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী মুষ্টিমেয় লোক এই সুজলা সুফলা কোটী কোটী নর নারীর নিবাস ভূমি ভারতরাজ্যকে অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন করিতেছে। ডকটী বাহু প্রসারণ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ তরী সমূহকে ক্রোড়ে গ্রহণ করে। এখানে বাণিজ্য দ্রব্য গুলি অবতারিত হয়। অনেকগুলি জাহাজ ডকে ছিল, একখানি জাহাজে উঠিয়া কতকক্ষণ তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলাম। এ স্থানের বর্ণনা করা আমার অসাধ্য, কারণ ইহার সহিত উপমা দিবার কোন বস্তু কলিকাতায় নাই। এটা যথেচ্ছ ভাবে সঞ্চালিত করা যায়। খিদিরপুরের ডক্ নির্ম্মিত হইলে ইহার তুলনার যোগ্য কিছু হইলেও হইতে পারে। তার পরে কোলা বা লাইট হাউস (Light house) অর্থাৎ আলোক মঞ্চ দেখিতে গেলাম। রজনীতে এখানে একটী প্রকাণ্ড আলোক বর্ত্তিকা, সমুদ্রস্থিত তরী সমূহের দিক্‌নির্ণয়ের ও বন্দরে প্রবেশের সহায়তা করে। সে অনেক দূর, সেখানে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি না পাইয়া উপরে উঠিতে পারিলাম না। সেখানে একটী লোক দূরবীক্ষণ যন্ত্র হস্তে, সমস্ত দিন, জাহাজের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে এবং নানাবিধ সংকেতাদি করে। সেখানে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। এ সহরে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদ্র তীর দিয়া রেল গিয়াছে। শুনিয়াছি, লণ্ডন নিউইয়র্ক প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় ও আমেরিক প্রধান প্রধান নগরে এ প্রকার বন্দোবস্ত আছে। ১৫ মিনিট অন্তরই এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে গাড়ী যায়। প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে কখনও উঠি নাই; তাই বড় সাধ করিয়া প্রথম শ্রেণীর টিকিট্ কিনিলাম, ব্যয় তিন আনা। পাঁচ মিনিট গাড়ীতে ছিলাম। তারপরে কিছু কাল পদব্রজে চলিতে হইল। পথ পার্শ্বে একটী পারসী ধর্ম্মমন্দির, আলোক মালায় সুশোভিত দেখিলাম। এই মন্দির গুলিকে আগাড়ি বলে। এখানে একটী বিবাহ হইতেছিল, তাই এত ঘটা। পারসীদের আচার ব্যবহার যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই বোধ হইতে লাগিল, ইহাদের রুচি অনেক পরিমার্জ্জিত।

শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস।

কেন এ জীবন ?

(১)

প্রকৃতির বিজ্ঞ সুত বিজ্ঞানের মুখে
জীবন রহস্য কথা চাহিনা শুনিতে।
লোকস্থিতি, আত্মস্থিতি,
শান্তি, সুখ, বিশ্বপ্রীতি,—
তাহাই সাধিতে প্রাণ আছে সদা ঝুঁকে ?
বুঝিয়াও সেই ভাষা পারিনা বুঝিতে।

(২)

কারে বা অরণ্য বল, কারে বল গেহ ?
কারে বা জীবন বল, কারে বা মরণ ?
কারে বল ভালবাসা, কারে বল স্নেহ ?
কারে বল মুক্তি, তুমি, কারে বা বন্ধন ?

(৩)

শুধুই এ বিশ্ব কি গো মানব ভবন ?
অদৃশ্য কীটাণু যারা,
পায়নি জীবন তারা ?
বৃথা কি স্থিতির মন্ত্র পড় অনুক্ষণ ?

(৪)

গড়িতে প্রাসাদ তুমি
বিনাশিছ বন ভূমি ;
কাঁদে কুকী, কাঁদে ভীল, কাঁদে জুলু, সেহ (১)
কারেবা অরণ্য বল, কারে বল গেহ ?

(৫)

তোমার কামনা সিদ্ধি,
ক্ষুধাশান্তি, আয়ু বৃদ্ধি,
যন্ত্রণায় কিন্তু হোথা কাঁদে জীবগণ ;
কারে বা জীবন বল, কারে বা মরণ ?

(৬)

লভিবারে ধন ধান্য,
মুষিকে আবাস শূন্য
করি আজি হল-মুখে, কাঁদে কবি কেহ (২)

(১) Saho জাতি। (২) Burns.

মানবের অধিকার,
ধিক্ তাহে শতবার !
কারে বল ভালবাসা, কারে বল স্নেহ ?

(৭)

আছ সবে হৃষ্ট মনে,
উন্নতির সিংহাসনে ;
তবু কেন কাঁদে আজি যোগী সৌদ্ধোদন ?
কারে বল মুক্তি তুমি, কারে বা বন্ধন !

(৮)

হের হোথা কুরুক্ষেত্রে,
যুধিষ্ঠির সাশ্রুনেত্রে
কহিছে, সাম্রাজ্যে তার নাহি প্রয়োজন !
এই কি বিশ্বের শান্তি, দুষ্টের দমন ?

(৯)

কে বুঝাবে, কে বলিবে, কেন এ জীবন ?
কেন এসংসারে আসা,
কেন প্রীতি, ভালবাসা ?
কেন গো মুক্তির নামে দারুণ বন্ধন ?
শোধিতে কাহার ঋণ,
বৃথায় কাটিছে দিন ?
আত্মোন্নতি ? পরসেবা ? পারিনা বুঝিতে।
সাধিতে একের হিত,
আঘাতি অন্যের চিত ;
উন্নতির নামে, সদা হতেছে যুঝিতে ;
সে যুদ্ধের অবসান,
না হোতে ; না পেতে প্রাণ
কল্যাণ,—চরম লক্ষ্য ; আসেরে মরণ।
কে বুঝাবে, কে বলিবে, কেন এজীবন ?

(১০)

এই যে মস্তিষ্ক মম,
স্নায়ুচক্র, রক্ত ক্রম,—

আশাময় জীবনের এই কি পরিধি ?
কর্ত্তব্যের উপাসনা,—
সেকি শুধু বিড়ম্বনা ?
শেষ মাত্র স্মৃতিশূন্য মৃত্যুর বারিধি ?
কেন তবে এ সংসার ?
যদি শুধু অন্ধকার—
যদি শুধু সজ্ঞাহীন মৃত্যু পরিণাম— ?
হে প্রকৃতি, হে ঈশ্বর,
ভাঙিলে মাটীর ঘর,
জীবন লীলার হায় হবে কি বিরাম ?

(১১)

হায়রে কেন বা তবে
জীবন, বিকাশে ভবে ?
কেন এ চৈতন্যময় প্রেমের সর্জ্জন ?
সকলি কি মোহ মায়া ?
—বৃথা কল্পনার ছায়া ?
কে বলিবে, কেন গো এ সোণার জীবন ?

(১২)

দাম্ভিক বিজ্ঞান বলে,—
এই শেষ মহীতলে ;
জীবন ফুরালে রহে কেবল মরণ।
আকাঙ্ক্ষার, কামনার,
সেই শেষ দুর্নিবার,
জগতের পরিণাম এমনি ভীষণ ! !
সুগন্ধ বিস্তার করি,
কুসুম, পড়িলে ঝরি,
রহিবে যে ফল তার, সেই পরকাল ;
এ দেহের শেষ হোলে,
রবে স্মৃতি ধরাতলে ;
গতিরূপে,—দোষে, গুণে,—বংশে চিরকাল !
জীবাত্মর বংশধর,
বিকশিত যত নর,
যত রূপে, যত গুণে, দেখিছ ভূষিত,
তিল তিল পরিমাণে,
হোয়েছে তাহার প্রাণে
সে উন্নতি, বিশ্বগতি হোতে সংক্রামিত।
অক্ষয় সমাজস্তরে,
লেখা থাকে স্বর্ণাক্ষরে
পূর্ব্ব পুরুষের গুণ, মহিমা—উজ্জ্বল ;
উন্নতি সঞ্চারি ভবে,
অস্থি মজ্জা ভস্ম হবে ;
জীব বংশে জীব রবে, এই শেষ ফল।

(১৩)

শুনেছি অনেক বার,
শুনিতে না চাহি আর,
প্রত্যক্ষ-বিনাশী এই প্রত্যক্ষ পুরাণ
উন্নতির বাড়ে বুক,
সমাজের হয় সুখ ;
কিন্তু কোথা ডুবে যায় প্রত্যক্ষ পরাণ ?

(১৪)

অর্দ্ধ প্রাণ আত্মগত ;
অর্দ্ধ, পর সেবা রত ;
আত্ম ছাড়া নাহি পর, নিশ্চয় সন্ধান।
জীবন ফুরালে, ভবে
পর-সেবা একা রবে ?
আত্ম আকাঙ্ক্ষার তবে কোথায় প্রয়াণ ?
সকলেরি পরিণতি,
অক্ষয় অমর গতি;
আত্ম আকাঙ্ক্ষার একা নিস্ফল ক্রন্দন ?
শ্রীকৃষ্ণ, জৈমিনি, প্লেটো,
বুদ্ধ, খৃষ্ট, দুঃখী কেটো,
তোমরা বল গো শুনি কেন এ জীবন।
কেন এ সংসারে আসা,
কেন প্রীতি ভালবাসা,
কেন এ চৈতন্যময় আকাঙ্ক্ষা আত্মার ?
বিজ্ঞানের জড়বাদ,
শুনিলে পোরেনা সাধ,

তোমরা বলগো মোরে কি হবে আমার।
এ দেহের হলে শেষ,
ধরিয়া কি নব বেশ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পথে ছুটিব তখন?
তোমরা বল গো মোরে কেন এ জীবন!

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

হিন্দুসমাজের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা। (৩য়)

(ধর্ম্ম)

উপনিষৎ বা আরণ্যক সকল বেদের অন্তিমভাগে নিবিষ্ট, সেই নিমিত্ত ইহারা বেদান্ত নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে উপনিষতের সংখ্যা শতাধিক। কিন্তু প্রধান উপনিষৎ দশ খানি, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য এবং ছান্দোগ্য। ইহাদিগের মধ্যে আকারে বৃহদারণ্যকই বৃহৎ। একজন সুবিজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু পাঠক যদ্যপি হিন্দুধর্ম্মরূপ সুশোভন উদ্যানের আদ্যন্ত সকল স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ইহার তত্ত্বকুসুম সকল আহরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি প্রথমেই ছন্দোবিভাগে ইন্দ্র, বরুণ, দ্যৌ, উষা, মাতরিশ্বা প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থপুঞ্জের স্তুতিবন্দনার মধ্যে আর্য্যঋষিগণের অবিমিশ্র আর্জ্জব ভাব, অজ্ঞানতা এবং মনোবৃত্তির অপরিপক্বতা দর্শন পূর্ব্বক দ্বিতীয় স্তরে পদার্পণ করিবেন। এবং তথা হইতে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকময় এই উপনিষৎ ক্ষেত্রের উপরে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইবে। তিনি এক দিকে ইহার শোভা এবং সৌন্দর্য্য এবং অপর দিকে গাম্ভীর্য্য এবং সারবত্তা-দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন। ইহার প্রতি পরিচ্ছেদে আর্য্যঋষিদিগের সুমার্জ্জিত চিন্তা শক্তির বিকাশ এবং সমুজ্জ্বল জ্ঞানচ্ছটা বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। উপনিষৎ সকল পাঠ করিতে করিতে পূজ্যপাদ ঋষিগণের গভীর ব্রহ্মানুরাগ, চিন্তের সূক্ষ্মদর্শিতা এবং পরমার্থ-তত্ত্বে গাঢ়াভিনিবেশ দর্শনে বিস্ময়ে মোহিত হইতে হয়। অধিক কি, আজ পর্য্যন্ত জগতের বিভিন্ন ভাষা এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে যত প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছে, উপনিষৎ সারবত্তায় সে সকলের শীর্ষস্থানীয়। উপনিষদের ন্যায় এমন সারবান মহামূল্য ব্রহ্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র অদ্যাপি মানবজাতির মধ্যে প্রচারিত হয় নাই। বালক-স্বভাব অজ্ঞান ব্যক্তি সাগরতটের বেলা-ভূমি-মধ্যে বালুকারাশি অন্বেষণ করিতে করিতে,অকস্মাৎ রত্ন-খণ্ড দর্শন করিয়া যেমন তাহা বিশেষ যত্নে লইয়া গিয়া রক্ষা করে, ভারতের সরল-স্বভাব বৈদিক মুনিগণ সেইরূপ অগ্নি, বায়ু, মেঘ, সূর্য্য, আকাশ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ-পুঞ্জের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সেই সকল পদার্থের রচয়িতা এবং নিয়ন্তা সত্যপুরুষকে দর্শন করিয়া পরম যত্নে এই উপনিষৎ রূপ সুরম্য গৃহে রক্ষা করিয়াছেন। ভারতের সনাতন ব্রহ্মজ্ঞান এই গৃহে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উপনিষৎ সকল অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রহ্মমীমাংসায় পরিপূর্ণ। বিশ্বের রচয়িতা

পরমেশ্বর যে অরূপী অতীন্দ্রিয় চৈতন্য-স্বরূপ এবং অজ ও অমর, তাহা উপনিষৎকার ঋষিরা অতি বিষদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন; এবং সেই জন্মবিহীন ভূমা পুরুষই যে মানবাত্মার মুক্তি ও ইহপারলৌকিক সৎগতির একমাত্র কারণ,তাহাও উপনিষৎ মধ্যে সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপনিষৎ মধ্যে আরও একটী অতি মহৎ সত্য প্রচারিত হইয়াছে। সেটী এই যে, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাক্ষাৎ অব্যবহিত সম্বন্ধ; এতদুভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, কোন গুরু নাই, কোন গ্রন্থ নাই। পুত্র যেমন অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া সাক্ষাৎভাবে পিতার নিকটে উপস্থিত হইতে পারে, মানবাত্মাও সেইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ দ্বারা সাক্ষাৎভাবে পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে পারে। উপনিষৎ ভিন্ন এমন মহামূল্য সত্য আজ পর্য্যন্ত কি কোরাণ, কি বাইবেল, জগতের কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রচারিত হয় নাই। উপনিষদ্রচয়িতা ঋষিগণের ব্রহ্মজ্ঞান এতদূর উজ্জ্বল হইয়াছিল যে, তাঁহারা বলিয়াছেন, পরমেশ্বরকে যে কেবল জীবাত্মা জানিতে পারে তা নয়, কিন্তু জীবাত্মা তাঁহাকে দেখিতে পারে, স্পর্শ করিতে পারে, উপভোগ করিতে পারে, তাহাতে সঞ্চরণ এবং রমণ করিতে পারে। সেই অনন্ত ভূমামহান্ পুরুষের সহিত মর্ত্ত্যবাসী ক্ষুদ্র মনুষ্যের যে এমন নিকটতর, ঘনিষ্টতর সম্বন্ধ,তাহা উপনিষৎ, মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। মানবাত্মা যে অক্ষয়, অবিনাশী, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, এ সত্যও উপনিষদের ঋষিরাই উজ্জ্বলরূপে ধারণা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন উপনিষৎ মধ্যে ঋষিদিগকে আর একটী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায়,সেটী সৃষ্টি তত্ত্ব। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মৌলিক অবস্থা কি, এবং সেই অবস্থা হইতে একেবারে না পারম্পর্য্যভাবে এই বিশ্বচরাচর রচিত হইয়াছে, এ বিষয়ে ঋষিগণ ইহার মধ্যে সুযুক্তিযুক্ত চিন্তা ও গবেষণার অবতারণা করিয়াছেন। অনেকের ধারণা যে, উপনিষৎপ্রণেতা ঋষিগণ জীবব্রহ্মে অভেদত্ব—জীবাত্মা পরমাত্মার একত্ব সমর্থন করিয়াছেন। উপনিষদে অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, এরূপ ধারণা অমূলক। মহর্ষি তলবকার বিদিত এবং অবিদিত সকল প্রকার পদার্থ হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন; যথা "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" অর্থাৎ তিনি বিদিত অবিদিত সকল প্রকার বস্তু হইতে ভিন্ন।

উপনিষৎ মধ্যে যদিও পরব্রহ্মকে সর্ব্বতোভাবে অরূপী চিৎস্বরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায়,স্থানে স্থানে রূপকচ্ছলে সেই নিরাকার পুরুষের রূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। এ সকল হৃদয়গত কবিত্বভাবের আবেশ বই আর কিছুই নহে। মুণ্ডকঋষি একস্থানে সেই নিরাকার সত্য পুরুষের এইরূপ রূপ বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—

অগ্নি মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ
শ্রোত্রে বাগ্ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণোহৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবীহ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ

অর্থাৎ অগ্নি (স্বর্গ) তাঁহার মস্তক; চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষুদ্বয়; দিক সকল তাঁহার শ্রোত্র, বেদ সকল তাঁহার বাক্য, বায়ু তাঁহার

প্রাণ, সমস্ত জগৎ তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার চরণ, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। এরূপ বর্ণনায় কোন অনর্থের সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত এতৎদ্বারা ঈশ্বর-স্বরূপ মানব-অন্তরে উজ্জ্বল রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। উপনিষৎ সকল যখন ভিন্ন ভিন্ন ঋষির দ্বারা রচিত, তখন সকল উপনিষদের যে সকল বিষয়ে এক মত হইবে, এরূপ কখনই বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক, ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে এমন মহামূল্য তত্ত্ব সকল যাঁহাদিগের চিন্তা হইতে প্রসূত হইয়াছে, তাঁহারা যে অসাধারণ প্রতিভাশালী,—অধিক কি, মানব জাতির ধর্ম্ম পথের পথপ্রদর্শক স্বরূপ তাহাতে আর সংশয় কি? এই স্থানে বেদোক্ত ধর্ম্মের বিষয় সমাপ্ত হইল। সুবিজ্ঞ পাঠক মহাশয় এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বৈদিক ধর্ম্মের তিনরূপ অবস্থা। প্রথম অবস্থা, ছন্দোবিভাগে ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থের উপাসনা; দ্বিতীয় অবস্থা, ব্রাহ্মণ বিভাগে দর্শ পৌর্ণমাস; অশ্বমেধ, অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি বহুবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। তৃতীয় অবস্থা, উপনিষদে উজ্জ্বল বিশুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞান।

বেদের পর স্মৃতি; বেদার্থের স্মরণ করিয়া এই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সেই জন্য ইহাদিগের নাম স্মৃতি। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত প্রভৃতি কুড়িজন ঋষির প্রণীত স্মৃতিই প্রধান এবং প্রামাণ্য। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে স্মৃতির প্রভুত্বে ক্রিয়া কাণ্ড সকল অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা এই বিংশতিজন পণ্ডিতের মধ্যে এক জনেরও প্রণীত নয়, তাহা নবদ্বীপের রঘুনন্দন নামক জনৈক স্মার্ত্ত পণ্ডিতের রচিত। স্মৃতি শাস্ত্র সকল বর্ণ বিচার, আশ্রম ধর্ম্ম, গার্হস্থনীতি, উপনয়ন, উদ্বাহ প্রভৃতি বিষয় সকলের বিচার ও ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ। এ সকল গ্রন্থে যখন নিরপেক্ষ ভাবে ধর্ম্মমত বর্ণিত হয় নাই, তখন ইহাদিগের নিকট হইতে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট অভিপ্রায়ের আশা করা যাইতে পারে না। তথাপি এই সকল গ্রন্থ সর্ব্ব-সম্মতরূপে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকেই বিশ্বের রচয়িতা এবং পরিত্রাণের একমাত্র কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। এই বিংশতি স্মৃতির মধ্যে মনুস্মৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং প্রামাণিক। এমন কি, মনুর বিপরীত যে মত, তাহা হিন্দুর নিকট অশ্রাব্য এবং অগ্রাহ্য। মনুসংহিতার প্রভুত্ব সর্ব্বোপরি। এই মনুসংহিতায় পরব্রহ্মকেই মানবের উপাস্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ।

অর্থাৎ আত্মা যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই পরব্রহ্মই উপাস্য। মহর্ষি মনু পরমেশ্বরকে আত্মার মূল স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মনু ব্রহ্মোপাসনার এতদূর পক্ষপাতী ছিলেন যে, একস্থলে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। যথা—

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠঃ নরেষু ব্রাহ্মণা স্মৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ।"

মনুসংহিতা।

অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে কীটাদি প্রাণী শ্রেষ্ঠ, প্রাণিদিগের মধ্যে বুদ্ধিজীবী জীব-সকল শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিজীবীর মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের মধ্যে

বিদ্বান ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, বিদ্বানদিগের মধ্যে যাঁহারা শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-বিশিষ্ট তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা ঐ কর্ত্তব্যের জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। মনুস্মৃতিতে এইরূপে ব্রহ্মবাদী ব্যক্তির সর্ব্বোপরি প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনু নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

নিস্তারায় তু লোকানাং স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ব্যাস রূপেণ কৃতবান পুরাণানি মহীতলে॥

অর্থাৎ নারায়ণ লোকদিগের নিস্তারের নিমিত্ত স্বয়ং ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলে পুরাণ শাস্ত্র সকল প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণ সকলের মধ্যে যেরূপ মত-বৈসদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহাতে কখনই ঐ সকলকে এক ব্যক্তির রচিত বলা যাইতে পারে না। অধিক কি, পুরাণ সকলের মধ্যে এরূপ প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষের ছবি অঙ্কিত আছে, যাহা পাঠ করিলে কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তিই ইহাদিগকে ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ-রচয়িতা বলিয়াছেন—"তথা সর্ব্ব-পুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমে বচ" অর্থাৎ সকল পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ প্রতিপুরাণকার অন্যান্য অপেক্ষা আপন আপন পুরাণের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাতে আরও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সকল পুরাণ কখনই এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত নয়। অমরকোষ অভিধানে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; সে পঞ্চ লক্ষণ এই—সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তরঃ এবং বংশানুচরিত। প্রচলিত পুরাণ সকল অমরকোষের বর্ণিত পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত নয়, সেজন্য অনেক সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিবিধ প্রমাণের দ্বারা প্রচলিত পুরাণ সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী একরূপ পুরাণের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাহা হউক, বর্ত্তমান পুরাণ সকল যখন আমাদিগের আলোচ্য, তখন তাহারই অনুসরণ করা যাউক। পদ্মপুরাণ-কর্ত্তা সমুদায় পুরাণকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন; সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। যে সকল পুরাণ বিষ্ণুপ্রধান অর্থাৎ যাহাতে বিষ্ণুমাহাত্ম্য বিশেষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সকল পুরাণ সাত্ত্বিক; এবং শিবপ্রধান পুরাণসকলকে তামসিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল যে এই কথা বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, তা নয়। বিশেষ নিন্দাবাদ এবং ঘৃণার সহিত শিবপ্রধান পুরাণগুলিকে নিরয় সাধন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পুরাণ সকল পাঠ করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, পুরাণকর্ত্তা ঋষিগণ আখ্যায়িকাস্থলে অনেক ধর্ম্ম প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন প্রত্যেকেই আপন আপন আরাধ্য দেব দেবীর বা মনুষ্য বিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব (অবতারত্ব) প্রতিপাদন বা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এক এক খানি পুরাণ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। বিশেষ ভাবে দেব দেবীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্যই যে পুরাণ সকল রচিত হইয়াছে, তাহা তাহাদের নামেই বুঝা যাইতেছে; যথা শিব পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, কালিকা পুরাণ ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ পুরাণে বিশেষ বিশেষ দেবতার মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণে বিষ্ণু মাহাত্ম্য,

মৎস্য কূর্ম্মাদিতে শিবমাহাত্ম্য, মার্কণ্ডেয় কালিকাদিতে শক্তি মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণ সকলের কোন কোন স্থল এরূপ অসংলগ্ন অযৌক্তিক বর্ণনা এবং কাল্পনিকতার আবেগে পরিপূর্ণ যে, ইহা হইতে কোন বিষয় নিরূপণ করা দুর্ঘট। কিন্তু তথাচ পুরাণ-রচয়িতা ঋষিগণ নিজ নিজ আরাধ্য দেব দেবীর বা মনুষ্য বিশেষের অথবা স্তুতিবাদ, বা সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধে তাহাতে অমানুষিক গুণাবলী আরোপণ করিতে গিয়া অমূলক কল্পনা-সহচর সঙ্গে ভ্রান্তি-সলিলে নিমজ্জিত হইয়াও,সেই পরাৎপর উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তনে বিস্মৃত হয়েন নাই। পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মোপাসনাই সার-ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদিও তাহাদিগের মধ্যে বহুদেবপূজা এবং বহুদেবতার মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত আছে; তথাপি পুরাণ-প্রবর্ত্তক ঋষিগণ নিরাকার চিৎ-স্বরূপ পরম ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

তত্ত্বকৌমুদীর উত্তর।

যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ নামক প্রবন্ধের প্রথমাংশ প্রকাশিত হওয়ার পরই ব্রাহ্মসমাজের শাখা বিশেষের কতকগুলি সভ্যের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই প্রকার আন্দোলনে বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া,আমরা প্রথমে বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই বুঝিলাম, এ আন্দোলন নব্যভারতের সম্পাদককে অপদস্থ করিবার জন্য উঠিয়াছে। গালাগালি, তিরস্কার, শ্লেষোক্তি—ঘাটে, পথে, সভায়, অসভায়, নব্যভারতের সম্পাদকের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। ইহাতেও শেষ নাই। নব্যভারতের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে অনুরোধ এবং শ্লেষোক্তি ও বিদ্বেষ ভাব পূর্ণ পত্র মফঃস্বলের বন্ধুগণের নিকট প্রেরিত হইল—কোন কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল! তারপর কমিটীর দ্বারে অভিযোগ চলিল! এ সকলের কারণ এই, নব্যভারতের সম্পাদক একজন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত লোক হইয়াও কেন ঘরের কথা বাহিরে প্রকাশ করিলেন! একটা অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ লইয়া যখন বন্ধুদিগের মধ্যে এইরূপ বিদ্বেষভাব পূর্ণ আন্দোলন চলিল, তখন আমরা সংস্কার সম্বন্ধে কিছু নিরাশ হইলাম। দোষ-সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া, দোষ-উল্লেখকারীর প্রতি অত্যাচার বর্ষণ করা, কিরূপ লোকের কার্য্য, পাঠকগণ বিচার করুন। দুই দশ জন ব্রাহ্মনামধারী নব্য লোকের মধ্যেই যদি এই আন্দোলন নিবদ্ধ থাকিত, আমরা কোন কথাই বলিতাম না। যখন দেখিতেছি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপাত্র, তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক, সম্পাদকীয় স্তম্ভে, এ সম্বন্ধে প্রকৃত সমালোচনার পরিবর্ত্তে, শ্লেষোক্তি বর্ষণ করিতেছেন, তখন আর আমাদিগের নীরবে থাকা যুক্তিযুক্ত মনে

নয় ;—আমরা কোন দিন কোন সমাজকে "ঘর", বা "মিত্র" এবং কোন সমাজকে "বাহির" বা "শত্রু" বলিয়া ব্যক্ত করি নাই। ব্যক্তিগত দায়িত্ব হইতে সম্পাদকীয় দায়িত্ব যে সম্পূর্ণ পৃথক্, একথাটী অনেকেই বুঝেন না। নব্যভারতের সম্পাদক ব্রাহ্ম হউন, খ্রীষ্টান হউন, যাহা হউন, তাহা হউন, নব্যভারত কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কাগজ নয়। এই বিস্তৃত ভারতভূমির প্রতি পরিবার, প্রতি সমাজ, প্রতি দেশ—আমাদের ঘর ;—আমাদের মিত্র। তত্ত্বকৌমুদী সম্প্রদায় বিশেষের কাগজ, তিনি "ঘর বাহির, শত্রুমিত্র" গণনা করিতে পারেন, করুন ; আমাদের পক্ষে "বাহির" কিছুই নয়, "শত্রু" কেহই নন। কেহ যদি আমাদিগেকে শত্রু মনে করে, তবুও আমরা তাহাকে এই পাপ মুখে শত্রু-আখ্যা প্রদান করিতে পারি না। সম্পাদক মহাশয় যে আইনানুসারে বিজ্ঞত্বের বড়াই করিয়াছেন, সেই আইন এস্থলে যে কেন ভুলিলেন, আমরা বুঝিনা।

এখন আমরা দেখিব, সম্পাদকের অভিজ্ঞতা কি বলিতেছে ;—"ব্রাহ্মসমাজ স্বর্গ নহে, অথবা স্বর্গ হইলেও, স্বর্গেও কদাচিৎ অসুর প্রবেশ করে।" অনেক আড়ম্বরের পর সম্পাদক মহাশয় গলদ ধর্ম্ম ফেলিয়া স্বীকার করিলেন যে, "ব্রাহ্মসমাজ স্বর্গ নহে।" বেশ কথা। তবে আর এত দেশ-ছাওয়া বিস্ময় কেন? ব্রাহ্মসমাজের "অসুরদের" কথাই ত আমরা বলিয়াছি, দেবতাদের কথা ত বলি নাই। অসম্পূর্ণ প্রবন্ধের একাংশ পড়িয়াই সম্পাদক মহাশয় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছেন। আমরা অন্য স্থানে দেখাইব যে, "যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ" প্রবন্ধ যে স্বামী ও স্ত্রী নামক প্রবন্ধের উপসংহার, অভিজ্ঞ সম্পাদক সেই প্রবন্ধটীও পড়েন নাই। "কোন কোন স্থলে ইহাও দেখিয়াছি"—ইত্যাদি কথায় কিছু সমগ্র ব্রাহ্মসমাজকে বলা হয় না। আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধের দুটী শব্দে যে একটু দোষ ঘটিয়াছিল, আমরা গতবারে তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়াছি। অভিজ্ঞ সম্পাদক আমাদিগের লেখনীকে অসংযত ও কবিত্ব-প্রবণ বলিয়াছেন। ভাল, ইহারও দুটী চারিটী দৃষ্টান্ত দিলে দোষ কি ছিল? তাহা হইলে, আমাদের ভুল সংশোধিত হইত। ভাবের কথায় জগৎকে ভুলাইতে যাওয়া কিরূপ অভিজ্ঞতা, আমরা বুঝি না। শক্তি থাকে, অসংযত ও কবিত্বপ্রবণ লেখনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া একে একে দোষ বলিয়া যাও, এবং তাহার প্রত্যুত্তর শুন। অন্ধকারে এ প্রকারে ঢিল মারা কেন?

তারপর সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"ইহাতে লেখক এবং কাগজের প্রতি চিন্তাশীল বুদ্ধিমান পাঠকদিগের অশ্রদ্ধা জন্মান অনিবার্য্য।" সে জন্য তাঁহাকে চিন্তিত হইতে হইবে না। কর্ত্তব্য যাহা, তাহা অবশ্য পালন করিব, শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা জানি না। কিন্তু অভিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় স্মরণ রাখিবেন, চিন্তাশীল বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রেই তাঁহার দৃষ্টান্ত-হীন মন-গড়া কথা শুনিয়া আমাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবেন না, কারণ সত্য ও ন্যায়ের প্রতি এখনও তাঁহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে।

তারপরের কথাটী আরো মারাত্মক। সে যুক্তিটী ইতিপূর্ব্বে অনেক বিজ্ঞ ব্রাহ্মের নিকট শুনিয়াছি এবং উত্তর দিয়াছি। এখন আবার তত্ত্বকৌমুদীতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। কথাটী এই—"ব্রাহ্মসমাজের কোন সামাজিক সভায় এই বিষয় আলো-

চনার জন্য উপস্থিত করিলেই পারিতেন।"— প্রথমত, ব্রাহ্মসামাজিক সভার সহিত নব্য-ভারতের কোন সম্বন্ধ নাই। দ্বিতীয়ত, ব্রাহ্ম-সমাজ এখন সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে—নানা শাখা, নানা বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ সমস্ত দেশময় পরিব্যাপ্ত। সুতরাং কোন সামাজিক সভায় আলোচনা করিলেই, সকল ব্রাহ্মের কাণে তাহা যাইবার সম্ভাবনা নাই। আর যদি বল, বন্ধুবান্ধবের নিকট ব্যক্ত করিলেই ক্রমে তাহা দেশ-ব্যাপ্ত হইত। তাহাও করিয়াছি; কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যেও তাহা দেশব্যাপ্ত হয় নাই এবং দোষ প্রতিকারের চেষ্টা হয় নাই। চেষ্টা করিবেই বা কে? যিনি দশ পনর বৎসর ব্রাহ্ম হইয়াছেন তিনিও, ব্রাহ্ম; আর যিনি কাল মদ্য মাংস ছাড়িয়া ভণ্ডতপস্বী সাজিয়াছেন তিনিও, ব্রাহ্ম। প্রবীণের মত অপ্রবীণের অসার মতের দ্বারা সংঘর্ষিত হইতেছে;—ধার্ম্মিকের মত অধার্ম্মিকের স্বেচ্ছাচারের দ্বারা খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। 'কোন সামাজিক সভা'—সে ত অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ। সেই সঙ্কীর্ণতার মধ্যেও কি এপর্য্যন্ত কোন বিষয়ের সম্পূর্ণ মীমাংসা হইয়াছে?—মীমাংসিত হইয়া তাহা কি ব্যবহারিক জীবনে কার্য্যকরী হইয়াছে?—কে বল কার কথা শুনে?—নানা মুনির নানা মত। আপন আপন মত লইয়াই সকলে স্ফীত ও গৌরবান্বিত। যে, যে কার্য্য করে, সে তাহারই পোষকতা করে। এই বিস্তৃত ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকের দ্বারা, স্থিরবুদ্ধি চটুল ব্যক্তির দ্বারা, বৃদ্ধ যুবকের দ্বারা, নানা স্থানে, নানা ঘটনায় অপদস্থ হইতেছেন। পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা বিক্রীত হইতেছে। এমন কোন কথাই নাই, এই স্বেচ্ছাচারিতার সম্মুখে যাহা উপহাস্য নয়। দৃষ্টান্তের জন্য দূরে যাইতে হইবে কি? না—তা নয়। আমরা যৌবন-বিবাহ নামক প্রবন্ধে প্রধানত বলিয়াছি যে, বিবাহ সুনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে অপকার হয়। এ কথাটীতে কি আপত্তি আছে? তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদকের আপত্তি থাকা উচিত নয়, এবং সুখের বিষয়, তাহা নাইও। আপত্তি ত নাই, কিন্তু কই, সুনীতির ভিত্তির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে বদ্ধপরিকর হন কই? কই, এই ভাল কথাটীর প্রতিও উপহাস করিতে ছাড়েন কই? আমাদিগকে অপদস্থ করিতে যে সকল বাক্‌পটু, ধর্ম্মব্যবসায়ী নব্যব্রাহ্ম, প্রবীণের সাজ ধরিয়া, আজ আসরে নামিয়াছেন, এবং নানা প্রকার কটূক্তি এবং ঈর্ষার ঢিল নিক্ষেপ করিয়া হিংসা বিদ্বেষের পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা যদি এই স্বেচ্ছাচারিতার দিনে, একটু ধর্ম্ম, একটু চরিত্র, একটু নীতির সেবা করিতেন, তবে এতদিন ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইত। আমরা মরিয়া যাইতে বসিয়াছি, নয় মরিয়াই যাইলাম। আমরা অবিশ্বাসভাজন হইয়া থাকি, নয়, এ পত্রিকা উঠিয়াই যাইল। কিন্তু তাতেই কি ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল হইবে? হাজার কুটিল নীতি (Policy) অবলম্বন কর, সত্য ঢাকিতে হাজার চেষ্টা কর—যদি ব্রাহ্মসমাজের বায়ু আমূল সংশোধিত না হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, এই সমাজের দ্বারা কখনই এ দেশে স্বর্গের পবিত্র একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না?

শান্তি নাই, শান্তির কথা জগতে বলা; মিল নাই মিলনের কথা প্রচার করা; প্রকৃত

ভালবাসা নাই, ভালবাসার কথা প্রকাশ করা, ভণ্ডামী বই আর কিছুই নয়। সত্য যাহা, তাহা চিরকাল সত্য। ঢাকাঢাকি, চাঁপাচাঁপি কেন? ঢাকাঢাকি, চাঁপাচাঁপি করিয়া দুই দশদিন লোকের শ্রদ্ধা পাইলে পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু ভণ্ডামী অনেক দিন চলে না। মেকি টাকা অনেক দিন চলে না। এ কথাটা ভুলিয়া যাওয়া ভাল নয়।

আবার বলি, বাহিরের লোক ও ভিতরের লোকে প্রভেদ কি?—প্রথমত, সম্পাদকের নিকট সকলেই বন্ধু, সকলেই প্রাণের ভাই, কেহ পর নয়। আর ধর্ম্মের চক্ষে দেখিতে গেলে, আপন পর জ্ঞান বড় সর্ব্বনাশের মূল। তুমি যদি আমাদের গলদ জানিতে পারিলে, তবে ভগবানের রাজ্যের আর শত জন ভাই কেন যে পারিবে না, ধর্ম্মবুদ্ধিতে আমরা একথা বুঝি না। ভেদাভেদ কোথায়?—সকলই ত ঈশ্বরের সন্তান। যে দূরে সেও ঈশ্বরের; যে কাছে, সেও ঈশ্বরের। তোমার আশীর্ব্বাদে, তোমার প্রার্থনায় যদি আমার উপকারের সম্ভাবনা থাকে, তবে ঐ শত সহস্র জনের আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনায় কেন যে আমাদের উপকার হইবে না, তাহা আমরা বুঝি না। তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক "ঘর ও বাহিরের" প্রভেদ করিতে যাইয়া, ব্রাহ্মসমাজের নামে দুর্গন্ধময় সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিয়া, সমাজের যে অনিষ্ট করিয়াছেন, ভগবানের নিকট তাহার ক্ষমা নাই। আমরা এরূপ গণ্ডীর মাহাত্ম্য আদবেই বুঝি না।

ভয় দেখাও কেন? 'ঘরের লোক' অবিশ্বাস করে—এ ভয় দেখাও কেন? যাহা মানি না, তাহা কখনও মানিব না। ভিতর ও বাহিরের ভেদাভেদ গণনা করিতে আমরা পারিব না। ব্যক্তিত্ব লইয়া ঝগড়া করিতে চাও, নব্যভারতের সম্পাদককে দল হইতে বাহির করিতে চাও, কর। সমাজ হইতে নাম কাটিয়া দিতে চাও, দেও। আমরা এরূপ গণ্ডীর মধ্যে, এরূপ চাঁপাচাঁপির মধ্যে থাকিতে চাই না। ভয়ে ভয়ে ঢিল মারিতেছ কেন?—এত কষ্টই বা কেন?—ভগবানের জন্য এবং পবিত্র কর্ত্তব্যের জন্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছি, আর তোমাদের ভালবাসা (?) হায়, তোমাদের প্রেম (?), হায় তোমাদের ঘৃণা বা Moral indignation (?) উপেক্ষা করিতে পারিব না? আমরা কি এতই অপদার্থ যে, ঘরের লোকের 'অবিশ্বাস' এবং বাহিরের লোকের 'হাস্য' স্মরণ করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে স্খলিত হইব? একা আসিয়াছি, একা যাইব,—ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া মরণকেও আলিঙ্গন করিতে পারি, কিন্তু তোমার কিম্বা তাহার বিশ্বাস বা অবিশ্বাস স্মরণ করিয়া, কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর বা অনগ্রসর হইতে চাই না। ছি, এমন কথাও লিখিতে হয়!!

আমরা যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ নামক প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি যে, বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিবার জন্য মালাবারি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিলে যৌবন বিবাহ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই যৌবন বিবাহে অনেক অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। সেই গুলির আলোচনা করা সকলের পক্ষেই উচিত। ব্রাহ্মসমাজের কথা এই জন্য উঠিয়াছে যে, ব্রাহ্মসমাজ এই ব্রতে ব্রতী। ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায়, মঙ্গলামঙ্গল বিচার করিবার অধিকার দেশের সাধারণের থাকিবে না কেন?—আমরা বুঝি না।

আমরা ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের ত্রিসীমার বাহিরে, এবং হিন্দুসমাজকে ব্রাহ্মসমাজের ত্রিসীমার বাহিরে মনে করিতে আজও শিখি নাই। হিন্দুর রক্ত এখনও আমাদের শিরায় শিরায় প্রবহমান,—হিন্দুর হিন্দুত্ব এখনও আমাদের হৃদয়ের ভূষণ;—আমরা হিন্দু সমাজকে পর মনে করিব? শরীরের এক অঙ্গ কাটিয়া ফেলিতে বল, প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ কাজটী আমাদের দ্বারা হইবে না। আমরা প্রবীণ নাই বা হইলাম, তোমাদের বিশ্বাসভাজন নাই বা হইলাম, ক্ষতি কি, দুঃখ কি? আপনকে পর ভাবিব, তোমাদের মায়ায়? এমন অনুরোধ, এমন কথা ঐ কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দেও। সাম্প্রদায়িকতার ভাণ করিয়া আর হিংসা বিদ্বেষের আগুন দেশে ছড়াইও না।

অভিজ্ঞতায় প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় দ্বিতীয় স্তবকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি আমাদের "স্বামী ও স্ত্রী" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন নাই। সেই প্রবন্ধে আমরা স্পষ্ট বলিয়াছি, আশু পাপ দমনের জন্য ও ব্যভিচারের স্রোত প্রতিহত করিবার জন্য অনাধ্যাত্মিক বিবাহ যদি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও, কর, কিন্তু তাহাকে কখনই আদর্শ বলিয়া ভুল করিও না। পরিবারসাধনই যে মুক্তিসাধনের সোপান গত বারে আমরা তাহাও বলিয়াছি। সামাজিকতা যে আধ্যাত্মিকতার সোপান নয়, ইহা আমরা কোথাও বলি নাই। না পড়িয়া, না বুঝিয়া এ সকল অবান্তরিক কথার আলোচনা যে তিনি কেন করিলেন, বুঝি না। তারপর তিনি বলিতেছেন—"তবে বিবাহ মাত্রই সুনীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই সহজ কথা কে না বুঝে? মানুষকে ইহা সবিস্তার বুঝাইতে যাওয়া সময় নষ্ট মাত্র।" তিনিই ইহার একটু পূর্ব্বে বলিতেছেন যে, "আধ্যাত্মিকতা মানব জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য, সন্দেহ নাই, কিন্তু উচ্চতম লক্ষ্য আয়ত্ত করা জাতি এবং ব্যক্তি উভয়ের পক্ষেই বহু সময় ও সাধন সাপেক্ষ। * * * কেবল জাতি নহে, পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যক্তিকেও বিধাতা আধ্যাত্মিকতার আস্বাদন না দিয়াই বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতেছেন।" * * ইত্যাদি। এই দুটী পদ কিরূপ পরস্পর-বিরোধী, পাঠক বিচার করুন। নীতি নাই আধ্যাত্মিকতা আছে, কিম্বা আধ্যাত্মিকতা আছে নীতি নাই, এ কথা আদবেই সত্য নয়। এ দুটী পরস্পর এত কাছের জিনিস যে, একটীর অভাবে অন্যটীর থাকা অসম্ভব। নীতি বিবাহের ভিত্তি, ইহা সকলেই বুঝে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা বুঝে না। কি যুক্তিপূর্ণ কথা? নীতিটা যদি সকলেই বুঝিত, তবে পৃথিবীতে নীতি কখনও এত হতশ্রদ্ধ হইত না।

তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক মহাশয় উচ্চ ধার্ম্মিকতায় উজ্জ্বল হইয়াছেন, সুতরাং সুনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা তাঁহার মতে বৃথা সময় নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মতে তাহা নয়। নীতি-শিথিলতাই যে ভারতের সর্ব্ব প্রকার অধোগতির মূল, ইহাতে আমাদের একটুও ভ্রান্তি নাই। সেই জন্যই সর্ব্ব প্রকার সংস্কারের মধ্যে সুনীতিকে বদ্ধমূল করিতে আমরা প্রয়াসী। এই সহজ কথাটা সকলেই যদি বুঝিত, তবে এদেশের এত দুরবস্থা ঘটিত না। তত্ত্বকৌমুদীর ন্যায় কোন ধর্ম্ম ও নীতি প্রচারক পত্রিকারও প্রয়োজন থাকিত না। এই সহজ

কথাটা লইয়া আমরা আলোচনা করিতেছি বলিয়া সম্পাদক মহাশয়ের এত ব্যাকুল হইবার কোন কারণ নাই। আমাদের কর্ত্তব্য, তাঁহাপেক্ষা আমরা অধিক বুঝি। তাঁহাকে ত আর আমরা এই বিষয়টা লইয়া আন্দোলন করিতে বলিতেছি না? তবে আর একথা কেন?

আমরা যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ নামক প্রবন্ধে বিবাহের যে উচ্চ আদর্শ চিত্র করিয়াছি, সে সম্বন্ধে কোন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি যে কেন আপত্তি করিবেন, বুঝিতেছি না। তারপর ব্রাহ্মসমাজের যে সকল কালিমার কথা লিখিয়াছি, সে গুলিকে সংশোধন করিতে প্রয়াসী না হইয়া যে ভাবে আমাদিগকে অনেকে আক্রমণ করিতেছেন, ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে, ব্রাহ্মসমাজ কিছু সংস্কার-বিরোধী হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু এখানে আর সে সকল কথার আলোচনার প্রয়োজন নাই।

বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা। (৩য়)

অতি প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গদেশে সংস্কৃতের অনুশীলন আরব্ধ হয়। পালবংশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অদীনপরাক্রম ক্ষত্রিয় নরপতিগণ সংস্কৃত-সাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে অমনোযোগী ছিলেন না। সংস্কৃতে লিখিত তাম্রশাসন ও প্রস্তরাদি পাঠে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তাঁহাদের অমাত্যবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, কেহ কেহ সংস্কৃতের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তাঁহাদের সভামণ্ডপ সর্ব্বদা সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সমলঙ্কৃত করিতেন বলিয়া অনুমিত হয়। পালবংশীয় নরপতিগণের পূর্ব্বতন বাঙ্গলাদেশের অবস্থা পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বহু আয়াসেও বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই। পালনৃপতিবর্গই বাঙ্গলাদেশের প্রথম প্রামাণিক রাজা। তাঁহাদের সমসাময়িক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের নাম ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি বিষয়ে সবিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

পালবংশের পর সেনবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ বঙ্গদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর হন। বিজয়সেনই গৌড়নগরীতে সেন রাজবংশের রাজপাট সংস্থাপন করেন। বঙ্গেশ্বর মহারাজ আদিশূরের। সময়ে (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে) যে পাঁচ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে আনীত হইয়া বাঙ্গলায় উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, শাণ্ডিল্যগোত্রজ ক্ষিতীশ তাঁহাদের অন্যতম। এই ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার নামক সুপ্রসিদ্ধ বীররসাশ্রিত নাটক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচনা করেন। আমরা অন্যত্র বেণীসংহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভরদ্বাজগোত্রজ তিথিমেধাকে কান্যকুব্জাগত পঞ্চবিপ্রের অন্যতম বলিয়া কৌলীন্যমেল সংস্থাপক সুপ্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই তিথিমেধার

† বান্ধব, অষ্টম খণ্ড, ৩১০-৩১৭ পৃঃ।

বংশধর শ্রীহর্ষ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি নৈষধচরিত নামক সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য এবং খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামক ষড়দর্শনের সমালোচনাপূর্ণ দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জগতে কবিত্ব ও দার্শনিকতার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় সেনের পুত্র মহারাজ বল্লাল সেন গৌড়ের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। তাঁহার সময়েই বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী সমতট বিক্রমপুর (রামপাল) নামে পরিচিত হয়। তিনি বর্ত্তমান নবদ্বীপের দেড়ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে এক বাটী নির্ম্মাণ ও একটী দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। উক্ত দীর্ঘিকা এক্ষণে বল্লাল-দীঘী নামে প্রসিদ্ধ। অনেকে অনুমান করেন যে, বল্লাল দীঘীর উত্তরদিকে বল্লাল সেনের ঢিবী নামে যে উচ্চ স্থান আছে, তথায়ই বল্লালের বাটী ছিল। ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বল্লাল-সেন 'দানসাগর' নামে ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।*

১১০৬ খ্রীষ্টাব্দে(১০২৮ শকাব্দে) বল্লালের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্যপুত্র লক্ষ্মণ সেন দেব বাঙ্গলার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া যে অব্দ প্রচলন করেন, তাহা অধুনাও মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত আছে। উমাপতি, গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব ও ধোয়ী কবিরাজ নামক পঞ্চ পণ্ডিতরত্ন-দ্বারা তাঁহার সভামণ্ডপ সমলঙ্কৃত ছিল। জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ, সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব,শরণঃশ্লাঘ্যো দুরূহ-দ্রুতে
শৃঙ্গারোত্তর-সৎপ্রমেয়-রচনৈঃ আচার্য্যগোবর্দ্ধন;
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবি-ক্ষ্মাপতিঃ ॥

গীতগোবিন্দ, ১ম সর্গ, ৪র্থ শ্লোক

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ ॥"

কবিরাজ-প্রতিষ্ঠা হইতে ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র কর্তৃক উদ্ধৃত।

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম কবি জয়দেব স্বকৃত পুরুষ-পরীক্ষায় লিখিয়াছেন যে, উমাপতিধর মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কুসুমাঞ্জলি নামক সুপ্রসিদ্ধ দর্শন গ্রন্থ প্রণেতা উদয়নাচার্য্যের পুত্র উমাপতি সচিবপ্রবর উমাপতি কি না, বলা যায় না।*

---

* শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় তদীয় সেনরাজগণ নামক উৎকৃষ্ট পুস্তিকায় আদিশূরকে মহারাজ বল্লাল সেনের মাতুল বংশীয় সমতটের (পূর্ব্ববঙ্গ বা বিক্রমপুরের) রাজা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তিনি বলেন যে "বহুকালে শিবভক্ত মহারাজ বিজয় সেন পালবংশীয় শেষ বৌদ্ধরাজাকে দূরীভূত করিয়া গৌড়ের রাজাসনে বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বোধ হয় আদিশূরবংশীয় কোন নরপতি বঙ্গ (সমতট) প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ বিজয়সেন সমতটের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বোধ হয়, এই কন্যার গর্ভেই বল্লাল জন্ম গ্রহণ করেন।" কৈলাস বাবুর অনুমান কতদূর যুক্তি-সঙ্গত,তাহা পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন।

* কুসুমাঞ্জলির অনুবাদক কাউয়েল সাহেবের মতে উদয়নাচার্য্য খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি ও মনুসংহিতার সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লূক ভট্ট রাজসাহীর অন্তঃপাতী তাহেরপুরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বারেন্দ্রশ্রেণীর ভাদুড়ী কুলকে পবিত্র করিয়াছেন। (বান্ধব, ৭ম খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা)। উদয়নাচার্য্য

জয়দেব বীরভূমের প্রায় দশক্রোশ দক্ষিণে অজয় নদের উত্তরস্থ কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ভাগবত পুরাণের অমৃতময় রস আস্বাদনে বিমোহিত হইয়া ভাবসিন্ধু মন্থন পুরঃসর তিনি গীতগোবিন্দ নামক দ্বাদশ সর্গাত্মক অপূর্ব্ব গীতিকাব্য রচনা করেন। গীতগোবিন্দ আজিও শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের সম্মুখে প্রত্যহ পঠিত হইয়া থাকে। গীতগোবিন্দ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতি পূজনীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষায় কীদৃশী মনোহারিণী কবিতা বিরচিত হইতে পারে, গীতগোবিন্দকে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল বলিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। †

গোবর্দ্ধন মহারাজ বল্লালসেনের মন্ত্রী আদিদেবের পুত্র। ইনি আর্য্যা-সপ্তশতী নামক সুপ্রসিদ্ধ ছন্দোবন্ধময় কাব্য প্রণয়ন করেন। আর্য্যা-সপ্তশতী হাল নামক কবির সপ্তশতকের অনুকরণে লিখিত। ইহাকেই আদর্শ স্বরূপ লইয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি বিহারীলাল ও তুলসীদাস "সত্তসই' গ্রন্থ হিন্দি-ভাষায় রচনা করেন ‡।

কবিরাজ-প্রতিষ্ঠা গ্রন্থ ধোয়ী কবিরাজ রচনা করিয়াছেন কিনা, অনুসন্ধান করা উচিত।

দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন দেব সেনবংশের শেষ রাজা। তিনি ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত নবদ্বীপে রাজপাট সংস্থাপন করেন। "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" নামক গ্রন্থ প্রণেতা হলায়ুধ তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বাল্যেখ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃশ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল
চ্ছত্রোৎসিক্তমহামহত্তমুপদংদত্ত্বা নবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যং অখিল-ক্ষ্মাপাল-
নারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ ॥
(ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব)

হলায়ুধ আদিশূরানীত পঞ্চবিপ্রের অন্যতম বাৎস-গোত্রজ ছান্দড়ের বংশসম্ভূত। তাঁহার ভ্রাতা ঈশান ও পশুপতি যথাক্রমে আহ্নিক ও পশুপতি-পদ্ধতি নামক ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। সচিবশ্রেষ্ঠ হলায়ুধ অভিধান রত্নমালা নামক অভিধান এবং আচার্য্য পিঙ্গল প্রণীত বৈদিক ছন্দসূত্রের মৃত সঞ্জীবনী নামক টীকা * রচনা করেন।

মহারাজ লক্ষণ সেন দেবের শ্রীধরদাস নামা জনৈক সভাসদ ১১২৭ শকাব্দে (১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে) সদুক্তিকর্ণামৃত নামক গ্রন্থ ৪৪৬ জন কবির রচিত পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

শাকে সপ্তবিংশত্যধিক-শতোপেত দশশতে
শরদাং।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষিতিপস্য হি রসরসৈচ অব্দে ॥

তাকেরপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের আদি পুরুষ। তিনি নিসিন্দা গ্রামবাসী ছিলেন।

† প্রসন্ন-রাঘব নামক রাম বিষয়ক নাটক প্রণেতা জয়দেব বিদর্ভবাসী ছিলেন। (ভারত-কোষ, ৩৫২ পৃষ্ঠা)

‡ Weber's History of Indian Literature. P. 211, Foot notes.

* সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বেবার (ওয়েবার) সাহেব হলায়ুধকে এক স্থানে দশম অপর স্থলে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

Weber's History of Indian literature, P. 196 and 230.

Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss, Vol. I. p. 1.

এই ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগেই মহম্মদ বখ্‌তীয়ার খিলজী নবদ্বীপ অধিকার করেন। রাজা লক্ষণসেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে (বিক্রমপুরে) আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ক্রমশঃ

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ। (৩)

আমরা গতবারে প্রবন্ধশেষে বলিয়াছি যে, একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা, প্রেম সাধনের একটী উৎকৃষ্ট উপায়। নানা কারণে এই প্রথার প্রতি লোক কিছু বিরক্ত। সুতরাং প্রেম-সাধনায় কিছু ব্যাঘাত ঘটিতেছে। প্রেম-সাধনা ভিন্ন ধর্ম্মলাভ অসম্ভব। প্রেমের পথে নানা কারণে কণ্টক পড়াতে ব্রাহ্ম পতি পত্নী কিছু ধর্ম্ম-লক্ষ্যভ্রষ্ট, সুতরাং সংসারাসক্ত হইয়া পড়িতেছেন। এই ধর্ম্মহীনতার আরো যে সকল কারণ আছে, সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। বিধাতা আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মহীনতার হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে স্বাধীনতার নামে অল্পে অল্পে কিছু স্বেচ্ছাচারিতা প্রবেশ করিয়াছে। সকলেই স্বস্ব প্রধান, পরস্পরের প্রতি বড় একটা শ্রদ্ধা বা ভক্তির ভাব নাই। স্বাধীনতার পক্ষপাতী ব্যক্তি অন্যের স্বাধীনতার সম্মান রাখিতে পারিতেছেন না। মতে মত না মিলিলে, পরস্পরকে অপদস্থ করিতে ব্রাহ্মেরা বড়ই মজবুত। প্রথম হইতে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিবাদ করার শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে' বয়সের প্রতি, অভিজ্ঞতার প্রতি সম্মান রাখিতে হইবে,—এ শিক্ষাটী বড়ই কম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে ভক্ত কেশবচন্দ্র, এবং কেশবচন্দ্র হইতে নব্য ব্রাহ্মদল—সকলেই স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার ধুঁয়া ধরিয়া পরস্পরের মতকে উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। মতের প্রতিবাদের শিক্ষাটী বড়ই প্রবল। কিন্তু মত পালনে দৃষ্টি বড় কম। সেই শিক্ষার কুফলে আজ ব্রাহ্মসমাজ দারুণ অপ্রেমের লীলাস্থল হইয়া উঠিয়াছে। পরস্পরের মতের প্রতি উপেক্ষা করা, ঘৃণা প্রদর্শন করা বা পরস্পরকে নিন্দা করা অধিকাংশ ব্রাহ্মের দৈনিক কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কি উপাসনা-মন্দির, কি প্রচারক্ষেত্র, কি সভাগৃহ, কি পরিবারের কেন্দ্র, সর্ব্বত্রই অবাধে সকলে পরস্পরের নিন্দা করিতেছেন। এই কদর্য্য শিক্ষায় দীক্ষিত—বালক বালিকা, যুবক বৃদ্ধ, অনেকেই। আজ যে ভেক লইয়া সংসার ছাড়িয়া বৈরাগী সাজিয়াছে, সেও বক্রমুখে প্রবীণের নিন্দা করে; কাল যে ব্যভিচার ও মদ্যপান পরিহার করিয়া ভক্তবেশ ধরিয়াছে, সেও অবাধে নানা মতের প্রতি উপেক্ষা করিতেছে। কেশবচন্দ্র সেনকে একদলের অধিকাংশ লোক ঘৃণার চক্ষে দেখেন, অন্যদল সাধারণ তন্ত্রভুক্ত ব্রাহ্ম-অধিনায়কগণের প্রতি কৃপার কটাক্ষপাত করেন। এই ঘৃণা, এই নিন্দার স্রোত—উপর হইতে আরম্ভ করিয়া এখন

নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ছোট ছোট বালক বালিকা, অপেক্ষাকৃত বড় বড় যুবক যুবতী, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব যাহারা মোটেই বুঝে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাহারাও আজ সমালোচকাগ্রগণ্য। তাঁহারাও আজ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বক্র মুখে কত নিন্দা প্রচার করিতেছে। আজ কালকার দিনে, প্রেম-শিক্ষার পরিবর্ত্তে ঘৃণা বিদ্বেষ বা স্বাতন্ত্র্য শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। "যত ছিল নাড়াবুনে সব হলো কীর্ত্তুনে"—আমাদের দেশের একটী প্রাচীন কথা। ব্রাহ্মসমাজের নব্য দল সম্বন্ধেও সেই কথা খুব খাটে। ব্রাহ্মসমাজের কে বড় কে ছোট, কার মত প্রবল, কার মত অপ্রবল, ইহা নির্ণয় করা আজ কাল বড়ই কঠিন। কার কথা কে শুনিবে, কার কথা কে মানিবে? সকলেই স্ব স্ব প্রধান। হাজার লোকের হাজার মত। কাহারও মতে কেহ চলিবে না। কারণ, এ যে স্বাধীনতার যুগ। বিবাহের আদর্শ তোমার একরূপ,আমার অন্যরূপ; উপাসনা প্রণালী তোমার একরূপ,আমার অন্যরূপ; তোমার কথা আমি মানিব কেন? তুমি বিবাহের পূর্ব্বে যে সকল আচার ব্যবহার নিষেধ কর, আমি তাহাকেই উচিত মনে করি। একটী বালিকা একটী যুবককে দাদা বা কাকা বলিয়া ডাকিয়াছিল, তারপর বিবাহ করিয়াছে, তাতে দোষ কি? তোমার মতে দোষ, আমার মতে দোষ নয়। বিবাহের পূর্ব্বে স্বেচ্ছ-বিহার তোমার মতে অবৈধ হইতে পারে, আমি ইহাকেই প্রণয়-প্রস্ফুটনের পক্ষে পরম সহায় বলিয়া মনে করি। সুতরাং তোমার সঙ্কীর্ণ মতামতে আমি চলিব কেন?—আজকালকার অনেক নব্য-ব্রাহ্মের মুখে মুখে এই কথা। প্রবীণ লোকের মুখের উপর ধা করিয়া কত যুবক আজ কাল কত অসম্মান-সূচক কথা বলে। স্বাধীন যুগের স্বাধীনতার স্রোত এমনই প্রবল বেগে চলিয়াছে যে,—কোন কথা বলিতে বা লিখিতে ভয়ে ভয়ে অগ্রসর হইতে হয়! কথা যে কেহ মানিবে, সে আশা অতি কম। এইরূপে প্রবীণ লোকদের আদর্শ চিত্র উপেক্ষিত হইতেছে,ও আদর্শ মত ঘৃণার সহিত পরিত্যক্ত হইতেছে। এই যে স্রোত, এই স্রোতের গতি যে কোথায় যাইয়া থামিবে, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বিবাহের পূর্ব্বে কোন অবৈধ ঘটনার প্রতিবাদ করিয়া নিস্তার পাওয়া এখন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। প্রবীণ ব্রাহ্মগণ যে এবিষয় বুঝিতে পারিতেছেন না, তাহা আমরা মনে করি না। কিন্তু তাঁহারা হতজ্ঞান হইয়া এই স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতেছেন। শোচনীয় অবস্থার কথা কে ভাবিবে? তুমি বলিতে যাও, তোমার দুর্দ্দশার এক শেষ হইবে। বাদ প্রতিবাদ, মত লইয়া মারামারী, কাটাকাটী করিতেই অধিক সময় চলিয়া যাইতেছে, কে বল আর সাধন ভজনে মন দেয়। প্রতিবাদ-স্রোতের প্রাবল্যে, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ যে দিন দিন ধর্ম্মহীন হইবেন, কিছুই আশ্চর্য্যের নয়। তার উপর আবার বিলাসিতা ও সংসারাসক্তির দারুণ পরাক্রম। মতসর্ব্বস্ব-সাধনায় ব্রাহ্মসমাজ দিন দিন যে কি শোচনীয় অবস্থায় যাইয়া উপস্থিত হইতেছে, কল্পনা করিতেও কষ্ট হয়। বিধাতা এই সমাজকে রক্ষা করুন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্ম কোন শাস্ত্র মানেন না,

সমাজ সম্বন্ধেও কোন শাস্ত্র বা নিয়ম মানেন না। সমাজ চিরকাল পরিবর্ত্তনশীল। এক নিয়ম, সুতরাং খাটে না। নিয়মহীন সমাজ, একবার জাগে, আবার ডুবে। উন্নতির পরিবর্ত্তে তাই অবনতি, নিয়মহীন সমাজের ভাগ্যে ঘটিতেছে। আবার উন্নতি হইবে না, তা বলি না। কিন্তু সে বড় দূরের কথা। সকল শাস্ত্র, সকল নিয়ম উপেক্ষা করিতে শিক্ষা দিয়া নবীন ব্রাহ্মদিগকে স্বেচ্ছাচারের পথে যাইতে আদেশ করিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারা এই কঠিন সঙ্কটাপন্ন সমস্যার দিনে কি ভাবিতেছেন, আমরা জানি না। কিন্তু একথা ঠিক যে, এযুগের সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রণালী যদি স্থিরীকৃত করিতে এবং ব্যবহারিক জীবনে তাহা চালাইতে ব্রাহ্মগণ না পারেন,তবে এই উশৃঙ্খল সমাজ রক্ষার আর উপায় নাই। আগুন লইয়া খেলা, সামান্য ব্যাপার নয়। দিন দিন ব্রাহ্মসমাজ একটী সমাজের আকার ধারণ করিতেছে। এখন নিয়মাদি ভিন্ন, সতর্কতা ভিন্ন চলা দুষ্কর। সমাজের আবশ্যকতা থাকিলে নিয়মের আবশ্যকতা অবশ্যই মানিতে হইবে। কিন্তু সেই নিয়মের মূলে প্রেম,ভগবদ্ভক্তি ও গভীর সাধন ভজনের অঙ্কুর থাকা চাই। লোকশাসনের জন্য যে নিয়ম, তাহাতে মঙ্গলের আশা বড়ই অল্প।

ব্রাহ্মসমাজ এপর্য্যন্ত বিবেকের প্রাধান্য ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। বিবেক না মানিলে, ধর্ম্মকে দাঁড় করান কিছু কঠিন। ভগবান মানুষের নিকট স্পষ্ট কথা বলেন, একথা না মানিলে ধর্ম্মকে দাঁড় করান যায় না। কাজেই কতকটা অভ্রান্তবাদ মানিতেই হয়। মানুষের নিকট ভগবান যে কথা বলেন, তাহা অভ্রান্ত। কিন্তু গভীর সাধন ভজন ভিন্ন, বিবেকের কথা বা আদেশ বুঝিতে পারা বড়ই কঠিন। কঠিন বলিয়াই, হিন্দুশাস্ত্রকারেরা গুরুর উপদেশ মান্য করিতে বলিয়াছেন। সেই উপদেশ, আবার অধিকারী ভেদে, নানা সময়ে, নানারূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে গুরুর উপদেশের প্রতি আস্থা নাই, কারণ এসমাজের শিক্ষাই সেরূপ নয়। এখানে বাধ্য হইয়া বৃদ্ধকে এবং বালককে, জ্ঞানী এবং মূর্খকে ঐ বিবেকের কথার দিকেই চাহিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু এদিকে সাধন ভজন বড় কম। তাই ভুল ভ্রান্তি যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। আজ যে পথে, কাল তার ঠিক বিপরীত পথে, কাল যে পথে যাইবে আজ তার ঠিক ভিন্ন পথে চলিতে হয়। ধর্ম্মে দৃঢ়তা, অটল বিশ্বাস সধারণত মানুষের বড়ই কম। আজ এটা, কাল সেটা, কাজেই মানুষকে ভুলাইতে থাকে। গভীর ধর্ম্মসাধনার অভাবে, বুদ্ধি ও ধারণা শক্তির তারতম্যানুসারে মানুষের বিবেক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কথা বলে। আজ যেমন, কাল তেমন নয়,রামের যেমন শ্যামের তেমন নয়। ব্যক্তিগত স্বেচ্ছা বা খেয়াল,আসক্তি বা সুখেচ্ছা অনেক সময়ে বিবেকের স্থানীয় হইয়া মানুষকে নানা বিপথে লইয়া যাইতেছে। স্থিরতা কিছুতেই জন্মিতেছে না। আজ এটা, কাল সেটা। বিবেক কি মানুষকে কখনও এইরূপ চঞ্চল করে? না, তা নয়। বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি চিরকাল মানুষকে একই পথে লইয়া যায়। ধর্ম্মবুদ্ধির স্থানীয় হইয়া অনেক সময় সংসারবুদ্ধি মানুষকে পথ ভুলাইয়া ফেলে। তাই মানুষের এত চঞ্চলতা দেখিতে

পাওয়া যায়। ধর্ম্মের স্থানে অধর্ম্ম, স্বর্গের স্থানে সংসার, বৈরাগ্যের স্থানে আসক্তি, প্রেমের স্থানে ঘৃণা বিদ্বেষ,—তাই মানুষের হৃদয়কে মলিন করে। সংসারাসক্তি বা স্বেচ্ছার কথা ও বিবেকের কথায় তারতম্য করা বড়ই কঠিন। তাই ব্রাহ্মসমাজের মলিনতার অবস্থা উপস্থিত। আদর্শ না পাইয়া সকলেই হতবুদ্ধি। সকলেই স্বস্ব প্রধান। এই অবস্থায় ধর্ম্ম এবং নীতি অনাদৃত হইবে না, কিরূপে? কিন্তু ইহার কি কোন ঔষধ নাই? এই ভয়ানক দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইবার কি আর উপায় নাই? আছে বই কি। উপায়, অবিশ্রান্ত প্রার্থনা, কঠোর তপস্যা। কিন্তু কে বল, সংসার-খেলা ছাড়িয়া দিবারাত্রি তোমার প্রার্থনা বা তপস্যা লইয়া এই জড়বাদের দিনে বসিয়া থাকিবে? দুর্দ্দশা বা দুর্দ্দিন কেমনে ঘুচিবে, তা বল?

এসকল কথা আমরা লিখিতেছি কেন? আমরা পূর্ব্ববারে বলিয়াছি, ভগবানের বিধান না বুঝিয়া যাহারা বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, দাম্পত্য প্রেমের স্বর্গীয় পবিত্র কুসুম তাহাদের হৃদয়ে ফুটে না। এই বিধান বুঝিবার সময় যে ভুল হইতে পারে, এস্থলে তাহা বুঝাইয়া দেওয়াও একান্ত উচিত বলিয়া তাহা করিলাম। বিধান বুঝা বড়ই কঠিন। বিধানের স্রোতে না পড়ার দরুন হিন্দু পতি পত্নীর অনেক স্থলে যে দুর্দ্দশা, ভুল-বিধান বুঝাতে ব্রাহ্মপতি-পত্নীরও সেইরূপ দুর্দ্দশা। না বুঝিয়া বা বুঝিতে ভুল করিয়া অনেক সময় অযথা-স্থানে অনেকে পরিণীত হইতেছেন। রূপজ-মোহ বা যৌবন-চাঞ্চল্য এবং সংসারাসক্তি বিবেকের স্থানীয় হইয়া মানুষকে ঘোরতর অন্ধকার, দুর্নীতি ও দুর্গতির পথে লইয়া যাইতেছে। সে ভীষণ পথ নরক অপেক্ষাও দুর্গতিময়। সেখানে যাইয়া মানুষ হাহাকার করিয়া চীৎকার করিয়া মরিতেছে। কিন্তু সে দুর্গতিময় পথের কথা মানুষ প্রথমে কিছুতেই বুঝিতে পারেনা, বুঝিতে চায় না। নিজেও বুঝিবেনা,অন্যের কথাও শুনিবে না। শাস্ত্রের কথাও মানিবে না. প্রাচীন অভি-ভাবকের পরামর্শেও কর্ণপাত করিবে না। আলোক দেখিয়া পতঙ্গ যেমন পুড়িয়া মরে, অনেকে সেইরূপ সংসারের দারুণ যৌবনাগুনে জীবনাহুতি দিতেছেন। এই জন্যই আমরা বর কন্যার মনো-নয়নের ভার, কেবল বর কন্যার উপর না রাখিয়া, বিজ্ঞ এবং নিঃস্বার্থ অভিভাবক-দিগের উপরও কতক রাখিতে চাই। কিন্তু সে সকল কথা এ স্বাধীনতার দিনে লোকে শুনিবে কেন?

আমরা দেখিতেছি, ধর্ম্মপথের যে দুটী পরিষ্কার পথ স্বাধীনতা ও বিবেক-প্রাধান্য, সেই প্রধান দুটী অবলম্বনই বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ভয়ানক অনিষ্ট করিতেছে। স্বাধীনতা এবং বিবে-কের ধুঁয়া ধরিয়া লোক দিন দিন দুর্গতির পথে যাইতেছে। যে রক্ষক, সে ভক্ষক হইলে, আর কে রাখিবে? ব্রাহ্মসমাজের রক্ষক আজকাল ভক্ষক বেশ ধারণ করি-য়াছে। এ দুর্দ্দিনের উপায় কি?—তা বিধাতাই জানেন।

আর স্থানে কুলাইল না সুতরাং অন্যান্য কথা আজ রহিল।

পালরাজগণ।

সত্যের শীর্ষে পদাঘাতকারী কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকদিগের মনে পালরাজন্যবর্গের সম্বন্ধে যে বিকৃত ভাব বদ্ধমূলক হইয়াছে, অদ্য আমরা তাহার মূলদেশে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছি। সাধারণের অন্তঃকরণে এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, পাল নরপতিগণ গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের দারুণ শত্রু ছিলেন। তাঁহাদের অত্যাচারে বাঙ্গালার বেদবিৎ ব্রাহ্মণ লোপ পাইয়াছিল। এই সকল সংস্কারের সৃষ্টিকর্ত্তা কেবল সেই মিথ্যাবাদী ঘটকচূড়ামণিগণই বটেন। প্রকৃত পক্ষে এই সকল কথার কোন মূল্য নাই। পাল রাজন্যবর্গের ইতিহাস আমাদের অতি আদরের ধন। আমরা যদি কখনও বীরবংশধর বলিয়া জগতে পরিচিত হইতে পারি—আমরা যদি কখনও জগতে মনুষ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারি, তবে সে কেবল পাল রাজন্যবর্গের কৃপায়।—কোন্ বাঙ্গালীর বিজয়ী পতাকা পশ্চিম সাগরের তীরে উড্ডিন হইয়াছিল? কোন্ বাঙ্গালীর বিজয়ী ডঙ্কা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিনাদিত হইয়াছিল? কেবল এক পাল রাজন্যবর্গের। পালরাজন্যবর্গের ইতিহাস বাঙ্গালার ইতিহাসের একটী উজ্জ্বল অধ্যায়। এ হেন পাল নরপতিদিগের প্রকৃত ছবিকে যাঁহারা বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট বিকৃত করিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভয়ানক পাপীষ্ঠ। ইহারা স্বজাতির শত্রু ও দেশের শত্রু।

পাল রাজন্যবর্গের অভ্যুদয়-বৃত্তান্ত তমসাচ্ছন্ন গুহায় নিপতিত। তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপি সমূহের মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, এই বংশের প্রথম রাজা গোপাল দেব। ইনি বল্লভীর রাজকন্যা বাগীশ্বরী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আধুনিক পাটনাজেলার অন্তর্গত বিহার উপবিভাগের অধীন বর্ত্তমান বোড়গাও প্রাচীন কালে নালন্দা নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধদিগের উন্নতি সময়ে নালান্দারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এস্থলে বৌদ্ধদিগের অনেক গুলি মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করিতেন। বিদ্যা, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বিমল জ্যোতি প্রচার করাই ইঁহাদিগের জীবনের এক মাত্র ব্রত ছিল। পূর্ব্ব ভারতের জ্ঞান-নিকেতন সেই নালন্দানগরে বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত মহাত্মাগণ ধর্ম্মোদ্দেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিতেন। এই সকল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। মহারাজ গোপালদেব কিম্বা তাঁহার রাজ্ঞী নালন্দা নগরে যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারদেশে যে খোদিত প্রস্তর-লিপি সংযোজিত হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছেঃ—

"সম্বত ৭ আশ্বিন সুদি ৮ পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রী গোপাল রাজ নিমা (র্ম্মা) নতন্ডয়া (র্য্যাং) শ্রীবাগীশ্বরী ভট্টারিকা সুবল্লভী দেশস্থাঃ।"

প্রায় এক শতাব্দী গত হইল, মুঙ্গের নগরে পাল বংশের একখানি তাম্রশাসন

প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে সার চার্লস উইলকিন্স সাহেব তাহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনের প্রতিলিপি সহ সেই অনুবাদ "এসিয়াটিক্ রিসার্চের" প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, অদ্বিতীয় ভাগ্যবান ও দিগ্বিজয়ী মহারাজ গোপালের ধর্ম্মপাল নামে এক পুত্র ছিল। তিনি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেনন। বিজয়ী ধর্ম্মপাল দেব রাষ্ট্রকুটাপতি প্রবল নরপতির দুহিতা রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন *। এই রণ্ণা দেবী এরূপ সুন্দরী ছিলেন যে, কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্মীর অবতার বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

এই রণ্ণাদেবীর গর্ভে মহারাজ ধর্ম্মপালের এক পুত্র জন্মে। এই কুমার দেবপাল আখ্যা প্রাপ্ত হন। মহারাজাধিরাজ দেবপালদেব গঙ্গার উৎপত্তি স্থান অর্থাৎ হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ, লক্ষ্মীকূল হইতে পশ্চিম সাগরের তীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জয় করিয়াছিলেন। বিজয় কালে তাঁহার অশ্ব সকল কাম্বোজে ও হস্তী সকল বিন্ধ্যপর্ব্বতে যাইয়া আপনাদের প্রাচীন পরিবারবর্গকে দর্শন করত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল। সেই ভারতবিজয়ী দেবপালদেব বিজয়-কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক মুদগ গিরিতে স্কন্ধাভার সংস্থাপন করিয়া ভট্ট বিশ্বরথের পৌত্র, ভট্ট বৃহদ্বৈশ্বের পুত্র ভট্টবৃক্ষ রথমিশ্রকে শ্রীনগর * প্রদেশস্থিত কৃমিলার অন্তঃপাতী মিসিক গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রকুটাপতির প্রদত্ত ৭৪৪ শকাব্দের ১২ই বৈশাখের যে একখানি তাম্রশাসন বরদা নগরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার ষড়বিংশতি শ্লোকে লিখিত আছে, "গৌড়েশ্বরের আক্রমণ হইতে রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য মালবাধিপতি, কর্কারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেলেন।" †

বিজ্ঞবর লাসেন সাহেব রাষ্ট্র কুটারাজবংশের ইতিহাস লিখিতে যাইয়া বলিয়াছেন, গৌড়েশ্বর গোপালের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মালবরাজ রাষ্ট্রকুটাপতি দ্বিতীয় কর্কারাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কর্কারাজ ৭৩৭ শকাব্দে জীবনলীলা সম্বরণ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পাল বংশের স্থাপয়িতা গোপাল দেব ৭৩৭ শকাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

বিহার প্রদেশস্থ ঘোসরাঁওা (প্রকাশ্য ঙসরা) র একটী প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির

* দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশকে প্রাচীনকালে রাষ্ট্রকুটা বলিত। রাষ্ট্রকুটাপতিগণের অনেক গুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহারাও অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। রাষ্ট্রকুটাপতি প্রবলের দুহিতা রণ্ণাদেবীকে মহারাজ প্রবল বিবাহ করেন। উইলকিন্স সাহেব শাসন পত্রের শ্লোকটি ভালরূপে বুঝিতে না পারিয়া তাহারা এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—
"This prince took the hand of the daughter of Probal Raja of many countries, whose name was Rana Debee.

কিন্তু আমরা শাসনপত্রের প্রতিলিপি পাঠ করিয়া নবম শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ এইরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। "শ্রীপ্রবলস্য দুহিতুঃ ক্ষোণিপতির্জা রাষ্ট্রকুটা তিলকস্য রণ্ণা দেব্যাঃ।
Asiatic Researches. vol. I. p. 110. (2d. ed.)

* শ্রীনগর আধুনিক পাটনা।
† Journal. As. So. Bengal Vol. VIII. p. 303.

গাত্রে খোদিত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজাধিরাজ দেবপাল দেবের শাসন কালে যশোবর্ম্মা নামক একব্যক্তি বিহারের শাসন কর্ত্তা কিম্বা সামন্ত রাজা ছিলেন। *

কিছু দিন হইল ভাগলপুরে মহারাজ নারায়ণপাল দেবের একখণ্ড তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ডাক্তর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয় এই শাসন পত্রের প্রতিলিপি ও অনুবাদ স্বীয় মন্তব্যের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। মুঙ্গের ও ভাগলপুরের শাসন পত্র পরস্পর তুলনা করিলে একটী গণ্ডগোল দৃষ্ট হয়। মুঙ্গেরের শাসন পত্রে দেবপাল দেব আপনাকে ধর্ম্ম পালের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ভাগলপুরের শাসন পত্রে দেবপাল দেবকে ধর্ম্মপালের ভ্রাতা বাক্ পালের পুত্র বলা হইয়াছে। ভাগলপুরের তাম্রশাসন দেবপাল দেবের পিতৃব্য পুত্র জয়পালের পৌত্র নারায়ণপাল দেব প্রদত্ত। সুতরাং এস্থলে দেবপাল দেবের নিজের বাক্যই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ভাগলপুরের তাম্রশাসন হইতে পাল বংশের নিম্নলিখিত রূপ বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যথা—

১। গোপাল।

২। ধর্ম্মপাল   বাকপাল।

৩। দেবপাল।   জয়পাল।

৪। বিগ্রহপাল।

৫। নারায়ণপাল।

ভাগলপুরের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, জয়পাল তাঁহার অগ্রজ দেবপালের আদেশ অনুসারে উড়িষ্যা ও কামরূপ প্রভৃতি দেশাধিপতিকে জয় করিয়াছিলেন।

মুঙ্গেরের শাসন পত্রের অন্তভাগে লিখিত আছে যে, প্রকৃতি বর্গের মনোরঞ্জনার্থ মহারাজাধিরাজ দেবপাল দেব তাহার পুত্র রাজ্যপালকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগলপুরের ও অন্যান্য শাসন পত্রের সমালোচনা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, দেবপালের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিগ্রহপাল রাজদণ্ড ধারণ করেন। সুতরাং এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, যুবরাজ রাজ্যপাল তাঁহার পিতার বর্ত্তমানেই কালকবলিত হন। মহারাজ বিগ্রহপাল হৈহয় বংশজাত লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই লজ্জা দেবীর গর্ভে বীর চূড়ামণি নারায়ণপাল দেব জন্মগ্রহণ করেন।

অনল সদৃশ জ্যোতিষ্মান ও নলের ন্যায় পুণ্যশ্লোক পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্নারায়ণপাল দেব কলশ, পোত গ্রামে সহস্র দেব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া "ভাগবতঃ শিবভট্টারক" ও "পাশুপত আচার্য্য" কে স্থাপন করিয়াছিলেন।

* Journal As. So. Bengal Vol. XVII. Part I. Page 493. এই প্রস্তর লিপির মূল ও অনুবাদ পুনর্ব্বার ব্রডলি সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন। J. A. S. Bengal Vol. XLI. Part I. P. 246.

তাঁহাদের "পূজা বলি চরুসত্র" প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন ও রোগীদিগের আশ্রয়, ঔষধ ও সেবা শুশ্রূষা নির্ব্বাহ জন্য "তীরভক্ত" * প্রদেশস্থিত কঙ্ক বিষয়ির † অধীন মকুতিকা গ্রাম "ভগবন্ত শিবভট্টারক-মুদ্দিশ্য শাসনী-কৃত্য প্রদত্ত" হইয়াছিল। ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

স্বর্গীয়া শরৎসুন্দরী।

শারদ জ্যোৎস্নার মত ফুট ফুটে, পাঁচ বছরের একটী দুধের মেয়ে পিতৃ-পার্শ্বে ঐ দাঁড়াইয়া,—পিতার দুটী আঙ্গুল ধরিয়া হেলিয়া দুলিয়া খেলিতেছে। ফুল মল্লিকার মত প্রফুল্ল মোলাম মুখ খানি দেখিতে দেখিতে ঈষৎ আকুঞ্চিত ও স্ফীত হইল কেন? আহা, ডাগর ডাগর চোখ দুটী যে অশ্রুভরে ফেটে যায়! চোখের জল শতধারে ঠিক্‌রে পড়িল! কেন? মেয়ে ফুলে ফুলে গুমুরে গুমুরে কাঁদে কেন? পিতা দয়াবান কিন্তু কার্য্যকুশল বিষয়ী লোক। জনৈক অবাধ্য ইতর প্রজাকে কিঞ্চিৎ প্রহারের আদেশ করিয়াছেন। তাই মেয়ের দুই চোখে শতধারা। মেয়ে ফুলে ফুলে কাঁদি-তেছে। এ মেয়ে কে? ইনি শৈশবে শরৎ-সুন্দরী।

অপর চিত্র দেখ ঐ;—কিশোর-বয়স্কা, ত্রয়োদশ বর্ষিয়া, উন্মুক্ত-কবরী-বন্ধন, আলু-লায়িত কুন্তল-রাশি ভূ-পতিত, বিদ্যুৎবৎ ভূমি-শয্যায় শায়িত ঐ বালিকা কে? ইনি রাজ্যেশ্বরী রাজ-বনিতা, বালিকা বিধবা শরৎসুন্দরী। চোখের জলে পৃথিবী ভাসা-ইতেছেন!!

তৃতীয় দৃশ্যে দেখ ঐ,—যৌবনে যোগিনী-পবিত্র ব্রহ্ম-চারিণী, সংসার-সুখ, সংসার-শান্তি মাত্র বিরহিতা সংসারবাসিনী রাজ-রাণী। মহারাণীর পরিধানে থানের ঠেঁটি। যুবতী জঞ্জাল বোধে কৃষ্ণ কুন্তলরাশি কাটিয়া ফেলিয়াছেন! মা আমার দিবা রাত্রির মধ্যে একবার মাত্র আহার্য্য দ্রব্য স্পর্শ করেন। সে আহার স্বহস্ত-সিদ্ধ মুষ্টিমেয় আতপ তণ্ডুল! মাতা নিদ্রা যান ভূমি-শয্যায়, শীত নিবারণ করেন সামান্য কম্বল গায়ে দিয়া। মায়ের জীবনের একমাত্র চিন্তা, ভগবানের পূজা আর পতির ধ্যান; কার্য্য, কেবল দান। ব্রত-উপবাস, দান ধ্যান, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ আর চোখের জল, আহা এই সব সামগ্রীর সমষ্টি ঐ যুবতী মহারাণী শরৎসুন্দরী!

আজন্ম-দুঃখিনী অন্যের দুঃখ নিবারণ করিতেই জন্মিয়াছিলেন। অন্যের দুঃখ দূর করিতে আর নিজে দুঃখ ভোগ করিতেই আজন্ম-দুঃখিনী জন্মিয়াছিলেন। দুঃখীর দুঃখ কেমন করে দূর করিতে হয়, মা তুমিই কেবল জানিতে। অন্নপূর্ণা ঐ অন্নদানে,

---

* আধুনিক ত্রিহুত।

† প্রাচীন কালে প্রদেশের এক একটী অংশকে বিষয় বলিত। মুসলমান শাসনকাল হইতে বিষয়ের পরিবর্ত্তে পরগণা ব্যবহার হইতেছে।

ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা-শান্তি করিতেছেন। রাজ-রাণী ঐ দরিদ্রের শিশুকে কোলে তুলিয়া দুধ খাওয়াইতেছেন। দুর্বৃত্ত কর্ম্মচারী নিজের দুরাচারে দণ্ডিত, রাজ-সংসার হইতে দূরীকৃত। মা আমার, গোপনে, পিতার অগোচরে,—নিজের কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের অগোচরে, যত লোককে লুকাইয়া, ঋণ করিয়া দুর্বৃত্ত কর্ম্মচ্যুত ভৃত্যকে অর্থ প্রেরণ করিতেছেন। 'আহা তার কষ্ট হবে, পূজার সময় তার ছেলেপিলে কাপড় পাবে না?' মা আমার কেমন করে তা দেখিবেন! ঋণ করিয়া দাসীর হাতে তাকে টাকা পাঠাইলেন, আর বলিয়া দিলেন যে,'দেখিস,ইহা যেন কেহ জানিতে না পায়'। কেমনা যাকে টাকা পাঠান হলো,সে তাঁহার নিজেরই অনেক টাকা অপহরণ করিয়াছিল।

ব্রহ্ম-চারিণী স্বহস্তে অর্থ স্পর্শ করিতেন না। তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হইত,কেবল লোককে দিতে। আহা, সে দানের জন্যও মায়ের কত সঙ্কোচ, কত লজ্জাশীলতা। মা যখন রাজ্যেশ্বরী, তখনও তাঁহার পিতার নিকট মুখ ফুটিয়া কোন অনুরোধ করিতে সাহসী হইতেন না। সময়ে সময়ে রাজ কর্ম্মচারীদিগের নিকটেও নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া পাঠাইতে কুণ্ঠিত হইতেন। অথচ দান যে করিতেই হইবে। যাহাকে যাহা দিবেন ভাবিয়াছেন, তাহা যে দিতেই হইবে, না দিলে যে চলিবেই না; নহিলে যে জগদ্ধাত্রী নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। আহা,এই অর্থ সংগ্রহের জন্যও সময়ে সময়ে মায়ের কতই না কষ্ট, কতই না উৎকণ্ঠা হইত।

আর সে কি কেবল অর্থদান! যে দ্রব্য অর্থের অতীত, সংসারে সুদুর্লভ,—স্বর্গে আছে কি না কেহ জানে না, সেই অমূল্য অতি পবিত্র অশ্রু তিনি অজস্র দান করিতেন। দুঃখিনীর নিজের দুঃখাশ্রু দিনেকের তরে শুকায় নাই, তার উপর পরদুঃখ-কাতরতায় অভিভূত হইয়া, কতই না অশ্রু-পাত করিতেন। আজি অমুকের অমুক পীড়িত, মা আমার কেঁদেই অস্থির! কেহ একটু সামান্য কষ্টে ক্লিষ্ট হইলে মায়ের চোখে জল ধরিত না। অভাগিনী কাঁদিতে আসিয়াছিলেন, কাঁদিয়াই গেলেন। পবিত্র অশ্রুপাত দ্বারা পৃথিবীর পাপ-পঙ্ক প্রক্ষালন করিবার জন্যই যেন মা আমার জন্মিয়াছিলেন।

হায় হায়, ঐ দেখ আর এক সাংঘাতিক দৃশ্য! যতীন্দ্র শ্মশানে শায়িত! অভাগিনী বিধবার দত্তক সন্তান,—পালিত পুত্র যতীন্দ্র,—শুষ্ক মরুভূমিতে একটী সুকুমার পল্লব, চির অন্ধকারে আবৃত রাজ-ভবনে একবিন্দু জ্যোৎস্না-জ্যোতি, হায়, ঐ নিবিয়া গেল! বিধবা, সযত্নে ও অতি সন্তর্পণে পালিত যতীন্দ্রের জীবন-ছায়ায় দগ্ধহৃদয় ক্ষণেকের জন্য স্থাপিত করিয়া একটু জুড়াইবেন, হায়, সে আশাতেও ছাই পড়িল! যম যতীন্দ্রকে লইলেন। আশার ক্ষুদ্র কণিকা,—অতি ক্ষুদ্র কণিকা,—আহা, যাহা শত গ্রন্থি দিয়া বাঁধিয়াছিলেন,—অভাগীর অঞ্চল হইতে খসিয়া পড়িল!!! মা কাশী হইতে ফিরিলেন—পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিতে!!!

অহো অশ্রুজল, তোমার সীমা কোথায়! অহো নারায়ণ! তোমার লীলা কে বুঝিবে!!

পরের অশ্রু মোচন করা যাঁহার জীবনের ব্রত, এক মাত্র অবলম্বন,—তিনি নিজের

অশ্রু লইয়া কতক্ষণ থাকিতে পারেন! মা আমার অশ্রুবারি-পারাবার; কিন্তু নিজের অশ্রু হায় তখনি মুছিলেন। হৃদয়-বেগ হৃদয়ে চাপিলেন। দগ্ধ হৃদয়ের ভস্ম-রাশির মধ্যে নূতন আগুন লুকাইয়া, মা, আবার পর-অশ্রুমোচনে, পর-দুঃখ নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। যৌবনে-যোগিনী, পুত্র-শোকাতুরা জননী, বিধবা ব্রহ্মচারিণী দেখ ঐ চিত্ত স্থির করিয়াছেন। পুত্র-শোক, পতি-শোকের পবিত্র মন্দির পার্শ্বে রাখিয়া, অন্নপূর্ণা আবার ঐ অন্ন বিলাইতেছেন!

দুঃখিত হই নাই, মা! বড় সুখী হইয়াছি, সন্তপ্ত হই নাই, মাগো! শান্ত হইয়াছি; —শুনিয়া যে, তুমি এই মৃত্যুময় পৃথিবীতে আর নাই। সুখী হইয়াছি, শান্ত হইয়াছি, মা শুনিয়া, এ জড় জীবনের জ্বালা তুমি জুড়াইয়াছ। মৃত্যুর তাড়না, জীবনের যাতনা আর সহিতে হইবে না, মা! শোকের সুতীক্ষ্ণ সহস্র শলাকা আর ও কুসুম-কোমল হৃদয় বিদীর্ণ করিবে না মা! তোমার জীবন্ত চিতা আশৈশব জ্বলিতেছিল,—যে চিতায় শচী-সন্নিভ সৌন্দর্য্য, দেবতা-দুর্লভ-প্রেম, ক্ষীর-নিধি-নিন্দিত স্নেহ, পারিজাত-পরাজয়ী কোমলতা, মধুরতা, যে জীবন্ত চিতায় আশৈশব ধীরে নিঃশব্দে পুড়িতেছিল, পুড়িয়া পুড়িয়া পুড়িয়া আবার পুড়িতেছিল,—পুড়িয়া পুড়িয়াও হায় পবিত্র পরিমলে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিতেছিল, সেই জ্বলন্ত জ্বালাময়ী জীবন-চিতা, মা তোমার আজি নিবিয়াছে। সন্তপ্ত হইব কোন্ প্রাণে মা!

মাগো! ঢের হইয়াছে! যাও, এখন একটু জুড়াও গিয়া! যে সৎচিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণে ও শরীরমনজীবন যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলে, যাও মা তাঁহার নিকট জুড়াও গিয়া! যে পরব্রহ্মকে তুমি পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে, রূপ যৌবন নারীধর্ম্ম যাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলে, মাত! ব্রহ্মচারিণি! তাঁহার নিকট যাইয়া শান্তি সম্ভোগ কর। স্বর্গে-সুরলোকে স্বস্থানে গিয়া বসো মা! আহা, তথায় শোক সন্তাপ বৈধব্য নাই, বিরহের বিষ নাই! তোমার "পুণ্য কর্ম্ম" পূর্ণ, এখন যাও

———স্বামী পাছে
অনন্ত যুগান্ত রবে কাছে কাছে,
ভুঞ্জিবে অনন্ত মহামঙ্গল।
অনন্ত বসন্তে তথা অনন্ত যৌবন,
অনন্ত প্রণয়ে তথা অনন্ত মিলন,
অনন্ত সৌন্দর্য্যে হয় অনন্ত দর্শন,
অনন্ত বাসনা তৃপ্তি অনন্ত।
দম্পতি আছয়ে নাহি বৈধব্য ঘটনা,
মিলন আছয়ে নাহি বিচ্ছেদ যন্ত্রণা,
প্রণয় আছয়ে নাহি কলহ গঞ্জনা,
রূপ আছে নাহি রিপু দুরন্ত॥

* * * *

সত্যযুগের সাবিত্রী নারীজাতিকে সতী-ধর্ম্ম, বিধবাকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিবার জন্যই যেন কলিতে শরৎসুন্দরীরূপে জন্মিয়াছিলেন। শরৎসুন্দরী প্রাতঃস্মরণীয়া।

এই প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীর প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলী যাঁহারা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি তাহা একত্র ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মহারাণীর একখানি জীবনী প্রণয়ন করেন,—ইহা করাই উচিত ও অত্যন্ত আবশ্যক,—তাহা হইলে দেশের পরম উপকার হয়। উপযুক্ত উপাদান সংগৃহীত হইলে, এরূপ পুস্তক লেখার জন্য বোধ হয় লিপিক্ষম সহৃদয়

লেখকের অভাব হইবে না। পুঁটিয়া রাজ-সংসার-সংশ্লিষ্ট কোন মহাশয় এ বিষয়ে মনোযোগ করুন।

শ্রীঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায়।

সাবিত্রী প্রতিবাদের প্রতিবাদ। (১)

গত মাঘ মাসের "নব্যভারতে" বাবু বিজয় চন্দ্র মজুমদার "সাবিত্রী" পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়া একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমি যথা সময়ে সে প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছি। প্রবন্ধটী এত অসার যুক্তি ও হীন গালিগালাজে পরিপূর্ণ যে, সে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা আমার পক্ষে লজ্জাজনক মনে হইয়াছিল। তাই আমি এতদিন নীরব ছিলাম। কিন্তু অবশেষে ভাবিয়া দেখিলাম, আজকাল জনকয়েক যুবক তাঁহার মত ভ্রান্তমতগ্রস্ত হইয়াছেন; তদ্দ্বারা তাঁহাদের এবং তাঁহাদের আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুবান্ধবগণের যথেষ্ট অনিষ্ট হইতে পারে। অতএব তাঁহারা যে কি বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাহা দেখাইয়া দিলে তাঁহাদের বিশেষ উপকার করা হইবে। তাই আমার এ চেষ্টা।

লেখক ভূমিকার যে প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়কে যে গালাগালি দিয়াছেন, সে সকল কথার সহিত তাঁহার নিজের সম্বন্ধ; সুতরাং সে সকল কথার যৎকিঞ্চিৎ উত্তর উপসংহারে দিব। তিনি "বর্ত্তমান শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্য" প্রবন্ধটীর প্রতিবাদে বলিয়াছেন, "প্রবন্ধটী খুব সুন্দর, কিন্তু বড় ছোট। এবিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে একটা প্রকাণ্ড বই হয়" ইত্যাদি! একথাগুলির উত্তর দিবার আবশ্যক নাই; কারণ নব্যভারতের পাঠকমাত্রেই জানেন, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একটী সভাস্থলে প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে একটী প্রকাণ্ড পুস্তক পাঠকরা যে উন্মাদের কায, একথা তাঁহাদিগকে বলা বাহুল্য মাত্র! "আমাদের অভাব" প্রবন্ধটীকে তিনি যে 'অসম্পূর্ণ' বলিয়াছেন, তাহারও কোনও উত্তর নাই। প্রবন্ধের নামেই প্রকাশ হইতেছে, প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ হইবে। ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ কথা; কারণ কোন দেশের যাবতীয় অভাব সেই দেশের একটী লোকের দ্বারা ব্যক্ত হইতে পারেনা। পূর্ণ বাবু সেই জন্যই প্রবন্ধের আরম্ভে লিখিয়াছেন, "সব অভাব বলা হইল না।" তবে সাবিত্রীর বিজ্ঞ পাঠকগণ এটা দেখিতে পাইবেন যে, উক্ত প্রবন্ধে এরূপ অনেক মত ব্যক্ত করা হইয়াছে, সম্প্রতি যে সকল মতের বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

সাবিত্রীর ৩য় ও ৪র্থ প্রবন্ধ "হিন্দুপত্নী" এবং "বিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য।" এই বিষয় লইয়া অনেক দিন হইতে অনেক বক্তৃতা, তর্কবিতর্ক হইতেছে! এত রচনা, এত বাক্‌বিতণ্ডার মূল কারণ, হিন্দু বিবাহ প্রণালী এবং হিন্দু পতিপত্নীর সম্বন্ধ ইংরেজ

জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই প্রভেদ হইতেই অন্যান্য আপত্তির উৎপত্তি। যদি এ প্রভেদ না থাকিত, এ সকল আপত্তির ঘটা আদৌ উঠিত না। যাহা হউক, উক্ত প্রবন্ধ দুইটীর লেখকের পরিচয়, বোধ হয়, কাহারও নিকট দিতে হইবে না। চন্দ্রনাথবাবু যেরূপ জ্ঞানী ও পরিণামদর্শী এবং দেশের পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, প্রবন্ধ দুইটী ঠিক তদুপযোগী হইয়াছে। তিনি মানব জীবনের চরম লক্ষ্য, বিবাহের মূলতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু পরিবারের মূল গ্রন্থি কি, কিসে হিন্দুনারী সর্ব্বজাতীয় নারীর আদর্শস্থল, কেন হিন্দু সংসারাশ্রম অপেক্ষা মনুষ্যত্ব শিক্ষাদায়ক প্রথা আর নাই, কি কারণে হিন্দুনারীর প্রেম জগতে অতুলনীয়, এই দুই প্রবন্ধে তাহা অতি বিশদরূপে বুঝান হইয়াছে। এক কথায়, বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ কেহ লেখেন নাই। যাঁহাদের বিশ্বাস, আত্মচরিতার্থই বিবাহের উদ্দেশ্য, তাঁহারা স্বভাবত আপনাদের পরিতোষই বুঝেন; পত্নী স্বস্ব রুচি প্রকৃতি সম্পন্ন হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। পরোপকারের জন্য, ধর্ম্মোন্নতির জন্য তাঁহারা বিবাহ করেন না, সমস্ত পরিবার বন্ধন দৃঢ় করা, সমস্ত পরিবারের সুখ শান্তি বিধান করা, সমাজ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করা, সমাজের অনিষ্ট দূর করা, সমাজোন্নতি করা, তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে।

লেখকের একটী ধারণা আছে যে, বিবাহ না করিয়া গৃহস্থাশ্রমী হওয়া যায়, এবং সমাজেরও উপকার করা যায়। হিন্দুশাস্ত্রে গৃহস্থাশ্রম বলিতে কি বুঝায়, তিনি তাহা জানেন না বলিয়া, এবং চন্দ্রনাথ বাবু যাহার অতি সুন্দর ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে অক্ষম হইয়াই, এই বিপাকে পড়িয়াছেন। মনুসংহিতাতে গৃহস্থের যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, সে সকল কার্য্য বিবাহ ব্যতীত কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে না; স্ত্রী ব্যতিরেকে গৃহস্থ সমাজের সে সমস্ত মহদুপকার করিতে অক্ষম। আজ কালকার বিলাতী নীতি দেখিয়া বিচার করিলেও বুঝিতে পারা যায়, অবিবাহিত যুবকের জীবন শীঘ্র এবং সহজে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, চরিত্র গঠিত হইতে পারে না, সৎবৃত্তিনিচয় অচিরে শুকাইয়া যায়, দুর্দ্দমনীয় রিপু প্রবল হইয়া জীবন পাষাণবৎ করিয়া তুলে। তখন সে সমাজের ভীষণ অনিষ্ট করিতে থাকে। আগে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, তারপর সমাজের উৎপত্তি হয়। বিবাহ ব্যতীত সমাজ গঠিত হইতে পারে না, সমাজের উন্নতি ও পূর্ণতাসাধন হয় না। বিবাহ ব্যতীত, মানুষ, মানুষ হইতে পারে না। তাই সকল দেশেই বিবাহ প্রথা প্রচলিত। যে সকল দেশে আমাদের মত গৃহস্থাশ্রম নাই এবং যে সকল দেশের অধিবাসীগণ ধর্ম্ম সাধনার্থ বিবাহ করেন না, তাঁহারাও স্বেচ্ছাচারিতাকে ভয় করেন ও ঘৃণা করেন। চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন, "বোধ হয়, হিন্দু ভিন্ন জগতে আর কেহই ধর্ম্মচর্য্যা, সমাজসেবা ও পরোপকারের জন্য দার পরিগ্রহ করে নাই ও করে না।" লেখক পাশ্চত্য রীতিনীতিপ্রিয়তা দেখাইতে গিয়া বলিতেছেন, "খ্রীষ্টিয়ানদিগের বিবাহ বিষয়ক এইরূপ মত ও উপদেশের কথা ছাড়িয়া দি। বহু শতাব্দী পূর্ব্বের অখ্রীষ্টীয়ান, Stoic কুলোজ্জ্বল মার্কাস অরিলাস এণ্টোনিনাসের কথা কি চন্দ্রনাথ বাবুর

মত পণ্ডিত ব্যক্তি ভুলিয়া গেলেন?" তিনি অনুগ্রহ করিয়া কি নব্যভারতের পাঠকবর্গকে এবং আমাকে সেই ব্যবস্থাগুলি দেখাইতে পারেন? খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের কোথাও বলে না, "ধর্মাচর্য্যা, সমাজ সেবা ও পরোপকারের জন্যই বিবাহ করিতে হয়।" আর অরিলাস এণ্টোনিনাসের কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এই জিজ্ঞাস্য যে, সেই মহাত্মার মতে রোমকেরা চলিয়াছিল কি? কেবল ব্যক্তিবিশেষের মতে কোন কার্য্য হয় না; দেশশুদ্ধ লোক ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য ভাবিয়া অবনত মস্তকে না পালন করিলে ত বলিতে পারিব না, অমুক দেশে অমুক মত প্রচলিত ছিল। দেখা যায়, প্লেটোর কোন কোন মত বেদান্তের সহিত মিলে; তাই বলিয়া কি বলিব, প্লেটো অথবা গ্রীকেরা বেদান্ত ধর্ম্ম জানিতেন? রোম বা গ্রীসে সেরূপ হয় নাই; ভারতবর্ষে ঐ মত আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টিয়ান জীবন ও হিন্দুজীবন পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বিজয়বাবু নিজের ইতিহাসাভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া নিজেই ঠকিলেন। তাঁহার মত কেহ কেহ এইরূপ বৃথা পাণ্ডিত্য দেখাইয়া থাকেন।

বিজয়বাবু বলেন, "ধর্ম্মের অর্থ সাধারণ সীমায় দাঁড়াইয়া বুঝিতে গেলে এইরূপ বুঝি যে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য যাহা, আদর্শ যাহা, কর্ত্তব্য যাহা, তাহারই সাধনের নাম ধর্ম্মসাধন।" প্রথমে "সাধারণ সীমা" কথার অর্থ কি, তাহা ত বুঝা গেল না। সুতরাং সাধারণ সীমায় দাঁড়াইয়া মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ, কর্ত্তব্য কি, কিরূপ বুঝিব? তবে তিনি যেন এইটুকু বুঝেন, তাঁহার কাছে মানবজীবনের যাহা উদ্দেশ্য, আমার কাছে বা আর কাহার কাছে তাহা হইতে পারে না। তাঁহার আদর্শ এক, আমার বা আর কাহারও আদর্শ অন্যরূপ। তিনি যাহাকে কর্ত্তব্য বলেন, আমি তাহাকে অকর্ত্তব্য বলিতে পারি। মনুষ্য ভেদে, দেশ ভেদে, উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্ত্তব্য বিভিন্ন প্রকারের। তিনি বলেন, "সকলের পক্ষে কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম, জীবন বিজ্ঞানের মীমাংসায় স্থিরীকৃত হইবে।" 'জীবন বিজ্ঞান' কথাটা কোন্ অভিধানে আছে, এবং তাহার মীমাংসাই বা কিরূপ, তিনি বলিতে পারেন কি? "যে কর্ত্তব্যগুলি সম্বন্ধে মত ভেদ দৃষ্ট হইবে, সেগুলিও মতগত সূক্ষ্ম কথার বিচার ছাড়িয়া দিলে ব্যবহারে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়।" এ কথাগুলির অর্থ কি? কোনও বঙ্গভাষাজ্ঞ, বোধ হয়, একথাগুলির অর্থ করিতে পারিবেন না। যাহা হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। চন্দ্রনাথবাবু বলিয়াছেন যে, "হিন্দু বিবাহ ধর্ম্মের জন্য।" বিজয়বাবু তাহা অস্বীকার করিয়া ধর্ম্মের উপরোক্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চন্দ্রনাথবাবু হিন্দু বিবাহের আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং সেই হিন্দুজাতি ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝেন, তাহাই লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "হিন্দু বিবাহ ধর্ম্মের জন্য।" হিন্দুর জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্ম। হিন্দুর "আচার ধর্ম্ম, ব্যবহার ধর্ম্ম, আহার ধর্ম্ম, উপাসনা ধর্ম্ম, ব্রত ধর্ম্ম"—প্রত্যেক কার্য্য, জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠান ধর্ম্ম। তাই শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু এক স্থলে বলিয়াছেন, "For Religion, the ancient Hindu had no name, because his conception of it was so broad as to dispence with the necessity of a name * * * To the Hindu his whole life was Religion. To other peoples,

their relations to God and to the spiritual world are things sharply distinguished from their relations to man and to the temporal world. To the Hindu, his relations to God and his relations to man, his spiritual life and his temporal life are incapable of being so distinguished."

হিন্দুশাস্ত্রকারেরা হিন্দুজীবনের প্রত্যেক কার্য্য অনুষ্ঠানাদির যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, অর্থাৎ হিন্দুর পক্ষে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসম্পাদনের জন্য তাঁহারা বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই সকল হিন্দুসমাজ গঠনকর্ত্তার মত বিবাহ দ্বারা হিন্দুসমাজের সেবা হইবে, এবং সেই জন্য তাঁহারা হিন্দুবিবাহ প্রণালী অন্য সকল জাতির বিবাহ প্রণালী হইতে বিভিন্নরূপ করিয়া গিয়াছেন। অতএব যাঁহারা আমাদের বিবাহ প্রণালীর আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাঁহারা যেন অগ্রে হিন্দুধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝিতে বিশেষ যত্ন করেন।

ইহার পর লেখক কতক স্থলে এমন কথা বলিয়াছেন, যাহা চন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ দুইটীতে নাই। কল্পনা করিয়াও লওয়া যায় না। তথাপি পাঠকবর্গকে তাঁহার জীবনের আদর্শ কি, দেখাইবার জন্য আমি তাঁহার কতকগুলি কথার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। "তবে যদি এ কথা বলা যায় যে, স্ত্রী জাতির মধ্যে এমন সকল গুণ আছে, যাহা আমাদের লাভ করা উচিত। এবং না করিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না, তাহা হইলেও সিদ্ধান্ত হয় না যে বিবাহই প্রয়োজনীয়।" কেবল চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত যে এসকল কথার কোনও সম্বন্ধ নাই, এরূপ নহে,—ইউরোপ, আমেরিকা, এসিয়া—পৃথিবীর কোন অংশের অধিবাসীরা বলেন না যে, স্ত্রীর গুণ পুরুষে গ্রহণ করিবে বলিয়া, এবং কাজেই পুরুষের গুণ স্ত্রী গ্রহণ করিবে বলিয়া মনুষ্য জাতি মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত। আজ বিজয় বাবু মানবমনে একটী নূতনভাব প্রবেশ করাইলেন। তারপর তিনি বলিতেছেন "বন্ধুত্বসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া অনেকানেক স্ত্রী লোকের হৃদয়গত মহত্ত্বও সঞ্চয় করিতে পথ পাইতে পারি। আমার এই শেষ কথায় যদি কেহ অপবিত্রতার আশঙ্কা করেন, তবে আমি তাঁহাকে যে কি ভাষায় তিরস্কার করিব, তাহার অনুসন্ধান জন্য অভিধানের পৃষ্ঠা উল্টাইব।" আমি একথাগুলিতে কোন মতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আমাদের একটী প্রবাদ আছে, "ঠাকুর ঘরে কে, না আমি কলা খাইনে;" বিজয় বাবুর কথাতে আমার সেই প্রবাদটী মনে পড়িতেছে। তাই বলি, যথেষ্ট হইয়াছে, এখন আর লোকের চক্ষে ধূলি দিবার প্রয়াস কেন? আপনার এ কথা কয়টীর উত্তর দিয়া আপনার অভিধানের যাবতীয় তিরস্কার শুনিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। যদি নিতান্তই রাগ সামলাইতে না পারেন, তবে ফাল্গুন মাসের নব্যভারতের "যৌবন বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ" নামক প্রবন্ধ লেখককে যত পারেন, তিরস্কার করিবেন।*

শ্রীগোবিন্দ লাল দত্ত।

---

* স্থানাভাব প্রযুক্ত আমরা এই প্রবন্ধটী একবারে প্রকাশ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম। একবারে প্রকাশ না করায় প্রস্তাবের সৌন্দর্য্য কিছু খর্ব্ব হইল, কিন্তু কি করি, উপায় নাই। প্রস্তাব-লেখক এবং পাঠকগণ দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। ন, স।

বিল্বমঙ্গল।

মানব-হৃদয় যে প্রেমের বন্ধনে আজীবন আবদ্ধ, যোগী ঋষিগণ যে প্রেমের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া নিবিড় কাননে পর্ব্বতগুহায় সমাধি লাভ করেন, উদাসী সন্ন্যাসী যে প্রেমে পাগল হইয়া দিনপাত করেন, বিল্বমঙ্গল সেই প্রেমের দাস, প্রেমিক বৈরাগী পাগল সন্ন্যাসী, তাঁহার আদর্শ প্রেমের ছবি নির্নিমেষ নয়নে দর্শনীয়।

বিল্বমঙ্গল বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-সন্তান, যৌবন আরম্ভেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। দুর্ভাগ্যই বল, সৌভাগ্যই বল, আর কর্ম্ম ফলই বল, তিনি চিন্তামণি নামক একটী বারবনিতাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। সে ভালবাসা জগতে দুর্লভ, অতি উচ্চ, অতি পবিত্র ও স্বর্গীয়।

পিতৃশ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিন যখন তিনি চিন্তামণির নিকট বিদায় লইয়া আসেন। তখন বলিয়াছিলেন যে, আবার আমি কাল নিশ্চয় আসিব। পরদিবস শ্রাদ্ধের সমস্ত আয়োজন হইল, বাড়ীতে মহা সমারোহ, শত শত লোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। বিল্বমঙ্গল পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে কুলপুরোহিত সমীপে উপবিষ্ট হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। পুরোহিতেরা মন্ত্রপাঠ করাইতে লাগিল, তিনি যথারীতি পাঠ করিতে লাগিলেন। সহসা তিনি চমকিয়া উঠিলেন, চিন্তামণির নিকট তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ হইল, অমনি খোলা ডোঙ্গা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, পিতৃপিণ্ড গড়াগড়ি যাইল। তিনি পুরোহিতকে বলিলেন, মহাশয়, আপনি শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাপন করুন, আমি আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, আমি চিন্তামণির নিকট যাইতেছি। আত্মীয় বন্ধুরা কত বুঝাইল, কত বিনয় করিল; কিন্তু কে বুঝে? বিল্বমঙ্গল বলিলেন, তোমরা আমাকে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিও না, আমি কিছুতেই থাকিব না। আজ যদি চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া যায়, পৃথিবী চূর্ণ হইয়া যায়, তবু আজি আমি চিন্তামণির নিকট যাইব। এ জগতে এমন কি আছে, এমন কে আছে, যে আমাকে বাধা দিতে পারে? এই বলিয়া বিল্বমঙ্গল উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া বাড়ীর বাহির হইলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখেন, আর বেলা নাই, জগৎ যেন নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কি এক বিপদের আশঙ্কা করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বেলা অবসান হইল, সূর্য্যদেব নদীর বুকে মাথা লুকাইল, সাঁঝের গগনে ঘোর কাল মেঘে ছাইয়া চাঁদের মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশবিজনে বিজলি খেলিতে লাগিল, চারিদিক হইতে সন্ সন্ করিয়া গাছপালা কাঁপিয়া উঠিল। বিল্বমঙ্গল দেখিলেন; ভয়ানক ঝড় আসিতেছে। দৌড়িয়া নদীকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভয়ঙ্কর ঝড় আরম্ভ হইল, নদী সোঁ সোঁ করিয়া ভীষণ রবে গর্জ্জিয়া উঠিল, বড় বড় বৃক্ষ সকল মড় মড় শব্দে চুরমার হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল, মেঘের গর্জ্জনে, নদীর তর্জ্জনে, ঘোর

আঁধারে নদীকূলে দাঁড়াইয়া বিল্বমঙ্গল তখন শুধু সেই মুখখানি চিন্তা করিতেছেন। নদীতে নৌকা রাখা অসাধ্য হইয়াছে, মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া প্রাণভয়ে সকলেই পারে উঠিয়াছে। পার করিবার জন্য বিল্বমঙ্গল বড়ই অনুনয় বিনয় করিলেন, তাহারা পাগল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল। নদীতে তুমুল তুফান উঠিয়াছে, এখন কি করি, কেমন করিয়া পার হই, এই ভাবিয়া বিল্বমঙ্গল পাগলের ন্যায় চারিদিকে ছুটিতে লাগিলেন। এমন পাগলামি কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ?

জলস্রোতের সম্মুখে বাধা পড়িলে যেমন জলের বেগ সহস্রগুণে বাড়িয়া উঠে, আজ এই গভীর আঁধারে, ঘোর দুর্য্যোগে বিল্বমঙ্গলের নদী পার হইতে যেমন বাধা পড়িল, অমনি তাঁহার গভীর ভালবাসার উচ্ছ্বাস আরো শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। নদীকূলে দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "আজি যদি চিন্তামণিকে দেখিবার জন্য এ তুচ্ছ জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, আমি তাহাও করিব," এই বলিয়া "হা চিন্তামণি! হা চিন্তামণি!" করিতে করিতে সেই গভীর আঁধারে ঘোর গর্জ্জনে ভীষণ তরঙ্গায়িত সেই অকূলপাথারে বিল্বমঙ্গল ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। এই উদ্বেলিত ভালবাসার সীমা কোথায়, তুলনা কোথায় ? সাধক বিল্বমঙ্গল প্রেমিকের শিরোমণি, চিন্তামণি সতী কি কলঙ্কিনী দেখিবার আবশ্যক নাই, তুমি কি তোমার দেবতার গুণাগুণ বিচার করিয়া থাক ? তোমার ও বিল্বমঙ্গলের ভালবাসায় প্রকৃতিগত কোন বিভিন্নতা নাই, কেবল দেখিতে হইবে, এই ভালবাসা হইতে মোক্ষ কত দূরে।

যখন চিন্তামণি-নাম জপ করিতে করিতে বিল্বমঙ্গল ঝাঁপ দিয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন, তখনও মুখে কেবল চিন্তামণি। চিন্তামণি ধ্যান, চিন্তামণি জ্ঞান, এক চিন্তামণির চিন্তা ভিন্ন তাঁহার অন্য চিন্তা ছিল না। যখন নদী স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া চলিলেন, জীবনের আর আশা নাই, তখনও চিন্তামণিকে যে হারাইতে হইবে, এই ভাবনায় মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতে লাগিল। যমকে কে ভয় করে ? কিন্তু সেই মুখখানি যে আর দেখিব না, তাহাকে যে ভুলিতে হইবে, কোমলতার কঠোর শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে হইবে এইত কষ্ট, পিছনদিকে চাই আর একবার করিয়া চোখ মুছি। শেষ চক্ষু বুজাইয়া মায়ের কোলে মাথা গুঁজিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়ি। যদি ভালবাসিবার কেহ না থাকিত, এ তুচ্ছ জীবন ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারিতাম। সেই এক মাধ্যাকর্ষণের বাঁধুনিতে এখনও ঘুরিতেছি। যে দিন সেই বন্ধন কাটিবে, কোথায় ছট্‌কাইয়া পড়িব, কে জানে ?

নদী স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বিল্বমঙ্গল দেখিলেন, একখণ্ড কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া তিনি অতি কষ্টে নদী পার হইলেন। কোনও প্রকারে অভিপ্রেত স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, চিন্তামণির বাটীর দ্বারবদ্ধ রহিয়াছে। যে মহা ঝড়ে পশু পক্ষী আপন স্থান ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে সাহস পায় না, সেই বিষম গভীর রজনীতে ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে বিল্বমঙ্গল নদী পার হইয়া আসিবে, এ সম্ভাবনা কি চিন্তামণির হৃদয়ে একবারও স্থান পাইয়া ছিল ? না। তাঁহার

গভীর ভালবাসা কেহ কি বুঝিয়াছিল? না। বিল্বমঙ্গল নদী পার হইয়া অন্ধকারে চিন্তামণির বাড়ীর প্রাচীর হাতড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, তখনও ঝড় থামে নাই, অন্ধকার টুটে নাই, নদী তেমনই সোঁ সোঁ করিতেছে, বিদ্যুৎ তেমনি চমকিয়া চমকাইতেছে। সেই আঁধারে বিল্বমঙ্গল দেয়াল হাতড়াইয়া দেখিতেছেন, কোন কিছু মিলে কি না, যাহা ধরিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন। অতি কষ্টে বাগানের ভিতর নারিকেল গাছের নিকট দেয়ালের গায়ে একখণ্ড দড়ী ঝুলিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। সেই দড়া ধরিয়া দেয়াল ডিঙ্গাইয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, এ কি! বলিয়া চিন্তামণি শিহরিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল; আমি কি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি? অথবা বিল্বমঙ্গল কি ভয়ানক লোক। এই ভয়ানক তুফানে নদী তোলপাড় করিতেছে, লোকে ঘরের বাহির হইতে পারে না, আর এ কেমন করিয়া নদী পার হইয়া আসিল। ইহার গাত্র হইতেই বা এমন ভয়ানক দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে কেন? তখন বিল্বমঙ্গল অচৈতন্য হইয়াছে দেখিতে পাইল এবং অনেক যত্ন করিয়া সচৈতন্য করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "বিল্বমঙ্গল! তুমি সত্য সত্যই কি পাগল হইয়াছ? ভয়ঙ্কর রজনীতে নদীতে যে তুফান উঠিয়াছে, তুমি কেমন করিয়া পার হইলে? তুমি কি কাল বাড়ী যাও নাই? আমার চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য এখানে কোথাও লুকাইয়া ছিলে? সময়ে নদী পার হওয়া মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে।" এই বলিয়া চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে নানা প্রকার ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। তখন বিল্বমঙ্গল বলিল "চিন্তামণি! তুমি জান না যে আমি তোমাকে কত ভালবাসি। কাল আমি বাড়ী গিয়াছিলাম, কিন্তু বাবার শ্রাদ্ধ দিব বলিয়া আজ আসিতে বিলম্ব হইল। যখন তাঁহার পিণ্ডদান করিতে ছিলাম, তখন সহসা তোমার নাম মনে পড়িল, অমনি সেই পিণ্ড ফেলিয়া শ্রাদ্ধ সমাপন না হইতেই আমি ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হই, নদী তীরে আসিয়া দেখি, তুমুল ঝড় উঠিয়াছে, তখন আর অন্য উপায় পাইলাম না, মাঝিরা পার করিল না, তখন তোমারি নাম স্মরণ করিয়া অকূলসাগরে ঝাঁপ দিলাম, প্রাণ যায় যায় হইয়াছে এমন সময়ে একটুকরা কাঠ ভাসিয়া যাইতেছিল, সেই টুকু আশ্রয় করিয়া নদী পার হইলাম! তোমার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া অনেকক্ষণ হাতড়াইয়া দেখিলাম, প্রাচীরের উপর একটী দড়ি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, সেই দড়ি ধরিয়া দেয়াল ডিঙ্গাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছি।"

তখন ধীরে ধীরে ঝড় থামিতেছিল, নদীর তর্জ্জন মেঘের গর্জ্জন ক্রমে শিথিল হইয়া আসিল, পৃথিবী শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া যেন নীরবে ঘুমাইয়া পড়িল, আকাশে জ্যোৎস্না ফুট ফুট করিতে লাগিল। ভাঙ্গা চুরা মেঘের আড়ালে লুকাইয়া এক আধটী তারকা মিটি মিটি চাহিয়া সেই গভীর রজনীর নীরব নিস্তব্ধতায় মধ্যে বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির কথোপকথন শুনিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে জগতের

কি পরিবর্ত্তন? মনোজগতেও কি এইরূপ হয়? দেখা যাইবে।

চিন্তামণি তখনও আকুল প্রাণে [illegible]

[illegible] বিল্বমঙ্গল কি সত্য সত্য আমাকে [illegible] ভালবাসে? এ কখনও সম্ভব নয়। এ আমাকে প্রতারণা করিতেছে। এত ভালবাসা মানুষে যে দুর্লভ। বিশেষ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস হয় না। এই ভাবিয়া [illegible]মণি বলিল "তুমি কেমন কাঠ ধরিয়া ভাসিয়া আসিয়াছ আমাকে দেখাইবে চল।" তাহাকে সঙ্গে করিয়া প্রান্তরে লইয়া বিল্বমঙ্গল দেখাইয়া দিল। চিন্তামণি নিকটে যাইয়া শিহরিয়া উঠিল—"ওমা কি [illegible]নক! এ যে মরা মানুষ! কাঠ কোথা?" [illegible]মঙ্গল বলিল "ঐ কাঠ বক্ষে ধরিয়া নদী পার হইয়াছি, ও কি তা আমি জানিনা।" তখন চিন্তামণি সেই দড়ি দেখিতে চাহিল, [illegible]মঙ্গল দূর হইতে দেখাইয়া বলিল ওই নারিকেল গাছের কাছে সে দড়ি ঝুলিয়া [illegible]য়াছে। চিন্তামণি নিকটে যাইয়া [illegible]খিয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! সে দড়ি নয় ভীষণ অজা-[illegible]!

এতক্ষণে চিন্তামণির মোহ ভাঙ্গিল, চেতনা হইল। তিনি বিল্বমঙ্গলকে ডাকিয়া [illegible]লেন, "বিল্বমঙ্গল! তুমি সত্য সত্য পাগল হইয়াছ, নচেৎ শবকে কাঠ বলিয়া বক্ষে ধারণ করিবে কেন?" বিষধর অজগরকে [illegible] বলিয়া ভুল করিবে কেন? বিল্বমঙ্গল [illegible] আমি পাগল সত্য, কিন্তু [illegible]সের পাগল? তোমার প্রেমে পাগল, তোমাকে ভালবাসিয়া পাগল, তুমি [illegible]নিলে না, আমার ভালবাসা [illegible] অবিশ্বা[illegible] না। আমি জানি না, তুমি দেবী কি রাক্ষসী, তুমি যাই কেন না হও, আমার চক্ষে তুমি অতি সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি সু[illegible]

রাক্ষসী চিন্তামণি এইবার দেবত্ব [illegible] করিল। সে গলবস্ত্র হইয়া বলিল, বিল্বমঙ্গল, তুমি আমাকে অমর করিলে, [illegible] প্রেমে আমি সে অমরত্ব ত্যাগ করিব। তুমি যে প্রেম আমাকে দিয়াছ, আমাকে বঞ্চনা করিয়া এ প্রেম যদি হরিপদে দাও তবে তোমার মুক্তি হইবে।" চিন্তামণি সতী না কলঙ্কিনী? দেবী না রাক্ষসী?

কর্ষিত ক্ষেত্রে পরিপক্ক বীজ রোপিত হইল। চিন্তামণির এই এক কথা হইতে বিল্বমঙ্গলের দিব্য জ্ঞান জন্মিল, দিব্য [illegible] লাভ হইল। সে দিন হইতে চিন্তামণির সহিত বিল্বমঙ্গলের আর কোন সম্বন্ধ রহিল না, এক উদ্যমে বিষম বন্ধন ছিন্ন হইল। তিনি বাড়ী ঘর সব ছাড়িয়া এক হরিনাম সহায় করিয়া পথে পথে ঘুরিতে লাগি[illegible]লেন। কিন্তু যেরূপ লালসায় এত কা[illegible] তিনি মত্ত ছিলেন, চিন্তামণিকে ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দুদিনে তাহা ফুরাইল না। সংসার ছাড়িলেই লোকে সন্ন্যাসী হয় না। যে জীবন্ত অতুল রূপরাশির মধুর মূর্ত্তি নিয়ত হৃদয়ে ধ্যান করিতেন, এক দিনে তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া ফ্যাল[illegible] সেই প্রেম সেই ভালবাসা এক দিনে সমর্পণ করা, ইহা কি মনুষ্য-সাধ্য? সম্ভবপর? সন্ন্যাসী হইলেও বিল্বমঙ্গ[illegible] লালসা এক দিনে নিবিয়া যায় নাই। গভীর অতলস্পর্শ সাগর জলে এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে স[illegible] একটু কাঁপিয়া উ[illegible]

গৃহত্যাগী বৈরাগী এক দিন এক ধনবান বণিক-পত্নীর অসামান্য রূপে চমকিত ও বিচলিত হন। মুগ্ধ হইয়া তিনি বণিক-গৃহে উপস্থিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার স্ত্রীর রূপরাশি দেখিয়া আমার চিত্ত বিকল হইয়াছে। আমি আর একবার তাহাকে দেখিয়া আমার চক্ষু সার্থক করিতে আসিয়াছি।" ধর্ম্মপরায়ণ বণিক কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে, আমি অতিথিকে কখন বিমুখ করি নাই, করিব না; একটু অপেক্ষা করুন, আমি আমার মোহিনীকে এখনই ডাকিয়া আনিতেছি।" গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া সহধর্ম্মিনীকে বলিলেন, "প্রিয়ে! আজ তোমার অগ্নিপরীক্ষার দিন উপস্থিত, হৃদয়ে বল ধারণ কর, স্বামীর ধর্ম্ম পালনের জন্য প্রস্তুত হও, একজন ভিখারী ব্রাহ্মণ তোমার অতুল রূপরাশি দেখিয়া একেবারে মত্ত হইয়া আমার নিকট তোমাকে ভিক্ষা চাহিয়াছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিব।" উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্কীর্ণ সামাজিকতা কি মহাধর্ম্মের রসাস্বাদনে সমর্থ হইবে?

পতিপরায়ণা স্বামিনী বাতাহত কদলীর ন্যায় স্বামীপদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। স্বামী ভিন্ন জগতের আর কিছু যে তিনি জানেন না, অন্য পুরুষের কখনও মুখদর্শন করেন না; বরঞ্চ চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন, তথাপি ব্রাহ্মণের আশ্রয় লইতে পারিবেন না। বণিক অকম্পিত-কণ্ঠে অতি মধুর ভাবে কহিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি ত জান অতিথিসৎকারে আমি কখনও বিমুখ হইতে পারি না; যদি সত্যই আমাকে ভালবাস, আজ স্বামীর ধর্ম্ম-পালনে কদাপি বিমুখ হইও না। তোমার গভীর ভালবাসার আদর্শ দেখাও।" এই বলিয়া বিল্বমঙ্গলকে আনিয়া বলিলেন, "এই আমার স্ত্রী আজি হইতে আপনার দাসী হইলেন, আমি চলিলাম।" কর্ণ অতিথি সেবায় পুত্রকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, বণিক স্ত্রীকে উৎসর্গ করিলেন, উভয়ের মধ্যে কে বড়?

তখন বিল্বমঙ্গল বলিলেন "আমি যে অতুল রূপরাশি দেখিয়া পাগল হইয়া তোমার স্বামীর নিকট তোমাকে ভিক্ষা চাহিয়াছি, এখন সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে কেন? মুখের কাপড় খানি সরাইয়া দাও, আমি বিষম তৃষিত চক্ষুর লালসা পূর্ণ করি।" পলকের জন্য মুখের আবরণ সরাইয়া মোহিনী প্রতিমা সম্মুখে দাঁড়াইল। বিল্বমঙ্গল একবার চাহিয়া বলিলেন "আমার বাসনা তৃপ্ত হইয়াছে। আমার আর এক প্রার্থনা। তোমার কবরী হইতে দুটী লৌহকণ্টক বাহির করিয়া দাও।" সেই দুইটী শলাকা লইয়া বিল্বমঙ্গল আপনার দুটী চক্ষু বিদ্ধ করিয়া জন্মের মত অন্ধ হইলেন এবং বণিকপত্নীকে মাতৃসম্বোধন করিয়া বাহির হইলেন।

আজ লৌহকণ্টকে বিল্বমঙ্গল চক্ষের লালসা প্রাণের বাসনা উৎপাটন করিলেন। এতকাল যে জীবন্ত প্রতিমার চরণতলে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এক দিনে কাল্পনিক হরিপদে সে প্রেম সে ভালবাসা সে উচ্ছ্বাস সে আবেগ বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন কেন? যেমন পরীক্ষা তেমনি পরীক্ষিত, মহাপ্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হইলে যে পশ্চাৎপদ হয়, সে কাপুরুষ। যে যত মহান যত উচ্চ, তাহাকে সেই পরি-

মাণে ভাল বাসিতে না পারিলে, সেই পরিমাণে উন্মত্ত ও ব্যাকুল না হইলে তাহার ভালবাসা পাওয়া যায় না। একজন মনুষ্যকেও যদি আমরা প্রকৃত ভালবাসিতে পারি, তাহার জন্য জীবন তুচ্ছ করিয়া দুরন্ত নদীতে ঝাঁপ দিতে পারি, তবেই ঈশ্বরের জন্য চক্ষু দুইটা উৎপাটন করা সহজ হইয়া আসে। যে জীবন্ত মূর্ত্তিমন্ত্রী প্রতিমাকে ভাল বাসিতে শিখে নাই, সে অদৃষ্ট দেবতার প্রেমে পাগল হইবে, এ কথা সত্য নহে।

বিল্বমঙ্গল চক্ষুহীন হইয়া অতি দীন ভাবে পথে পথে হরিনাম গাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এত দিনে তিনি বুঝিতে পারিলেন, চিন্তামণিকে যে ভালবাসা দিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ভালবাসা ও ব্যাকুলতা না দিলে পরম চিন্তামণিকে পাইবেন না। এই অবধি বিল্বমঙ্গল আর এক উচ্চতর সোপানে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। "হা হরি! কোথা দেখা দাও", এই বলিয়া দিবা নিশি কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মানুষে যাহা পারে, বিল্বমঙ্গল তাহা করিলেন, অবশিষ্ট যাহা রহিল তাহা দৈবকৃপা ভিন্ন ঘটে না।

বিল্বমঙ্গল যখন হরিনাম জপ করিয়া বনে বনে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, দৈবাৎ এক দিন এক রাখাল বালকের সহিত তাহার পরিচয় হয়। সেই দিন হইতে সেই বালকটী তাঁহার সহায় হয়। সে অন্ধ ব্রাহ্মণের হাতটী ধরিয়া অতি যত্নে অতি সাবধানে পথ দেখাইয়া দিত। ক্ষুধা পাইলে আহার যোগাইত, যেখানেই থাকুক না কেন বিল্বমঙ্গল ডাকিলেই সে আসিয়া উপস্থিত হইত। ধর্ম্মের কঠোর পথে কোমলতা কি প্রতি বন্ধক? না সহায়? চিন্তামণিকে ছাড়াইয়া, রূপলালসা বিসর্জ্জন করিয়া বিল্বমঙ্গল এখন এই বালকের প্রেমে এমনি মগ্ন হইলেন যে, এক দণ্ড তাহার কাছ ছাড়া থাকিতে পারিতেন না। অথবা বুঝি কোমলতার চূড়ান্ত না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এক দিন একান্তচিত্তে বিল্বমঙ্গল হরির ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন, তখনও দেখেন সম্মুখে সেই রাখাল বালক। বিল্বমঙ্গলের জ্ঞান চক্ষুও অন্ধ, তাই বুঝিতে পারেন নাই যে,মনোমোহন বালকটী কে? ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "হায় আমার এ কি দশা হইল! সংসার ছাড়িলাম, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিলাম, এমন মহাধন চক্ষু তাহাও বিদ্ধ করিলাম, অবশেষে এই রাখাল বালকের ভালবাসায় জড়িত হইয়া পড়িলাম! এ নরাধমের কি স্থান কোথাও নাই? রাখাল, তুই কি অবশেষে আমার সর্ব্বনাশ করিবি? আমি যে তোকে ভুলিতে পারি না, আর হরিকে কেমন করিয়া পাইব? তোর কথা কাণে গেলে আমার প্রাণ যে শিহরিয়া উঠে।" রাখাল বলিল, ভাই! কে জানে তোর জন্য আমার প্রাণটাও কেমন করে। তুই যে আমাকে বড় ভাল বাসিস, তাই তোর ডাক শুনেই তোর কাছে ছুটে আসি। চল্ বৃন্দাবনে যাই, সেখানে গেলে হরিকে দেখিতে পাইবি।" বিল্বমঙ্গল বলিল "তুই পাগল, আমি যে অন্ধ,হরিকে কেমন করিয়া দেখিব?" রাখাল বলিল "যে ভালবাসে সেই হরিকে দেখিতে পায়।" এই বলিয়া নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে সে বিল্বমঙ্গলের হাত ধরিয়া বৃন্দাবনে চলিল। এক দিন পথে রাখাল বিল্বমঙ্গলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তিনি তাহাকে অধিক

ভালবাসেন, কি হরিকে অধিক ভাল বাসেন। বিল্বমঙ্গল এ কথার একটা স্পষ্ট জবাব দিতে পারেন নাই।

বৃন্দাবনে বিল্বমঙ্গলকে লইয়া রাখাল কত খেলা করিত, কত মিষ্ট কথা মধুর গান শুনাইত। কিছুতেই বিল্বমঙ্গলের তৃপ্তি হইত না। তিনি কেবলই বলিতেন, "কৈ রাখাল, আমাকে হরি দেখাইলে না? কোথা হরি আমাকে দেখা দেও" আর অন্ধ নয়ন হইতে দরদর জলধারা বহিত। অনেক অনুনয়ে রাখাল বলিল "সত্য সত্য কি হরি দেখিবে? তবে এই দেখ" এই বলিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ছদ্মবেশ ছাড়িয়া ভুবনমোহন রূপ ধারণ করিলেন।

হাতে নিয়ে মোহন বাঁশী, অধরে মধুর হাসি
চূড়ার উপর ময়ুর পাখা তাতে রাধার নামটী
লেখা
চরণে চরণ থুয়ে, ললিত ত্রিভঙ্গ হয়ে,
দাঁড়াইল মোহন মূরতী।

তখন বিল্বমঙ্গলের চক্ষু দান হইল, সমস্ত বৃন্দাবন রূপে ঝলমল করিতে লাগিল, বিল্বমঙ্গলের চক্ষু ঝলসিতে লাগিল। হঠাৎ পিছন হইতে রাখাল বালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"কেমন বিল্বমঙ্গল, তোমার হরি দেখা হলো তো? আমি ত বলিতেছিলাম যে, বৃন্দাবনে আসিলে হরিকে দেখা যায়।" বিল্বমঙ্গল বুঝিলেন, বালক কে, তখন তাঁর চরণে পড়িয়া বলিলেন,"হে ভক্তবৎসল! ওই চরণতলে চিরদিন স্থান দিও।"

ওদিকে চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে হারাইয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। রাখাল বালক তাহাকেও সহায়তা করিয়া বৃন্দাবনে লইয়া আসিল, বণিক ও বণিকপত্নী আসিয়াও উপস্থিত হইল। তখন ভক্ত-বৃন্দ মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য যুগল মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। সকলে গাইতে গাইতে অনন্তের পথে চলিয়া গেল।

আজি বৃন্দাবন মাঝে
যুগল রতন রাজে
রতন ভূষণে কেমন সেজেছে মধুর সাজে।
হাতে নিয়া মোহন বাঁশী
অধরে মধুর হাসি
রুনু রুনু ঝুনু ঝুনু চরণে নূপুর বাজে।
সবে আজ হৃদয় ভরি
বলরে হরি হরি
রতন আসনে আজ কেমন সেজেছে;
আজি বৃন্দাবন মাঝে
হরি নামের বীণা বাজে
সবে হরি পদে মজ আজি এমন দিন আর
হবে না যে।

ভক্ত-মালার কয়েকখানি কঙ্কাল লইয়া কবি গিরীশচন্দ্র ফুৎকারে কি অপূর্ব্ব সুন্দর সৃষ্টি করিয়াছেন। বনিয়ানের যাত্রিকের গতি বিল্বমঙ্গল হইতে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

পালরাজগণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভাগলপুরের তাম্রফলকের তারিখ ৯ বৈশাখ ১৭ সম্বৎ।

দিনাজপুর নগরীর প্রায় ২০ ক্রোশ পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে বোদাল নামক একটী স্থান আছে। প্রথমাবস্থায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটী কুটী তথায় বিদ্যমান ছিল। বোদাল পত্নীতলা পুলিষ ষ্টেসন হইতে ৫ ক্রোশ দূরে—পূর্ব্ব উত্তর কোণে অবস্থিত। এই স্থানটী বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার মধ্যবর্ত্তী সীমার নিকটবর্ত্তী। ইহার অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে মঙ্গলবাড়ীর জঙ্গলের নিকট একটী প্রস্তর স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্তম্ভের নিকটে হরগৌরীর একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, এই মন্দির ও স্তম্ভ সমসাময়িক কিনা বলা যায় না। প্রাচীন কালে প্রায় সকল দেবমন্দিরের নিকটেই একএকটী গুরুড় স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। বোধ হয় সেই প্রথমানুসারে এই মন্দিরের দ্বারদেশ সমীপে এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। ইহার শীর্ষদেশে একটী প্রস্তরের গুরুড় মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। শুনা যায় বজ্রপাতে সেই গুরুড় মূর্ত্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছিন্নশীর্ষ তাল তরুর ন্যায় কেবল স্তম্ভটী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। লোকে তাহাকে ভীমের পান্টি (লাটী) বলে। বিগত শতাব্দীর অন্ত ভাগে (১৭৮০ খৃঃ অঃ) সার চার্লস উইলকিন্স সাহেব যৎকাল বোদালের কুঠীর প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, সেই সময় তিনি এই স্তম্ভ গাত্রে খোদিত লিপির মর্ম্মোদ্ধার করিয়া আনয়ন করেন। পরে তাহার ইংরেজি অনুবাদ তিনি এসিয়াটিক রিছার্চ্চের প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২ বৎসর অতীত হইল ওয়েষ্টমেকট্ সাহেব যৎকালে দিনাজপুরের মেজেষ্ট্রেট্ ছিলেন সেই সময় পণ্ডিত হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাহার পাঠোদ্ধার পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠ অনুসারে বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। উইলকিন্স কিম্বা চক্রবর্ত্তী মহাশয় কেহই খোদিত লিপি সম্পূর্ণ ভাবে পাঠ করিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে কতকগুলি অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা নিম্নে এই স্তম্ভ লিপি প্রকাশ করিব। তাহার সারাংশ এই রূপ—

শাণ্ডিল্য গোত্রে বীরদেব নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তদ্বংশে পঞ্চাল জন্মগ্রহণ করেন; তাহার পুত্র গর্গ। ইনি বৃহস্পতির ন্যায় বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। "সাধ্বী, বিমলহৃদয়া, প্রেমময়ী" ইচ্ছাদেবী তাহার পত্নী ছিলেন। ইচ্ছাদেবীর গর্ভে সচিবপ্রবর গর্গের এক নিরুপম পুত্র জন্মে। এই শিশু শ্রীদর্ভপাণি আখ্যা প্রাপ্ত হন। উত্তর কালে এই দর্ভপাণি মহারাজাধিরাজ দেবপাল দেবের মন্ত্রী স্বরূপে এই বাঙ্গালাদেশ শাসন করিয়াছিলেন। তাহার মন্ত্রণাশক্তি প্রভাবে বীরচূড়ামণি দেবপাল পার্ব্বতীর পিতার (হিমালয়ের) পাদমূল হইতে, রেবার উৎপত্তি স্থান (মহেন্দ্র পর্ব্বত) পর্য্যন্ত—

উদয়সাগর হইতে অস্তসাগর (পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের) মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ জয় করিয়া কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সচিবকুলতিলক শ্রীদর্ভপাণি শ্রীমতী শর্করা দেবীকে বিবাহ করেন। দর্ভপাণির ঔরসে ও শর্করা দেবীর গর্ভে সোম সদৃশ সোমেশ্বর জন্ম গ্রহণ করেন। শিবের পার্ব্বতীর ন্যায়, বিষ্ণুর লক্ষ্মীর ন্যায় তরলাদেবী সোমেশ্বরের প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনী ছিলেন। গুণে কুমার সদৃশ ভট্টকেদার নাথ মিশ্র সোমেশ্বর ও তরলার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহারাজাধিরাজ স্থরপালের মন্ত্রী ছিলেন। (অন্যান্য তাম্রশাসনে স্থরপাল বিগ্রহপাল নামে পরিচিত) তাঁহার মন্ত্রণাশক্তি প্রভাবে গৌড়েশ্বর উগ্রমুক্তি হূণদিগকে শান্ত করিয়া, উৎকলজাতিকে আকুল করিয়া, গুর্জ্জর ও দ্রাবিড় দেশীয় রাজাগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া এই বসুন্ধরা উপভোগ করিয়াছিলেন। সচিবশ্রেষ্ঠ কেদার নাথ দেবগ্রামের বব্বাদেবীর পাণি-গ্রহণ করেন। দৈবকীর পুত্র কৃষ্ণের ন্যায় বব্বাদেবী ভট্ট গুরব মিশ্রকে প্রসব করিয়াছিলেন। গুরব মিশ্র দ্বিতীয় রামের ন্যায় ছিলেন। কিন্তু সেই জমদগ্নবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ক্ষত্রিয় বিদ্বেষ্টা ছিলেন না। (অর্থাৎ তিনি ক্ষত্রিয় নরপতির মন্ত্রী ছিলেন, স্থতরাং তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিতেন।) ভুবনবিজয়ী নারায়ন পাল দেব বিজয় কার্য্য সমাধা করিয়া যাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার মহত্ব ও ক্ষমতার অন্য কি প্রমাণের আবশ্যক করে? গুরব মিশ্র বেদজ্ঞ, ধার্ম্মিক, বিদ্বান ও ধনবান ছিলেন। তিনি বক্তবাদীর প্রিয় পাত্র ছিলেন।

এই প্রস্তর লিপির দ্বারা প্রাচীন মন্ত্রী বংশের নিম্ন লিখিত রূপ বংশাবলী সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

শাণ্ডিল্য গোত্র।

শ্রীবীর দেব
|
পঞ্চালদেব
|
গর্গ স্ত্রী ইচ্ছাদেবী
|
শ্রীদর্ভপাণি স্ত্রী শর্করা দেবী
(দেবপাল দেবের মন্ত্রী।)
|
সোমেশ্বর মিশ্র স্ত্রী তরলা দেবী
|
কেদারনাথ মিশ্র স্ত্রী বব্বাদেবী
(স্থরপাল দেবের মন্ত্রী)
|
গুরব মিশ্র (নারায়ন পাল দেবের মন্ত্রী)।

সচিবপ্রবর গুরব মিশ্রের জনৈক আত্মীয়ের দ্বারা এই প্রস্তর ফলক লিখিত হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ভাগলপুরের তাম্রফলক এবং এই স্তম্ভলিপি উভয়েই এক সময়ের হইতেছে। তাম্রফলক খানা মহারাজাধিরাজ নারায়ন পাল দেবের শাসন পত্র। এবং প্রস্তর-স্তম্ভ লিপি সেই নারায়ন পাল দেবের মন্ত্রী ভট্ট গুরব মিশ্রের অনুমত্যানুসারে লিখিত হইয়াছিল। তাম্রশাসন গুলির মর্ম্মালোচনা দ্বারা অনুমিত হয়, ভারতবিজয়ী মহারাজাধিরাজ দেবপালের পর তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র বিগ্রহপাল দেব গৌড়ের রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীবংশের অনুমোদিত প্রস্তর লিপি পাঠে আমরা মহারাজাধিরাজ দেবপাল ও নারায়ণপালের মধ্যে স্থরপালের নামোল্লেখ দেখিতেছি। এস্থলে স্থরপাল বিগ্রহপালের নামান্তর ব্যতীত অন্য কিছুই অনুমান করা

যাইতে পারে না। বিশেষতঃ এইরূপ এক নরপতি ভিন্ন ভিন্ন শাসনপত্রে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত থাকার প্রমাণ প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

এই প্রস্তর লিপির ২৩শ হইতে ২৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্লোকগুলির মর্ম্ম ভাল রূপে অনুভব করা যাইতে পারে না। এজন্য আমরা তৎসম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে বিরত হইলাম।

দিনাজপুরের অন্তঃপাতী আমগাছি গ্রামে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এক খানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। বিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব লিখিয়াছেন, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমগাছি গ্রামে জনৈক কৃষক বৎকালে মাটী কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিতেছিল, সেই সময় ভূগর্ভ হইতে এই তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। যে স্থানে এই তাম্র শাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই স্থানটী বোদাল গরুড়স্তম্ভ হইতে ৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এই তাম্রশাসনের দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চ ও প্রস্থ ১৩ ইঞ্চ। কোলব্রুক সাহেব এই তাম্রশাসন খানা ভাল করিয়া পাঠ করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, আমি যতদূর ইহার মর্ম্ম অনুভব করিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহাই অনুভব হয় যে, এই বংশের প্রথম রাজা লোকপাল, তৎপরে ধর্ম্মপাল, ইহার পরবর্ত্তী নাম পাঠ করা যায় না। ইহার পরে জয়পাল তৎপর দেবপাল তদনন্তর ২।৩টি নাম পাঠ করা যাইতে পারে না; কিন্তু ইহার একটী নারায়ণ পাল হইবে। তৎপর রাজপাল, পালদেব, মহিপাল দেব, ন্যায়পাল এবং বিগ্রহ পাল ইত্যাদি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার হরণ্লি সাহেব এই তাম্র শাসনের পুনর্ব্বার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। যদিও কোন কোন শ্লোকের কোন কোন অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া তিনি পাঠ করিতে পারেন নাই, তথাপি কোলব্রুক সাহেবের ভ্রম তিনি অনেকটা সংশোধন করিয়াছেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। তাম্রশাসনের ৪র্থ পংক্তির "শ্রীনান লোকনাথ জয়তি" পদ পাঠ করিতে না পারিয়া কোলব্রুক সাহেব বংশের স্থাপয়িতাকে লোকপাল নামে পরিচিত করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে অন্যান্য তাম্র শাসন ও প্রস্তর লিপির ন্যায় আমগাছির তাম্রশাসনেও গোপালদেবকে বংশের স্থাপয়িতা বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

তাম্র শাসনের ষষ্ঠ পংক্তির মধ্যভাগে আমরা ধর্ম্মপাল নৃপতির নাম উল্লেখ দেখিতে পাই। ৭ম পংক্তির প্রারম্ভে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাকপালের নাম উল্লেখ রহিয়াছে। ৮ম পংক্তিতে বাকপালের দুই পুত্র দেবপাল ও জয়পালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, এই শাসন পত্রেও ভ্রম ক্রমে ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালকে বাকপালের পুত্র বলিয়া লেখা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেবপাল দেব মুঙ্গরের শাসন পত্রে আপনার পিতামাতার যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাই সত্য। তদ্বিরুদ্ধে পরবর্ত্তী লেখকদের লিখিত বাক্য কখনই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। যাহা হউক, দেবপালের পর তাহার ভ্রাতষ্পুত্র মহারাজ বিগ্রহ পাল দেব সিংহাসন আরোহণ করে, তাঁহার নাম নবম পংক্তির প্রথম ভাগে দেখিতে পাওয়া যায়। দশম পংক্তির মধ্যমভাগে মহারাজাধিরাজ নারায়ণ পালের উল্লেখ রহিয়াছে। শাসন পত্রে "নারায়ণঃ

সঃ প্রভুঃ" এইরূপ পাঠ করিয়া হরেন্লি সাহেব নারায়ণ পালকে "নারায়ণ প্রভু" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যাহা হউক, সাহেবদিগের এরূপ ভ্রম স্বভাবসিদ্ধ। ইহাকে ততটুকু মারাত্মক বিবেচনা করি না। কিন্তু ইহার পরে তিনি একটী ভয়ানক কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন। তদনন্তর যে সকল নরপতির নাম উল্লেখ হইয়াছে, সেই সকল নামকে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের নামান্তর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি,কোন হিন্দুসন্তান এই শাসন-পত্র পাঠ করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না।

এক নরপতির দুই নাম হইতে পারে, আমরা স্বীকার করি, কিন্তু একব্যক্তির দুইটা মাতামহ বা দুইটা পিতামহ হইতে পারে না। এই জন্যে বলিতেছিলাম যে, সাহেবের এইরূপ ভ্রম হওয়া সহজে হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুসন্তানের এইরূপ ভ্রম কথনই হইবে না। যাহা হউক, নারায়ণ পাল দেবের পর আমরা শাসন পত্রের একাদশ পংক্তির শেষ ভাগে রাজ্যপাল দেবের উল্লেখ দেখিতেছি। এই রাজ্যপাল দেবকে আমগাছির শাসন পত্রে স্পষ্টাক্ষরে নারায়ণ পালের পুত্র লেখা হইয়াছে। কিন্তু হরেন্লি সাহেব মুঙ্গেরের শাসন পত্রে লিখিত দেবপাল দেবের পুত্র, যুবরাজ রাজ্যপালের সহিত অভিন্ন অবধারণ করিয়াছেন। দুই পিতার এক পুত্র ইহা কেবল সাহেবেরাই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। হিন্দুসন্তানগণ ইহা পাঠ করিয়া অবশ্য হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। যাহা হউক, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পংক্তিতে রাজ্যপালের পুত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহার নামটী পাঠ করা যাইতে পারে না। কেবল শ্রীমান শব্দটী মাত্র পাঠ করা যায়। ইনি রাষ্ট্রকুটা রাজবংশের দৌহিত্র। তাঁহার মাতার নাম ভাগ্যদেবী। তৎপরে চতুর্দ্দশ পংক্তিতে আমরা সেই রাজার পুত্র বিগ্রহ-পাল দেবের নাম উল্লেখ দেখিতেছি। বিগ্রহ-পাল দেবের পুত্র মহীপাল দেব; শাসন পত্রের ষোড়শ পংক্তির মধ্যভাগে তাঁহার নাম উল্লেখ আছে। এই মহীপালের পুত্রের নাম ন্যায়পাল। সপ্তদশ পংক্তির মধ্যভাগে তাঁহার নাম খোদিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপাল দেবের নাম অঙ্কিত হইয়াছে। তিনি এই শাসন পত্রের কর্ত্তা। ইহা তাঁহারই দানপত্র। তাঁহার পরিচয় এইরূপ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। "পরমেশ্বর — সেবাসমবাতাশেষ জম্বুদ্বীপ ভূপালানন্ত পাদাৎ ভরণম দবণেঃ (শ্রীমুদগ-গিরি)সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারত পরম-সৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীন্যায়পাল দেব পরমাধ্যাত পরমেশ্বর (পরমভট্টারক মহা-রাজাধিরাজ শ্রীমান বিগ্রহপাল দেব কুশলি।"

মুঙ্গেরের শাসন পত্রে কেবল তিনজন-পাল রাজার নাম উল্লেখ আছে। ভাগল-পুরের তাম্রশাসনে পাঁচজন নরপতির নাম পাওয়া যায়। আমগাছির তাম্রশাসনে আমরা একাদশ জন নরপতির নাম প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা দেখাইব যে, মহারাজ মহীপাল দেব হইতে বাঙ্গালার পালবংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল। কিন্তু আম-গাছির তাম্রশাসনে আমরা মহীপালের পর ন্যায়পাল ও বিগ্রহপাল নরপতিদ্বয়কে বঙ্গ-দেশের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে

পাই। সুতরাং শেষ পাল নরেশ্বর মহী-পালকে ন্যায় পালের পুত্র বিগ্রহ পালের পরবর্ত্তী রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

নালন্দার একটী বিখ্যাত প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দীরের দ্বারদেশে এইরূপ লিখিত আছে।

শ্রীমন্মহীপাল দে
ব রাজ্যে সম্বত
অগ্নি রাঘ (রাধ) স্বার
ততদেয় ধর্ম্মোয়ং প্রবর
মহাযান যায়িন পর
মোপাসক শ্রীমত্তৈলাঢ়
কীয়জ্ঞীধীপকৌশাম্বী
বিনির্গতস্য হরদত্তনপ্তু
গুরু দত্ত সুতশ্রীবাল্য
দিত্যস্য যদত্র পুণ্যং তৎ
ভবতু সর্ব্ব সত্ব রাশেরনুত্তর
জ্ঞানাবাপ্তয় ইতি॥

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। (১৩শ)

(দ্বিতীয় বিবাহ।)

বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর গৌরচন্দ্র পুনরায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে তাঁহার টোল হইত; বঙ্গদেশে অনুপস্থিতি সময়ে টোলের কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ প্রচার হইবা মাত্র পাঠার্থীগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। আবার বিদ্যা চর্চ্চায় সঞ্জয়ের বাড়ী শর গরম হইয়া উঠিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, পত্নী বিয়োগের শোকের তীব্রতা ততই হ্রস্ব হইতে চলিল, শাণিত ক্ষুর ধারে মর্চ্যা পড়িয়া গেল; অবশেষে হৃদয়ের অন্তরন্তলে শোকের এক কাল আবরণ পড়িয়া রহিল; স্মৃতিপথের সুন্দর আকাশে একটী বিষাদের রেখা মাত্র থাকিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে নিমাই পণ্ডিত গভীর অধ্যয়নও অধ্যাপনায় নিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। কথিত আছে, এই সময়ে তিনি তাঁহার পড়ুয়াদিগের মধ্যে সন্ধ্যা বন্দনাদি ও কপালে তিলক ধারণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের করণীয় অনুষ্ঠান না দেখিলে অথবা দুর্নীতি-পরায়ণতা লক্ষ্য করিলে, নানা পরিহাস ও উপদেশ চ্ছলে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেন। তাঁহার জীবনের এই এক বিশেষ ভাব দেখা যায় যে, শেষ জীবনে বেদ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাগ বত্মে ধর্ম্ম সাধন করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ইত্যাদি মত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনধিকারী ব্যক্তিদিগকে কখন বেদ-বিহিত আশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম শূন্য হইতে উপদেশ দিতেন না। বরং তাহাদিগের বিশ্বাসানুসারেই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালন জন্য উপদেশ প্রদান করিতেন। যেখানে বুঝিতে পারিতেন যে, প্রচলিত মত পরিত্যাগ করিয়া উপদিষ্ট ব্যক্তি উচ্চতর ও পবিত্রতর সাধনাঙ্গে উঠিতে পারিবে না, সেখানে তাহার বিশ্বা-

সের উপর আঘাৎ করিয়া তাহাকে নাস্তিকতার সন্দেহ-দোলায় নিক্ষেপ করা তাঁহারে মতে অতীব দূষণীয় ছিল। এ সম্বন্ধে এক্ষণকার প্রকার প্রণালী অপেক্ষা তাঁহার পথ অতি পরিষ্কার ও সমুন্নত বলিয়া বোধ হয়। উপদিষ্টের বর্ত্তমান্ বিশ্বাসের ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে এমন কৌশলে তাহাকে উপরের সিঁড়িতে লইয়া যাইতেন যে, অবশেষে তাহাব বুঝা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত যে, কেমন করিয়া তাহার জীবনে এত সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিল।

প্রাণের প্রিয়তম ভার্য্যার পরলোক গমনেই হউক বা দুরতিক্রমনীয় স্বভাবের আবেগ সম্বরণ না করিতে পারার জন্যই হউক, এ বয়সেও গৌরচন্দ্রের বাল্যচপলতা আবার দেখা দিতে লাগিল; একটু একটু করিয়া দুষ্ট স্বরস্বতী স্কন্ধে ভর করিতে লাগিল। প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাপন করত টোলে যাইতেন, মধ্যাহ্নে গৃহে আসিয়া মধ্যাহ্ন ক্রিয়াকলাপ সমাপনান্তে বিশ্রাম না করিয়াই আবার বিদ্যালয়ে যাইতেন, এবং নিশীথ রাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। ইহার মধ্যে স্বায়ন্থে কেবল একবার সশিষ্যে গঙ্গাতীরে ও নগরীর পথে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইতেন। এই সময়ে নানারূপ হাস্য পরিহাসে সময় অতিবাহিত হইত। এমন লোক ছিল না যে, তাঁহার বিদ্রূপ-বাণে বিদ্ধ না হইত। কেবল স্ত্রী জাতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সমাদর ছিল। পথে ঘাটে তাঁহাদিগকে দেখিলেই সসম্ভ্রমে সরিয়া যাইতেন।

"এতেক ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে;
হেন নাহি যারে না চালেন নানারূপে,
সবে পর স্ত্রী প্রতি নাহি পরিহাস;
স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ।"

চৈঃ ভাঃ

পূর্ব্ব-বাঙ্গলা হইতে গৌরচন্দ্র বাঙ্গালের কথা শিখিয়া আসিয়াছিলেন। নবদ্বীপে বাঙ্গালের অভাব ছিল না; সুতরাং পথে ঘাটে বাঙ্গাল দেখিলে আর রক্ষা থাকিত না। বাঙ্গালের কথা ও স্বর অনুকরণ করিয়া বিবিধ ভঙ্গী সহকারে বিদ্রূপ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। কোন কোন দিন শ্রীহট্টবাসীদিগের সহিত ভয়ানক ঝগড়া কোন্দল বাঁধিয়া যাইত। ইহার একটী চিত্র দেখুন।"

'বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া।
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বলে 'অয়ঃ অয়ঃ;
তুমি কোন্ দেশী তাহা—কহত নিশ্চয়।
পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার;
বল দেখি শ্রীহট্টে জন্ম না হয় কাহার?
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়;
তবে ঢোল কর কারে? অন্যে দুঃখ পায়।
যত তত বলে প্রভু প্রবোধ না মানে;
নানা মতে কদর্থেন সে দেশী বচনে।
তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ার ঠাকুর;
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর।
মহা ক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া;
লাগালি না পায় যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।
কেহ বা ধরিয়া কোঁচা শিকদার স্থানে;
লঞা যায় মহা ক্রোধ হইয়া দেয়ানে।
তবে শেষে আসিয়া প্রভুর শিষ্যগণে;
সমঞ্জস করিয়া চলেন সেইক্ষণে।
কোন দিন থাকি কোন বাঙ্গালের আড়ে;
আওয়াস ভাঙ্গিয়া তার পলায়েন রড়ে।"

চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৩ অধ্যায়।

অনেক দিন হইতে শচী-মাতা পুত্রের দার পরিগ্রহের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। এক্ষণে তনয়ের দিন দিন চঞ্চলতা বৃদ্ধি দেখিয়া ঐ চিন্তা তাঁহার মনে আরও বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন যে, নব বধূর মুখ দেখিলে নিমাই হয় ত চাপল্য পরিহার পূর্ব্বক সুখী হইতে পারিবে। কিন্তু নবদ্বীপে পুত্রের উপযুক্ত কন্যা দেখিতে না পাইয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ; এমন সময় মনে হইল যে, "সনাতন রাজপণ্ডিতের একটী সর্ব্ব গুণ-যুক্ত মেয়ে আছে ; মেয়েটীকে তিনি বাল্যকালে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতে দেখিতেন। কন্যাটী যেমন সুশ্রী তেমনি নম্র ও মধুর প্রকৃতি নাম ; বিষ্ণুপ্রিয়া ; সেই মেয়েটীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটনা হইলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়।" সনাতন পণ্ডিত নবদ্বীপের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত বিষয়ী ব্যক্তি ; অতি সচ্চরিত্র, উদার ও সরল স্বভাব এবং সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ। তাঁহার বিষ্ণুভক্তি ও আতিথেয়তা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তাঁহার পদবী রাজপণ্ডিত। কি কারণে ঐ পদবী পান তাহা জানা যায় না ; তবে তিনি যে একজন গণ্য মান্য ও ধন সম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্য-ভাগবতে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

"সেই নবদ্বীপে বৈশে মহাভাগ্যবান্ ;
দয়াশীল স্বভাব শ্রীসনাতন নাম।
অকৈতব পরম উদার বিষ্ণুভক্ত ;
অতিথি সেবন উপকারে অনুরক্ত।
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহাবংশজাত ;
পদবী রাজপণ্ডিত সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
ব্যবহারে তিনি ভাগাবন্ত এক জন ;
অনায়াসে অনেকের করেন পালন।
তার কন্যা আছেন পরম সুচরিতা ;
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীপ্রায় সেই জগন্মাতা।
শচী দেবী তাঁরে দেখিলেন যেইক্ষণে ;
সেই কন্যা পুত্র যোগ্য বুঝিলেন মনে।"

শচী দেবী পূর্ব্বোক্তরূপে চিন্তা করত কাশীনাথ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনিলেন ও তাহার প্রমুখাৎ সনাতন পণ্ডিতের নিকট আপন প্রস্তাব বলিয়া পাঠাইলেন। মিশ্র মহাশয় পণ্ডিতজীর সভায় গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলে, রাজপণ্ডিত আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করতঃ বিশ্বম্ভরকে কন্যা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কাশীনাথ এই শুভ সম্বাদ শচীকে অবগত করিলে, তিনি আত্মীয় স্বজন লইয়া মহা আনন্দের সহিত বিবাহের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। শিষ্যদিগের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত খান্ নামে একজন ধনী ছিলেন ; তিনি বিশ্বম্ভরের পরম হিতকারী বন্ধু ও হিতৈষী ছিলেন। তিনি এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন যে, ইহার সমস্ত ব্যয়ভার তিনি একা নির্ব্বাহ করিবেন ; আর এ বিবাহ সামান্য বামুনে রকমে দেওয়া হইবে না ; রাজপুত্রের পরিণয়ের ন্যায় ঘটা করিতে হইবে। মুকুন্দ সঞ্জয়ও এই প্রস্তাব আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করিলেন। অধ্যাপকের বিবাহবার্ত্তা শ্রবণে সকল শিষ্যেরাই মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। ফলে গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় বিবাহ প্রথম বিবাহ হইতে যে শতগুণে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই :—

"প্রভুর বিবাহ শুনি সর্ব্বশিষ্যগণ ;
সবেই হইলা অতি পরমানন্দ মন
প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত মহাশয় ;
মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয়।
মুকুন্দ সঞ্জয় বলে শুন সখা ভাই ;
তোমার সকল ভার মোর কিছু নাই।
বুদ্ধিমন্ত খান বলে শুন সর্ব্ব ভাই ;
বামনীয়া মত কিছু এ বিবাহে নাই।
এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন ;
রাজ কুমারের মত লোকে দেখিবেন।"

এ দিকে কন্যাপক্ষেও সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজনাদি হইতে লাগিল। সনাতন পণ্ডিত এক জন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন ; সুতরাং তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ যে রাজকীয় সমারোহে সম্পন্ন হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? এইরূপে সমস্ত আয়োজনাদি সমাধা হইলে বিবাহ সম্বন্ধ এক দিন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যায় যায় হইয়া উঠিল। পূর্ব্বাহ্নিক আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে রাজপণ্ডিত গণক ডাকাইয়া বিবাহের শুভ লগ্ন স্থির করিবার জন্য আদেশ দিলেন। গণক কহিল যে, পথে আসিতে আসিতে বিশ্বম্ভরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; তাঁহাকে বিবাহের কথা বলিলে তিনি কাহার বিবাহ, কি বৃত্তান্ত বলিয়া আমার কথা উড়াইয়া দিলেন। ইহাতে আপনার যে অভিরুচি হয় করুন্."

"গণক আনিয়া কৈল বচন বিনয় ;
বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহ দিব করহ সময়।
শুনিয়া গণক কহে শুনহ পণ্ডিত ;
আসিতে দেখি সে বিশ্বম্ভর আচম্বিত।
তাঁ'রে দেখি' আনন্দিত হৈল মোর মন ;
কৌতুকে তাঁহারে আসি' বলিল বচন।
কালি শুভ অধিবাস হইবে তোমার ;
বিবাহ সংপ্রতি শুন বচন আমার।
এ বোল শুনিয়া প্রভু কহিল উত্তর ;
কার কোথা বিবাহ কহ কেবা কন্যা বর ?
আমার সাক্ষাতে কথা কহিল এমন ;
বুঝিয়া কার্য্যের গতি কর নিরূপণ।"

চৈঃ মঃ আদিঃ

গণকের মুখে এই কথা শুনিয়া সনাতন পণ্ডিত দুঃখে, অভিমানে ও ক্রোধে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ; এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, যখন গৌরাঙ্গ তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য বড় একটা উৎসুক নহেন, তখন তিনি যাচিয়া কন্যা দান করিবেন না।

"সনাতন পণ্ডিত সে চরিত্র উদার ;
বন্ধুবর্গ লঞা করে অনুমান সার।
নানা দ্রব্য কৈল আসি' নানা অলঙ্কার ;
কাহারে বা দিব দোষ ? করম আমার।
আমি কোন অপরাধ কিছু নাহি করি' ;
কি কারণে আদর না কৈলে গৌরহরি।"

চৈঃ মঃ

লোচনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন যে, বিশ্বম্ভরকে সনাতনের ঈশ্বর জ্ঞান ছিল ; সে জন্য যখন তিনি শুনিলেন যে, বিশ্বম্ভর তাঁহার কন্যার পাণি গ্রহণে তাদৃশ সমুৎসুক নহেন, তখন তাঁহার দুঃখের পরিসীমা থাকিল না। তিনি দিবা রাত্রি "গৌরাঙ্গ ধন হইতে বঞ্চিত হইলাম" বলিয়া ব্যাকুল অন্তরে ক্রন্দন ও বিশ্বম্ভরকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই চিত্রটী অতিরঞ্জিত। কারণ তখন পর্য্যন্ত গৌরাঙ্গ-জীবনে এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যে তাহাতে তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞান হইতে পারে। বিশেষত এ বিবাহের প্রস্তাব কিছু কন্যাপক্ষ

হইতে উঠে নাই। গৌরাঙ্গের পরবর্ত্তী আচরণও এইরূপ সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে লোচন দাস একজন গৌর ভক্ত; চৈতন্যাবতারে তাঁহার অটল বিশ্বাস। চৈতন্যচরিতে তাঁহার গাঢ় প্রেমভাব। সেই ভাবাবেগের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থের প্রতি কথায় প্রতি বর্ণনায় পাওয়া যায়। এ অবস্থায় তদীয় মনের উচ্ছ্বাসিত ভাবের ঢেউ সনাতন পণ্ডিতের কার্য্যে ও কথায় যাইয়া লাগা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

গণকের বাক্যে এতদূর হইয়া উঠিয়াছে জানিতে পারিয়া বিশ্বম্ভর অতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন; এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এক প্রিয় ও বিশ্বাসী বয়স্যকে নিভৃতে ডাকিয়া সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন এবং নিম্নে এই প্রকার উপদেশ দিয়া তাঁহার ভাবী শ্বশুরের নিকট পাঠাইলেন:—

"প্রিয় এক ছিল বয়স্যের মাঝে;
নিভৃতে কহিল কথা যত মনে আছে।
কোন কথা ছলে যাও পণ্ডিতের ঘর;
আমি নাহি জানি হেন কহিও উত্তর।
কৌতুক রহস্যে আমি গণকে কহিল;
না বুঝিয়া কার্য্যে কেন অবহেলা কৈল।
কার্য্যে অবহেলা তাহে নাহিক অধিক;
তাঁ সবার চিত্তে দুঃখ এ নহে উচিত।
যারে যে কহিল তাহে কি আছয়ে কথা?
তাঁহার উপরে আর কে'করে অন্যথা?"

চৈঃ মঃ

গৌরাঙ্গের বয়স্যের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজ পণ্ডিতের সকল সন্দেহ দূর হইল। তখন তিনি মহানন্দে ও উৎসাহে বিবাহের শুভ দিন ধার্য্য করিলেন। বর কন্যা উভয়ের বাটীতেই মহা ধুম পড়িয়া গেল। প্রথমে অধিবাস। অধিবাস-দিনে বাটীতে বড় চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইল; চারি দিকে কদলীবৃক্ষ রোপণ, পূর্ণঘট স্থাপন ও আম্র শাখার বেষ্টন করা হইল। মেয়েরা আঙ্গিনাতে আলিপনা দিয়া অনুরঞ্জিত করিলেন এবং মঙ্গল কোলাহলে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। প্রাতঃকালে যত ব্রাহ্মণ সজ্জন বৈষ্ণব প্রভৃতিকে অধিবাসের পান গুপারী লওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইল।

অপরাহ্ণ অধিবাসের নিয়মিত সময়। একে একে নিমন্ত্রিতগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল; নানা প্রকার বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল; ভাটগণ রায়বার গাইতে লাগিল ও পুরস্ত্রীরা মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। সভার মধ্যস্থলে গৌরচন্দ্র সমাসীন হইলে পান গুপারি বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হইল। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণের অন্ত নাই; সুতরাং কত লোক আসিতে ও যাইতে লাগিল, তাহার সংখ্যা হইল না। বিতরণপদ্ধতিও মন্দ নয়; প্রত্যেকের কপালে চন্দন ও মস্তকে পুষ্পমালা অর্পণ করিয়া এক এক বাঁটা পান দেওয়া হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ জাতি চিরকালই লোভী; অনেকে একবার লইয়া বেশ বদলাইয়া প্রতারণাপূর্ব্বক বহুবার লইতে লাগিল। উদারস্বভাব গৌরচন্দ্র এই উৎপাত লক্ষ্য করিয়া তাহা নিবারণের একটী চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করত বন্ধুগণকে বলিয়া দিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিন জনের পরিমাণ দেওয়া হউক। এই উপায় অবলম্বন করাতে শঠতা প্রতারণা তো তিরোহিত হইল; বরং সকলে এক বাক্যে জয় জয়-

ধ্বনি করিয়া গৌরের প্রভূত গুণ কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

"এই মত মালা, চন্দন, গুবাক, পান,
হইল অনন্ত মর্ম্ম কেহ নাহি জান।
মনুষ্য পাইল কত সে থাকুক দূরে,
ভূমিতে পড়িল কত দিতে মনুষ্যেরে।
সেই যদি প্রাকৃত লোকের ঘরে হয়;
তাহাতেই ভাল পাঁচ বিবাহ নির্ব্বা হয়।
সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস;
সবে বলে ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস।
লক্ষেশ্বর দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে;
হেন অধিবাস নাহি করে কার বাপে।"

চৈঃ ভাঃ।

তৎপরে রাজপণ্ডিত আত্মীয় ও বিপ্রবর্গে পরিবৃত হওত নৃত্যগীত ও অধিবাস-সামগ্রী সঙ্গে লইয়া সভাস্থলে উপনীত হইলেন ও বেদ-মন্ত্র পাঠ করিয়া গৌরের অঙ্গে গন্ধ স্পর্শ করাইয়া শুভ আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিশ্বম্ভরের আত্মীয়গণও এইরূপে কন্যার আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলে সেদিনকার উৎসব শেষ হইল।

অধিবাসের রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই স্ত্রীগণ নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে জল সহিয়া আসিলেন। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বিশ্বম্ভর গঙ্গাস্নান ও বিষ্ণুপূজা আত্মীয়গণে পরিবৃত হইয়া সমাপন করিয়া নান্দীমুখ কর্ম্মাদি করিতে বসিলেন। এ দিকে গঙ্গাপূজা, ষষ্ঠীপূজা নারীদিগকে তৈল হরিদ্রাদি বিতরণ প্রভৃতি স্ত্রী-আচার সকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অপরাহ্নে ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়দিগকে সামাজিক মান ও অবস্থানুসারে ভোজ্য বস্ত্র প্রভৃতি দান করা হইল। বেলা অবসন্ন হইলে বিবাহ যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল ও বরের বেশ-বিন্যাস হইতে লাগিল।

"অপরাহ্ন বেলা আজি হইল লাগিতে;
প্রভুর সবাই বেশ লাগিলা করিতে।
চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রী অঙ্গ;
মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্র দিলেন তথি গন্ধ।
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন;
তথি মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন।
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির উপর;
সুগন্ধি মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর।
দিব্য সূক্ষ্ম পীত বস্ত্র ত্রিকচ্ছ বিধানে;
পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে।
ধান্য দুর্ব্বা সূত্র করে করিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন স্বর্ণ মুঞ্জরী দর্পণ।
সুবর্ণ কুণ্ডল দুই শ্রুতি মূলে সাজে:
নবরত্ন হার বান্ধিলেন বাহু মাঝে।"

চৈঃ ভাঃ।

এক প্রহর বেলা থাকিতে বিবাহযাত্রা বাহির হইল। জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া ও উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগের পদধূলি লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বিচিত্র দোলায় চড়িয়া বিবাহ বিজয় করিলেন। এক প্রহরকাল নগরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া গোধূলি সময় কন্যালয়ে উপস্থিত হইবেন, এই পরামর্শ হইল। প্রথমে ভাগীরথী তীরে যাইয়া গঙ্গাদর্শন ও প্রণামান্তে নগরের পথে পথে বিবাহ যাত্রা মহা ধুমধামে বেড়াইতে লাগিল। সাজ সজ্জা ও বাদ্য ভাণ্ডের বর্ণনা বৃন্দাবন দাস এইরূপে করিয়াছেনঃ—

"তবে দিব্য দোলা সাজি বুদ্ধিমন্ত খান;
হরিষে আনিয়া করিলেন বিদ্যমান।
বাদ্য গীত উঠিল পরম কোলাহল;
বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি সুমঙ্গল।

ভাটগণে লাগিলা পড়িতে রায় বার;
সর্ব্ব দিকে হইল আনন্দ অবতার।"
চৈঃ ভাঃ

বিবাহ যাত্রার ক্রম বর্ণনা দেখুনঃ—

"আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্ত খাঁর;
চলিলা দোসারি হই যত পাটোয়ার।
নানাবর্ণে পতাকা চলিলা তার পাছে;
বিদূষক সকল চলিলা নানা কাছে।
নর্ত্তক বালা জানি কতেক সম্প্রদায়;
পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায়।
জয়ঢাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ, কাহাল,
দামামা দগড় শঙ্খ বংশীকরতাল।
বরগোসিঙ্গা পঞ্চশব্দী বেণু বাজে কত;
কি লিখিব বাদ্য ভাণ্ড বাজি যায় যত।
সহস্রেক শিশু বাদ্য ভাণ্ডের ভিতরে;
রঙ্গে নাচি যায় দেখি হাসেন ঈশ্বরে।

বিবাহের চমৎকারিত্বের বর্ণনাঃ—

"দেখি অতি অমানুষী বিবাহ সম্ভার;
সর্ব্ব লোক চিত্তে মহা পায় চমৎকার।
বড় বড় বিভা—দেখিয়াছি লোকে বলে;
এমন সংঘট নাহি দেখি কোন কালে।
এইমত স্ত্রী পুরুষে প্রভুরে দেখিয়া;
আনন্দে ভাসয়ে সব সুকৃতি নদীয়া।
যার ঘরে রূপবতী কন্যা আছে ভাল;
সেই সবে বিমরিষ রহে সর্ব্বকাল।
হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাম দিতে;
আপনার ভাগ্যে নাহি হইবে কেমতে?
চৈঃ ভাঃ

এই সব বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও অমূলক নহে। তবে কথা হইতেছে যে দুই বৎসর পরে এমন সাধের পরিণীতা ভার্য্যাকে যিনি পরিত্যাগ করিয়া কাঙ্গালের বেশে পথে পথে হরিনাম বিলাইয়া বেড়াইবেন, তার পক্ষে কি এমন ঘটা করে বিবাহ করা সাজে? সাজে বৈকি? নইলে মানুষের ক্ষুদ্রতা ও অদূরদর্শিতা থাকে কোথায়? গৌরচন্দ্র অসাধারণ মানুষ হইলেও মানুষ; ভগবৎ-প্রেরিত হইলেও মানবীয় দুর্ব্বলতার অধীন; তাই এই অপরিণামদর্শিতা। প্রিয় পাঠক! ইহাকে লোক শিক্ষার্থ অমানুষী লীলা বলিতে চাও বল; কিন্তু তাহাতে মানবত্ব ডুবে না। ভগবত্বে মানবত্ব অসম্ভব; মানবত্বে ভগবত্বই তত্ব কথা।

ঠিক গোধূলি সময়ে বৈবাহিক দল রাজ পণ্ডিতের বাটীতে প্রবেশ করিল। তখন উভয় দলের বাদ্য তরঙ্গে, লোক কোলাহলে ও আলোক মালায় উৎসব প্রগাঢ় ভাব ধারণ করিল। কন্যাকর্ত্তা স্বদলে সমবেত হইয়া জামাতাকে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ক্রমে বরণ, স্ত্রী আচার, সাত পাক, মালা বদল ও সম্প্রদান সকলই সম্পন্ন হইল। লোকের হৈ হৈ চৈ চৈ, স্ত্রীকণ্ঠের উলুধ্বনি, উভয় দলের হাস্য পরিহাস, শঙ্খাদির মাঙ্গল্য রবে মিশিয়া অন্তঃপুরের গাম্ভীর্য্য ও নিস্তব্ধতাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। সে রাত্রি সেই ভাবেই কাটিয়া গেল। বাসর শয্যায় পাড়ার মেয়েদের সরল ও কুটীল নানা রকমের তামাসা, ও গণ্ডগোলে নব দম্পতীর নিদ্রা মাত্র হইল না। প্রাতে কুশণ্ডিকাদি সমাপ্ত হইলে পণ্ডিতজী পরম সন্তোষে বর যাত্রীদিগকে ভোজন করাইলেন ও ধেনু, ভূমি, ধনরত্ন ও দাস দাসী প্রভৃতি যৌতুক দিয়া অপরাহ্নে কন্যাজামাতাকে বিদায় করিলেন। পূর্ব্ব দিনের ন্যায় স্বদলে সমস্ত নগরী প্রদক্ষিণ করিয়া গৌরচন্দ্র সন্ধ্যারাত্রে নবোঢ়া-বধূ লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তাহা দেখিয়া জননীর আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিল।

'শচী প্রেমে গর গর, কোলে করি বিশ্বম্ভর,
চুম্ব দেই সে চাঁদ বদনে।
আনন্দে বিহ্বল হিয়া, আয়্যগণ মাঝে গিয়া,
বধূ কোলে শচীর নাচনে।'

গয়াগমন।

কথিত আছে, এই সময়ে ধর্ম্ম শূন্য জগৎ দর্শন করিয়া নবদ্বীপের ক্ষুদ্র বৈষ্ণব দল সর্ব্বদাই দুঃখানুভব করিতেন; এবং জীবের দুঃখ দর্শনে রোদন করিতেন।

'শূন্য দেখি ভক্তগণ সকল সংসার;
হা কৃষ্ণ! বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার।'

কিন্তু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করে এমন কয়জন আছে? সকলেই আপন আপন সুখৈশ্বর্য্যে মত্ত। কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক,তাঁহাদিকে দেখিলে লোকে বিদ্রূপ করিত, সঙ্কীর্ত্তনে ও ভজনে বাধা দিত, নানারূপে অত্যাচার করিত ও শক্ত শক্ত কথা শুনাইয়া দিত। করুণহৃদয় বৈষ্ণবগণ তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া কায়-মনোবাক্যে জীব নিস্তারের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অসহায়ের সহায় যিনি, তিনি এই সময়ে একটী সরল প্রেমিক ও অকপট ভক্ত জুটাইয়া দিয়া ভক্ত মণ্ডলীর উৎসাহ বৃদ্ধি করিলেন। যে প্রকারে হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্ত দলে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

লোকে বলে পাতাচাপা কপাল, আর পাথরচাপা কপাল। পাথর চাপা কপালে পাথরও উঠে না, কপালও ফলে না। গৌরের কপাল পাতা চাপা; একটু বাতাসে পাতাটী উড়ে যাওয়া মাত্র কপাল ফলে গেল। স্নিগ্ধ কোমল জলগর্ভা নির্ঝরিণীর মুখ দুই চারিটী তৃণ গুল্মে আচ্ছাদিত ছিল, কোথা হইতে একটু নির্ম্মল দক্ষিণা বাতাস বহিল, তৃণ কয়টী সরিয়া গেল, আর প্রমুক্ত মুখ দিয়া শীতল নির্ম্মল জল অনর্গল ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ফলতঃ গৌরের ধর্ম্ম জীবন বিকাশের গয়াগমন উপলক্ষ মাত্র। বিধাতা তাঁহার হৃদয়-প্রস্রবণে প্রেম ভক্তিরসে সুধারাশি স্বহস্তে পূরিয়া দিয়া উপরে শাস্ত্র জ্ঞানের একখানি শরাব আঁটিয়া দিয়াছিলেন। আবরণ খানি সরিয়া যাওয়ায় তাঁহার স্বাভাবিক গতি অব্যাহত বেগে অনন্তের দিকে ছুটিয়া চলিল; জাতি কুল ধনমানের পর্ব্বত তাহাকে কিছুতেই আটক করিয়া রাখিতে পারিল না।

দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে পিতৃকৃত্য করিবার জন্য জননীর আজ্ঞা লইয়া গৌরচন্দ্র গয়ায় চলিলেন; সঙ্গে অনেকগুলি শিষ্য ও কোন কোন আত্মীয় প্রতিবেশী ছিলেন। সঙ্গীদিগের সঙ্গে নানারূপ শাস্ত্র ও ধর্ম্ম কথা কহিতে কহিতে শচীনন্দন বঙ্গ দেশের সীমা অতিক্রম করিলেন। নানা দেশের নানারূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে তাঁহার উদার চিত্ত আরও উদারতা লাভ করিল, মন যেন অনন্তের দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল এবং তিনি অননুভূত নির্ম্মল সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। আস্তে আস্তে তাঁহারও প্রাণে যে সুমহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, তাহা তিনিও তখন বুঝিতে পারেন নাই। পণ্ডিতেরা বলেন যে, উষাগমের ন্যায় শুভ ঘটনার পূর্ব্বাভাস প্রাণের অভ্যন্তরে দেখা দেয়। এখন বিশ্বম্ভরের

জীবনাকাশে সেই আভাস লক্ষিত হইতেছিল। এক জায়গায় পাহাড়ের উপর দিয়া যাইতে যাইতে একটী কুরঙ্গ মিথুনের দাম্পত্য ক্রীড়া দর্শনে গৌরচন্দ্র সঙ্গী লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেনঃ—

"মৃগের কৌতুক দেখি হৈল কুতূহল;
প্রাকৃত লোকের ন্যায় হাসে বিশ্বম্ভর।
লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধে মত্ত পশুগণ;
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত সর্ব্ব জন।
সঙ্গীগণে হাসিয়া কহয়ে ভগবান্;
যে বুদ্ধি পশুতে, মানুষের বিদ্যমান।
কৃষ্ণ জ্ঞান আছে মাত্র মানুষ শরীরে;
মানুষ না ভজে কৃষ্ণ পশু বলি তারে।'

চৈঃ মঃ

গয়া-পথের আর একটী বৃত্তান্ত উল্লেখ করা উচিত। চির নামে নদীতে স্নানাবগাহন করিয়া যাত্রীদল মন্দার পর্ব্বতে উঠিয়া মধুসূদন বিগ্রহ দর্শন করিলেন এবং তথা হইতে নামিয়া বিগ্রহ পূজক এক ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থিতি করিলেন। সে দেশের ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহার এদেশের ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; তদ্দৃষ্টে সমভিব্যাহারী যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ গৃহস্বামীকে অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ তাহা লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইলেন। তাঁহার প্রাণে মানুষের বিশেষতঃ বিষ্ণুভক্তের অপমান সহ্য হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইয়াছিল। সঙ্গের শিষ্যগণ অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া তাঁহার রোগ শুশ্রূষা ও ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই ব্যাধির হ্রাস হইল না। তখন রোগী আপনার চিকিৎসা আপনিই করিলেন। কথিত আছে যে, গৃহস্বামী ব্রাহ্মণের পাদোদক লইয়া পান করায় তিনি ব্যাধিমুক্ত হইলেন। যাঁহারা সেই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিয়া ছিলেন, তাঁহারা বুঝিলেন যে, তাঁহাদিগের শিক্ষার্থেই এ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল। তাঁহারা আপনাদের অপরাধ স্বীকার করিলে গৌরসুন্দর এই শ্লোকটী পাঠ করিলেন;—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ
হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।"

অর্থ—তোমরা বামনাইর বড়াই করিও না; ভক্তি বিহীন বামুনও চণ্ডাল, আর ভক্তিমান্ চণ্ডালও পূজনীয়।

কিছু দিনান্তে যাত্রীদল গয়া-ধামে উপনীত হইল। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া যাত্রীগণ চক্রবেড়ের মধ্যে গিয়া বিষ্ণুপদচিহ্ন দর্শন করিলেন। গয়ালী পাণ্ডাগণ পাদচিহ্নের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ভগবৎ পাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল; গৌরের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে অমনি ভাবোচ্ছ্বাল উথলিয়া উঠিল; কত ভাবলহরী যে প্রাণে উঠিতে লাগিল, তাহা বর্ণনায় শেষ হয় না। তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থাই ভাবময়। এতদিন কেবল পাণ্ডিত্যের বাহ্যাড়ম্বরে তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। শুভক্ষণে আবরণ উন্মুক্ত হওয়ায় হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি প্রকাশ হইয়া পড়িল। ইহার পর দেখা যাইবে যে, অল্প মাত্র উদ্দীপনাতেই তদীয় ভাবাবলি অসম্যোর্দ্ধভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিত। গয়া-পথে সেই উদ্দীপনার আরম্ভ। গয়াক্ষেত্রে তাহার গাঢ়তা; এবং শেষে তাহার অদম্য উচ্ছ্বাস। ইহাই তাঁহার জীবনের উজ্জ্বল ছবি ও এই প্রমত্ত ভক্তি শিখাইতেই তাঁহার মর্ত্তো

অবতরণ। গয়ার প্রথম উদ্দীপনা বৃন্দাবন দাস মহাশয়ের মুখে শুনুন্ঃ—

'চরণপ্রভাব শুনি বিপ্রগণ মুখে ;
আবিষ্ট হইলা প্রভু নিজানন্দ সুখে।
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম নয়নে ;
রোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ দর্শনে।
সর্ব্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র ;
প্রেমভক্তি প্রকাশের করিলা আরম্ভ।
অবিচ্ছিন্না গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে ;
পরম অদ্ভুত সব দেখে বিপ্রগণে।"

চৈঃ ভাঃ আদিঃ ১৫ অঃ।

বিধাতার গূঢ় বিধান অতি বিচিত্র! 'যে যা চায় সেতা পায়, কথার সার্থকতা যদি কোন খানে থাকে, তবে তাহা সাধু জীবনেই লক্ষিত হইবে। হরি-চরণ পাই-বার লালসায় ধ্রুব ব্যাকুল হইয়া বাহির হইলেন, অমনি সদুপদেষ্টা নারদের সাক্ষাৎ-কার লাভ হইল। দেবনন্দন ঈশা পিতার অন্বেষণে ব্যাকুল ; অবগাহক যোহন অমনি হাজীর। গোরাচাঁদের প্রাণে ভগবত্তৃষ্ণা যেই প্রবল হইল, তখনই সদ্‌গুরু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে হঠাৎ তাঁহার পুনর্ম্মিলন হইল।

"দৈব যোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে ;
আইলেন ঈশ্বর ইচ্ছায় সেই স্থানে।"

সেই নবদ্বীপে সাক্ষাৎ, তাহার পর এই দেখা হইল। তখনকার অবস্থা আর এখন-কার অবস্থা—আকাশ পাতাল ভেদ ভাবিয়া গৌরচন্দ্র কিছু লজ্জিত হইলেন। পুরীকে প্রণাম করিলে পুরীগোঁসাই গাঢ় প্রেমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও উভয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শচীনন্দন পুরীকে সম্বোধন করিয়া ব্যাকুল-ভাবে বলিলেন, "আমার গয়ায় আসা সার্থক হইল ; কথিত আছে যে, যাহার নামে গয়ায় পিণ্ড দেওয়া যায় সেই উদ্ধার হয়। কিন্তু আপনাকে দেখিলে কোটী কোটী পিতৃপুরুষ উদ্ধার হইয়া যায় ; আপনি সকল তীর্থের সার তীর্থ ; আমাকে ভব-সাগর হইতে উদ্ধার করত চরণামৃতরস পান করান।"—

'প্রভু বলে গয়া যাত্রা সফল আমার ;
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার।
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তারে পিতৃগণ ;
সেওযারে পিণ্ড দেয় তরে সেই জন।
তোমা নিরখিলে মাত্র কোটী পিতৃগণ ;
সেইক্ষণে সর্ব্ব বন্ধ পায় বিমোচন।
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান ;
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান।
সংসার-সমুদ্র হ'তে উদ্ধার আমারে ;
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে।
কৃষ্ণ পাদপদ্মের অমৃতরস পান ;
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান।"

চৈঃ ভাঃ

ঈশ্বর পুরীও গৌরের পাণ্ডিত্য ও গুণের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলেন "ওহে নিমাই পণ্ডিত! আমি সত্য বলিতেছি যে তোমাকে দেখিলে আমার পরমানন্দ লাভ হয় ; আমার বোধ হয় তোমাতে ঈশ্বরাংশ আছে ; নইলে তোমাকে দেখিলে কৃষ্ণ-দর্শনের সুখ হইবে কেন?" এই কথা শুনিয়া গৌরাঙ্গ ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেনঃ—

"শুনি প্রিয় ঈশ্বর পুরীর সত্য বাক্য ;
হাসিয়া বলেন প্রভু তোমার বড় ভাগ্য।
এই মত কত আর কৌতুক সম্ভাষ ;
যত হইল তাহা বলিবেন বেদব্যাস।"

ইহার পর কিছু সময়ের জন্য উভয়ে বিদায় হইলে গৌরচন্দ্র লৌকিকী কার্য্য

করিতে লাগিলেন। ফল্গু তীর্থে বালীর পিণ্ডদান, গিরি-শৃঙ্গে প্রেত গয়ার শ্রাদ্ধ, রাম গয়া, যুধিষ্ঠির গয়া, ভীম গয়া, ষোড়শী গয়া, শিব গয়া, ব্রহ্ম গয়া প্রভৃতি স্থানে পৃথক পৃথক শ্রাদ্ধ করিয়া অবশেষে গয়া-শিরে পিণ্ডদান ও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতঃ বাসায় আসিয়া রন্ধন করিতে লাগিলেন। রন্ধন সম্পূর্ণ হইয়াছে, এমন সময় কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঢুলিতে ঢুলিতে ঈশ্বরপুরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৌরসুন্দর রন্ধনের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া পরম সম্ভ্রমে নমস্কার করতঃ পুরীকে বসাইলেন। পুরী গোঁসাই প্রস্তুতার দেখিয়া বলিলেনঃ—

"হাসিয়া বলেন পুরী শুনহ পণ্ডিত।
ভাল ত সময় হইলাম উপনীত।"

গৌরচন্দ্র পুরীর ঈঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিলেন ঃ—

"প্রভু বলে যবে হৈল ভাগ্যের উদয়;
এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর মহাশয়।"

পুরী বলিলেন "তুমি কি খাইবে?

গৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন "আমি আবার রাঁধিব?"

পুরী। "আর পাকের প্রয়োজন কি? যে অন্ন আছে তাহা দুই জনে ভাগ করিয়া খাইনা কেন?"

গৌরাঙ্গ। "তা হবে না! আপনাকে সব অন্ন খাইতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি আহারের স্থান পরিষ্কার করিয়া দিয়া সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন স্বহস্তে পরিবেশন করতঃ ঈশ্বর পুরীকে ভোজন করাইলেন ও আপনার জন্য পুনঃ পাক করিয়া লইলেন এবং ভোজনান্তে মাল্য চন্দন দিয়া পুরীর যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। অন্য দিনে গৌরাঙ্গদেব ঈশ্বর পুরীকে নিভৃত স্থানে পাইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্র দীক্ষা লইবার অভিলাষ জানাইলেন।

"আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বর পুরী স্থানে;
মন্ত্র দীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে।"

পুরী গোঁসাই উত্তর করিলেনঃ—

"পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা?
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা।"

তৎপরে ঈশ্বর পুরীর নিকট গৌরচন্দ্র দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ সাধারণ লোকের ন্যায় নহে। প্রথমে যত দিন পর্য্যন্ত ব্যাকুলতার উদয় হয় নাই, তত দিন তিনি পরমার্থ সম্বন্ধে চিন্তাও করেন্ নাই। ব্যাকুলতা আসিলে আত্মার বলাবল ও আভ্যন্তরীণ স্পৃহা পরীক্ষা করতঃ গুরু-প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া লইলেন এবং শ্রদ্ধা ভক্তির উপযুক্ত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিলেন। দীক্ষান্তে নব শিষ্য অভীষ্ট দেবকে নিবেদন করিলেন।

"তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে;
প্রভু বলে দেহ আমি দিলাম তোমারে।
হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করহ আমারে;
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে।"

তখন গুরু শিষ্যে প্রেমে পুলকিত হইয়া পরস্পর গাঢ়তর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। উভয়ের পুলকাশ্রুতে উভয়ের শরীর অভিসিঞ্চিত হইল; মহা ভাবের পূর্ব্বাবস্থা দেখা গেল।

"শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বর পুরী;
প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি।
দোঁহার নয়ন জলে দোঁহার শরীর;
সিঞ্চিত হইলা প্রেমে কিছু নহে স্থির।"

এখন হইতে দিন দিন তাঁহার ধর্ম্ম রাজ্যের পথ প্রশস্ত হইতে লাগিল; দিন

দিন ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হইতে চলিল। পূর্ব্বের বিদ্যা-গৌরব ও দাম্ভিকতা কোথায় পলায়ন করিল। ভগবৎ প্রেম সাগরে তিনি ভাসিতে লাগিলেন। সে নিমাই পণ্ডিত আর নাই। তাঁহার সম্বন্ধে দিন দিন সকলই নূতন ও আশ্চর্য্য দেখা যাইতে লাগিল। বিধাতার করুণা হস্ত তাঁহার আত্মাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নবভাবে গঠন করিয়া জগতে হরিভক্তি ও হরিলীলা প্রচারের উপযোগী করিয়া তুলিল। ইহা-রই নাম নব জীবন লাভ। দীক্ষা গ্রহণের পর কতক দিন তিনি গয়াতে ছিলেন; এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ বিরহ তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। "কোথা যাই, কোথা যাইলে তাঁহাকে পাই; কেমন করিয়াই বা প্রাণের তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়" নিরন্তর কেবল এই চিন্তাই করিতে লাগিলেন। আহারে, শয়নে, ভ্রমণে, আলাপে কিছুতেই স্বাস্থ্য নাই। কি যেন পাইতে চাই পাই না; কিসের জন্য যেন প্রাণে ফাঁক ফাঁক লাগে; এই যেন ধরি ধরি আবার ধরা দেয় না; কি যেন দেখি দেখি আর দেখিতে পাই না। এই ভাবে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। অপ্রেমিক ব্যক্তির পক্ষে ঐ অবস্থা বর্ণনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। যাহার অন্তরে এই স্বর্গীয় ব্যাকুলতা বিঁধি-য়াছে, কেবল সেই ইহার বিক্রম বুঝিতে পারে। সময়ান্তরে তিনিই এ কথা এই-রূপে ব্যক্ত করিয়াছেনঃ—

"এই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে" ইত্যাদি। এক্ষণকার অবস্থা বৃন্দাবন দাস মহাশয় এইরূপে বলিয়াছেন;

"দিনে দিনে বাড়ে প্রেম ভক্তির বিজয়।
এক দিন গৌরচন্দ্র বসিয়া নিভৃতে;
নিজ ইষ্ট মন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে।
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু প্রেম প্রকাশিয়া;
কান্দিতে লাগিলা অতি উচ্চ করিয়া।
কৃষ্ণরে! বাপরে! প্রাণ জীবন শ্রীহরি;
কোন্ দিকে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি।
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা?
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা।
যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর;
সে প্রভু হইলা প্রেমে আপনে অস্থির।"

চৈঃ ভাঃ

তাঁহার সঙ্গী শিষ্যগণ তাঁহাকে অনেক প্রকারে শান্ত্বনা করিয়া দেশে যাইতে অনু-রোধ করিলে, তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন "বন্ধুগণ! তোমরা দেশে ফিরিয়া যাও, আমি আর সংসারে ফিরিব না। আমার প্রাণনাথকে যেখানে যাইলে পাইব, আমি সেই দেশে চলিয়া যাইব।" গভীর রজনী যোগে সমভিব্যাহারী লোক-দিগকে না বলিয়া তিনি মথুরা যাইবেন বলিয়া বাসা হইতে বাহির হইলেন এবং "কৃষ্ণরে! বাপরে! কোথায় পাইব" এই বলিয়া পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন। কথিত আছে যে, যাইতে যাইতে তিনি প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। তিনি দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই-লেন, কে যেন মধুর অস্ফুট শব্দে বলিতে লাগিল—"এক্ষণে মথুরায় যাইবার সময় হয় নাই। সময় হইলে যাইও; এখন নবদ্বীপে প্রতিনিবৃত্ত হও; তোমাকে সংকীর্ত্তন প্রকাশ করিতে হইবে; জগৎবাসীকে প্রেম ভক্তি বিলাইতে হইবে; হরি প্রেমে বঙ্গ-দেশ ডুবাইতে হইবে; এ সব কাজ না করিয়া তোমার সংসার ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।" দৈববাণী শ্রবণ করিয়া গৌরচন্দ্র

অনেক শান্তি লাভ করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই গয়া হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এই থানে তাঁহার জীবন-ভাগবতের প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হইল। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নব জীবন লাভ করিয়া নব প্রেমে উন্মত্ত হইয়া যে নব লীলা আরম্ভ করিলেন তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

তোমার আমার।

দেবি! তোমার আমার,—
কুমুদ সলিলে ভাসে, শশধর নীলাকাশে
বিষাদে মলিন মুখ চির অন্ধকার,
বঞ্চিত মিলন সুখে, সঞ্চিত বিরহ বুকে
অপূর্ণ আশার পূর্ণ ছবি দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

১

দেবি! তোমার আমার,—
অই যে পাষাণময়, শোভে গারো গিরিচয়,
গগণ ভেদিয়া শির উঠিয়াছে যার,
আমরা উহারি সম, দু'জনেই নিরমম
কঠিন কর্কশ প্রাণ দেখ দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

২

দেবি! তোমার আমার,—
ভীষণ সাহারা যথা, নাহি তরু তৃণ লতা
ধূ ধূ করে বালুরাশি অনন্ত অপার,
নাহি বারি-বিন্দু লেশ, সর্ব্বনেশে মরুদেশ
মরীচিকা মাখা সেই প্রাণ দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

৩

দেবি! তোমার আমার,—
স্রোত প্রতিকূল বাতে, ভীষণ তরঙ্গাঘাতে
আছাড়ে আছাড়ে যথা ভাঙ্গে পারাবার,
আপনি আপন বুকে, লুঠিয়া পড়ি গো দুখে
আকুল উন্মত্ত সেই চিত্ত দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

৪

দেবি! তোমার আমার,—
সুন্দর সোণার ছবি, ডুবিলেও রাঙ্গা রবি,
গ্রাসে লো জগৎ যথা ঘোর অন্ধকার,
হারায়ে গিয়েছি পথ, নাহি ভূত ভবিষ্যত,
তেমনি জীবন আজি দেখ দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

৫

দেবি! তোমার আমার,—
অই যে ভুজঙ্গচয়, ফণা বিস্তারিয়া রয়,
একটু দংশিলে প্রাণ বাঁচেনা কাহার,
ওর চেয়ে হলাহলে, সতত হৃদয় জ্বলে
তবুও মরণ নাই দেখ দু'জনার
প্রিয়ে তোমার আমার!

৬

দেবি! তোমার আমার,—
অই যে ক্ষিপ্তের মত,জলন্ত জ্যোতিষ্ক কত
অনন্ত গগন রাজ্যে ভ্রমে অনিবার,
আমরাও—হরি হরি! তেমনি সংসার করি
হৃৎপিণ্ড উল্কাপিণ্ড জ্বলে দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

৭

দেবি! তোমার আমার,—
অই যে জলদচয়, ব্যাপিয়া গগনময়
কাঁদিয়া বরষে কত আঁখিনীর ধার,
আমরা তেমনি দুখে, নিত্য কাঁদি অধোমুখে

লুকা'য়ে অশনি বুকে রেখে দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

৮

দেবি! তোমার আমার,—
এ'ত গো প্রণয় নহে,প্রণয়ে কি প্রাণ দহে?
হৃদয় পুড়িয়া এযে হ'ল ছারখার,
বুঝিতে পারিনা হায়, কিসে এ যাতনা যায়,
জ্বলিছে পতঙ্গ সম প্রাণ দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

৯

দেবি! তোমার আমার,—
আশা ভালবাসা যত, সকলি জন্মের মত
অপূর্ণ রহিল পূর্ণ হইল না আর,
শুধু হাহাকার করি, জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি
আর ত হবে না আহা দেখা দু'জনার,
প্রিয়ে তোমার আমার!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

কৃষ্ণদাসী রাজনীতি।

"He came unto his own and they received him."—*Emerson.*

(১) বাবু রামগোপাল সান্যাল প্রণীত ও বেঙ্গলী যন্ত্রে রামকুমার দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ৺রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের জীবন-চরিত।

(২) ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের ইলবার্ট বিল এবং প্রজা ভূম্যধিকারী সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৩) কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের বিবিধ আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বক্তৃতা।

(৪) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের কার্য্য বিবরণ।

(৫) হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের লিখিত নানাবিধ প্রবন্ধ।

(৬) ইণ্ডিয়ান মিরর এবং অমৃত বাজার প্রভৃতি পত্রিকায় রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধীয় সাধারণের মতামত।

ইংলণ্ডীয় সাহিত্য জগতের গৌরব লর্ড মেকলে জীবনচরিত-লেখকদিগের প্রতি সর্ব্বদাই বিশেষ ঘৃণা প্রদর্শন করিতেন। কখনও কখনও তিনি জীবনচরিত-লেখকদিগের পক্ষপাতিত্বের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে মস্তিষ্কহীন (idiot) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুত এ সংসারে নিরপেক্ষ জীবনচরিত-লেখক অতি বিরল। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু, কিম্বা অনুগত লোকদিগের কর্ত্তৃকই প্রায় জন-বিশেষের জীবনচরিত লিখিত হয়; সুতরাং পক্ষপাতিত্ব শূন্য প্রকৃত জীবন-চরিত্রের অভাব দর্শনে কাহারও আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই।

মেকলে ইংলণ্ডীয় জীবনচরিত লেখক-দিগকে মস্তিষ্কহীন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের যে সকল সুবিজ্ঞ জীবনচরিত লেখক ভাটদিগের ন্যায় মৃত লোকের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া অর্থ সঞ্চয়ের উপায় অবধারণ করেন, তাঁহাদিগকে কেবল মস্তিষ্কহীন বলিয়া অভিহিত করিলে তাহাদিগের প্রণীত পুস্তকের যথোচিত সমালোচন হয় না। তৃণভোজী বাঙ্গালী-

দিগের স্বভাবতঃই মস্তিষ্ক অতি অল্প। বাঙ্গালী গ্রন্থকার ছুই একখানি চটি পুস্তক লিখিলেই তাঁহার তরল মস্তিষ্ক বিলোড়িত হয়। সুতরাং বঙ্গের জীবনচরিত লেখক-দিগকে মস্তিষ্কহীন বলিয়া অভিহিত করিলে তদ্দ্বারা কেবল তাঁহাদিগের জাতীয় স্বভাব ব্যাখ্যাত হয়।

বঙ্গে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালীদিগের জীবনচরিত লিখিবার অভ্যাসও ছিল না। ভাটেরাই কেবল ব্যক্তি বিশেষের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া জীবনচরিতের অভাব মোচন করিতেন। এখনও বঙ্গগ্রন্থকারগণ মধ্যে কেবল ছুই একটী লোককেই জীবনচরিত লিখিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখা যায়। জীবনচরিতের প্রকৃত উপকারিতা আজ পর্য্যন্তও বঙ্গবাসীগণের সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হয় নাই। জীবনচরিত লিখিবার প্রথা বঙ্গে বিশেষরূপে প্রচলিত না হইলে এবং জীবনচরিত পাঠের প্রকৃত উপকারিতার প্রতি বঙ্গবাসীদিগের দৃষ্টি না পড়িলে এই বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রদ পুস্তক প্রকাশিত হইবার বড় আশা নাই।

বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ কর্ত্তৃক, কি বঙ্গ ভাষায়, কি ইংরাজি ভাষায়, আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর জীবনচরিত স্বরূপ যে কয়েক খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই অঙ্গহীন এবং অসম্পূর্ণ। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ বলিয়া মনে করি না। কিন্তু কেবল লেখকের দোষেই যে এইরূপ হয়, তাহা নহে। বাঙ্গালীর জীবন স্বার্থপরতার আধার। দাসত্ব-নিগড়াবদ্ধ বাঙ্গালীর জীবনে কোন উচ্চ ভাব নাই, কোন উচ্চ অভিলাষ নাই, বীরত্বের কোন চিহ্ন নাই, সুতরাং ঈদৃশ জীবনশূন্য লোকের জীবনী কিরূপেই বা শিক্ষাপ্রদ হইবে? বাঙ্গালীর জীবনচরিত সংক্ষেপে তিনটী কথায় নিঃশেষিত হয়—"তিনি জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় বিবাহ করিয়াছিলেন; চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহার একাদশটী সন্তান জন্মিয়াছিল। পঁয়তাল্লিশ বৎসরের সময় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।—এই তো বাঙ্গালীর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এই পঁয়তাল্লিশ বৎসরের জীবনের সমুদয় ঘটনা যদি বিস্তারিত রূপে লিখিতে হয়, তবে আরও তিনটী কথা যোগ করিতে হইবে। তবে অবশ্যই লিখিতে হইবে যে, আজীবন তিনি স্ত্রী এবং কন্যাদিগের গহনার সংস্থানের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশেষ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, কখন কোন দেশহিতকর অনুষ্ঠানে যোগ প্রদান করেন নাই।

কিন্তু পরলোকগত রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাছুর এ সংসারে সাধারণ বাঙ্গালীদিগের ন্যায় কর্ম্মহীন, অলস জীবন যাপন করেন নাই। ভাল মন্দ সদসদ্ তিনি অনেকানেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম যে, কৃষ্ণদাসের জীবনী-লেখক ঈদৃশ কর্ম্মশীল জীবনের প্রকৃত ছবি সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। কিন্তু বাবু রামগোপাল সন্ন্যাল পাঠকদিগকে সে বিষয়েও নিরাশ করিয়াছেন।

এক দিকে যদ্রূপ অত্যাচার পীড়িত এবং মহত্ত্বহীন বাঙ্গালী জীবন নীচাশয়তার আধার হইয়া পড়িয়াছে, পক্ষান্তরে

আবার বঙ্গীয় লেখকদিগেরও তদ্রূপ মানব জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব অবধারণ করিবার ক্ষমতা নাই। সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বাঙ্গালী লেখক কেবল মস্তিষ্কহীন নহেন, তাঁহাকে অধিকন্তু চক্ষু কর্ণহীন বলিয়া মনে হয়।

আমরা অস্বীকার করিনা যে, মানব জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল বাঙ্গালী নহেন, সকল দেশের লোকেরাই চিরান্ধতা প্রকাশ করেন, কিন্তু বাঙ্গালীর অন্ধতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম। পিটার প্রাণের ভয়ে তিনবার খৃষ্টকে অস্বীকার করিলেন। তিনবার সত্যের অপলাপ করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ রোমনগরে সেণ্টপিটার কেথিড্রেল সংস্থাপিত হইল। পক্ষান্তরে ব্রুনো (Bruno) এবং গালিলিও সত্যপ্রিয়তার অনুরোধে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নাম বিস্মৃতির সাগরে নিমগ্নপ্রায় হইয়া রহিল। ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে যাঁহারা প্রাণ বিসর্জন করিতে কুণ্ঠিত নহেন, সর্ব্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিয়াও যাহারা সত্য এবং ন্যায়ের রাজত্ব সংস্থাপনে যত্নবান, তাঁহারাই কেবল মহৎ বলিয়া অভিহিত হইবার উপযুক্ত, তাহাদিগের জীবনীই কেবল, শিক্ষাপ্রদ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু মানব জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব সম্বন্ধে সমগ্র মানবমণ্ডলীর চিরান্ধতা নিবন্ধনই প্রকৃত সাধু এবং প্রকৃত মহাপুরুষগণ জীবিতাবস্থায় কিম্বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও, জন সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করিতে কখনও সমর্থ হয়েন না। জীবিতাবস্থায় তাঁহাদিগকে সমাজপ্রচলিত বিবিধ পাপ ও অত্যাচারের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়, সুতরাং জনসাধারণ কর্ত্তৃক তাঁহারা সর্ব্বদাই ঘৃণিত এবং অপমানিত হয়েন। প্রকৃত সাধু এবং প্রকৃত মহাপুরুষগণ মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে, জন সাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়েন। তখন ভাবী বংশ্যগণ তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া গ্রহণ করেন।

কিন্তু দেশহিতৈষীর পরিচ্ছদধারী, দেশহিতৈষীর ব্যবসাবলম্বী ঘোর সংসারাক্ত এবং যশোলিপ্সু লোকেরাই কেবল জীবিতাবস্থায় দেশহিতৈষী বলিয়া জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হয়েন। সমাজপ্রচলিত বিবিধ কুসংস্কার, পাপ ও দুর্নীতি সমর্থন করিয়াই ইহারা চিরবাঞ্ছিত দুর্লভ দেশহিতৈষী নাম লাভ করেন। কিন্তু ইহাদিগের দ্বারা দেশের অমঙ্গল ভিন্ন কখনও কোন মঙ্গলসাধন হয় না।

বাবু রামগোপাল সান্যালের পূজিত পরলোকগত দেশহিতৈষী রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর যে এই শেষোক্ত শ্রেণীর দেশহিতৈষী ছিলেন, তাহা রামগোপাল বাবুর নিজের লিখিত পুস্তকই সপ্রমাণ করিতেছে। বাবু রামগোপাল সান্যালের পুস্তকের ১২২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে—"পরলোকগত কৃষ্ণদাস পাল কলিকাতা নগরে জলের কল সংস্থাপনের প্রস্তাব হইলে পর, তৎসম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। কলের জল ব্যবহার হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ—হিন্দুরা কখন কলের জল ব্যবহার করিবেন না—ইত্যাদি কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক কৃষ্ণদাস পাল আপত্তি করিতে লাগিলেন। তিনি নিজেও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। সুতরাং তিনি এই বিষয়ে আপত্তি করিলেন।"

আবার স্থানান্তরে রামগোপাল বাবু

উল্লেখ করিয়াছেন, (রামগোপাল বাবুর পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

"কৃষ্ণদাস পাল বঙ্গের নব্য সম্প্রদায়ের সমর্থনে তাঁহার "Young Bengal Vindicated" নামাঙ্কিত প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, "নব্য বাঙ্গালী তাঁহার দেশের সংস্কারক।" নব্য বাঙ্গালী ওয়ালেসের সদৃশ অশঙ্কিত হৃদয়ে এবং লুথারের ন্যায় আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, দেশপ্রচলিত কুসংস্কার এবং অপধর্ম্মের দুর্গ আক্রমণ করিতেছেন। দুর্গের বহির্ভাগ, এবং অন্তর্বিভাগেরও কতকাংশ নব্য বাঙ্গালী কর্তৃক পরাজিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরা সমাজ সংস্কারের কথায় কর্ণপাত করেন না, তাঁহারা তাহাদিগের ভগ্নী এবং কন্যার উন্নতি সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন। কিন্তু নব্য বাঙ্গালীগণ এই সম্বন্ধে ভারতবন্ধুদিগের সকল প্রকার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগের সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছেন, সকল প্রকার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। নব্য সম্প্রদায়ই বেথুন সাহেবের অনুষ্ঠিত সংস্কার কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। নব্য সম্প্রদায়ই রাজা রামমোহন রায়ের পরম পবিত্র মহৎ অনুষ্ঠানকে এ পর্য্যন্ত জীবিত রাখিয়াছেন। রাজা রাম রামমোহন রায়ের পবিত্র নাম শ্রবণে প্রত্যেক প্রকৃত হিন্দুর শিরা চঞ্চল বেগে কার্য্য করিতে থাকে। প্রত্যেক প্রকৃত হিন্দুর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। বিধবা বিবাহের আইন জারির প্রার্থনায় নব্য বাঙ্গালীগণই সহস্র সহস্র দরখাস্ত প্রেরণ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজকে প্লাবিত করিয়াছিলেন। নব্য সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদিগের বিনির্ম্মিত দেশাচারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া বিদেশ পরিদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। নব্য সম্প্রদায়ের কৃতকার্য্যতার বিষয় আর অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। এ দেশের যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, তৎসমুদয়ই নব্য সম্প্রদায়ের যত্নে ও চেষ্টায় সম্পন্ন হইয়াছে; ইত্যাদি ইত্যাদি।"

পরলোকগত কৃষ্ণদাস পাল যৌবনের প্রারম্ভে নব্যসম্প্রদায় সম্বন্ধে ঈদৃশ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন; দেশ-প্রচলিত কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। এই সময় ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের ন্যায় একবার তাঁহার জীবনে ন্যায় ও সত্যপ্রিয়তার জ্যোতি বিকশিত হইল। কিন্তু ঈদৃশ দেশ সংস্কারকের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বঙ্গসমাজে কথঞ্চিৎ প্রাধান্য লাভ করিবামাত্রই তাঁহার মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইল। লব্ধ প্রাধান্যের প্রতি তখন বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। সংস্কারের পথে অধিকতর অগ্রসর হইলে আর সে প্রাধান্য সংরক্ষিত হয় না, সুতরাং লব্ধ প্রাধান্য সংরক্ষণার্থ তাঁহাকে পথান্তর অবলম্বন করিতে হইল। বঙ্গসমাজে প্রাধান্য লাভের পর, কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর কি সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে, কি রাজনৈতিক কৌশল সম্বন্ধে স্বতন্ত্রপথ অবলম্বন করিলেন। জনসাধারণের সদ্ভাব রক্ষার্থ তিনি হরিভক্ত হইলেন; কলের জল ব্যবহার হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া কলিকাতা নগরে জলের কল সংস্থাপন সম্বন্ধে আপত্তি করিলেন। দেশকাল প্রচলিত অবস্থা কৃষ্ণ দাস পালকে আবার হিন্দুধর্ম্মের খোঁয়াড়ে লইয়া বান্ধিয়া রাখিল।

[illegible] জীবনের দৈনিক পরি-
[illegible] আমাদিগের [illegible] আশ্চর্য্য
[illegible] কোন কারণ নাই। কৃষ্ণদাস পাল
[illegible] ত্যাগপূর্ব্বক কেবল
[illegible] দিন
সমর্পণ [illegible] অবস্থায় কখন তিনি
প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না।
অর্থাৎ দেশহিতৈষী হইতে হইলে সমাজ-
[illegible] বিবিধ কুসংস্কার, কুৎসিত দেশা-
চার, এবং রাজনৈতিক অত্যাচার প্রভৃতি
সময়ে সময়ে সমর্থন করিতে হয়। রাম-
গোপাল বাবুর উল্লিখিত দেশহিতৈষী
কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের প্রাধান্য প্রকৃত
দেশহিতৈষীতারূপ ভিত্তির উপর সংস্থাপিত
নহে। সমাজ[illegible] মত-সমর্থন স্বরূপ
ভিত্তির উপর [illegible] প্রাধান্য সংস্থাপিত
[illegible]।

[illegible] কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর সমাজ-
সংস্কারক ছিলেন না। তাঁহাকে সমাজ
সংস্কারক স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহার বি-
[illegible] কোন কথা বলিলে তাঁহার প্রতি
অন্যায়াচরণ করা হইবে। তিনি দেশের
রাজনৈতিক কার্য্যকলাপেও রাজনৈতিক
[illegible]চনাতেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকি-
তেন। তাঁহার অবলম্বিত রাজনৈতিক
[illegible]ন্য (self-aggrandisment
[illegible] ব্যবহৃত হইতেছিল, না
[illegible] কামনায় তদ্রূপ কৌশল
অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাই কেবল
[illegible] মাত্র বিচার্য্য। কিন্তু রাজনৈতিক
[illegible] স্বরূপ পরলোকগত রায় কৃষ্ণদাস
[illegible] হিতৈষিতার সমগ্র
[illegible] রামগোপাল

বার পূর্ব্বে, আমরা [illegible] অন[illegible]
বিষয় উল্লেখ করিবার প্রলোভন [illegible]
করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছি।
সেই বিষয়টাই অগ্রে উল্লেখ ক[illegible]

[illegible]য় ব্যবস্থাপক সমাজে
বিলের সমালোচনা আরম্ভ হইলে প[illegible]
সমগ্র ভারতে ঘোর রাজনৈতিক আ[illegible]
উপস্থিত হইল। প্রজা ভূম্যধিকারী আই-
নের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধেও তখন আন্দোলন
চলিতে লাগিল। এই সময় এই সম[illegible]
আন্দোলন সম্বন্ধে কোন একটী বঙ্গী[illegible]
লেখক হবীবর বেদান্তবাগীশ নামে আপন
পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক রামায়ণ নাম প্রদান
ক্রুর একখানি হাস্যরস পরিপূর্ণ [illegible]
বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন।
এই পুস্তকের তৈলিকনন্দন শীর্ষক দ্বিতীয়
অধ্যায়ে যাহা কিছু লিখিত ছিল, তাহা
পাঠ করিয়া আমরা তখন মনে করিলাম
যে, লেখক কৃষ্ণদাস পালকে তৈলিকনন্দন
নামে অভিহিত করিয়াছেন।
[illegible]কের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা নিশ্চয়
করিয়া বলা যায় না। লেখক কৃষ্ণদা[illegible]
পাল বাহাদুরকে তৈলিকনন্দন না[illegible]
অভিহিত করিয়াছেন, কি তৈলিকনন্দন
লেখকের কোন কল্পিত নাম; তাহা
নিশ্চয় অবধারণ করিবার কাহারও সাধ্য
নাই। লেখক তৈলিক নন্দনকে বঙ্গীয়
দেশ হিতৈষীর পরিচ্ছদে সাজাইয়াছেন;
বঙ্গীয় সমুদয় দেশহিতৈষী, দেশসংস্কারক
এবং ধর্ম্মসংস্কারক [illegible] এক সাজে
গঠিত। সুতরাং প্রাগুপ্ত হবীবরের কল্পিত
তৈলিকনন্দন নাম দেশহিতৈষী চট্টোপা-
ধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘোষ, বসু এবং দত্ত

ভাবে প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু এই লেখকের কল্পিত তৈলিক নন্দন যদ্রূপ দেশ হিতৈষী ছিলেন, আমরাও রায় বাহাদুর কৃষ্ণদাস পালকে তদ্রূপ দেশহিতৈষী বলিয়া মনে করি। প্রাগুপ্ত লেখকের কল্পিত তৈলিক নন্দন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছেন—

—"বিজ্ঞান বিশারদ পণ্ডিত ডার্‌উইন বলেন যে, বানর সমুন্নত হইলে মানুষ হয়। কিন্তু আমাদিগের এই স্বর্ণ লঙ্কায় তদ্বিপরীতাবস্থা অবলোকন করিতেছি। হইতে পারে ভূমণ্ডলের অন্যান্য প্রদেশে বানর সমুন্নত হইয়া মনুষ্যাকার ধারণ করে। কিন্তু অস্মিন্‌দেশে মনুষ্যগণের বয়োবৃদ্ধি সহকারে যশঃ ও প্রভুত্ব লাভ হইবামাত্র যে তাঁহারা বানর রূপ ধারণ করেন, তাঁহার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। লঙ্কাদ্বিপাদিবাসিগণ, স্কুল কলেজে বিদ্যাভ্যাস সময় ক্ষীণজীবি মনুষ্যের ন্যায় যৌবন মদে মত্ত হইয়া দুর্বুদ্ধি বশতঃ রাইট্‌স্ এবং প্রিভিলেজ (Rights and Previlege) বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। কিন্তু দেশ কাল মাহাত্ম্য অনুসারে তাঁহারা সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনাদিগের (গবর্ণমেণ্টের) কর্ত্তৃক রম্ভা প্রদত্ত হইবা মাত্র, তাদৃশ মনোহর ফলের সুগন্ধে বিমোহিত হইয়া নিস্তব্ধ ও গম্ভীরভাবে বৃক্ষ শাখায় উপবেশন পূর্ব্বক, সর্ব্বচিন্তাপহারিকা সুষুপ্তিকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয়েন"।

হবীবর বেদান্তবাগীশ তাঁহার পুস্তকের স্থানান্তরে লিখিয়াছেন—

"মহর্ষি অগস্ত্য রামচন্দ্রের ঈদৃশ বাক্যাবসানে বলিতে লাগিলেন,—বৎস! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তোমার বয়স চল্লিশ বৎসরের অধিক হইয়াছে; সুতরাং বয়োবৃদ্ধি সহকারে তুমি সমুন্নত হইয়া বানর প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছ। যদি একটা কোকিলের ডাক শুনিবামাত্রই তোমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়া থাকে; যদি একটা দাত্যুহ পক্ষীর ধ্বনিতে তোমাকে পাগল করিয়া তুলিয়া থাকে এবং আত্মসুখ এবং আত্মরক্ষাকেই যদি তুমি একমাত্র ধর্ম্ম মনে করিয়া থাক; তবে তোমার দ্বারা কস্মিনকালেও সীতার উদ্ধার হইবেক না। বৎস! তুমি সীতার আশা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক একটী অনাথা বঙ্গীয় বিধবাকে সনাথা কর। প্রকৃত বীরপুরুষদিগের মস্তকের উপরে শত শত কাক ও কোকিল উড়িয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগের আন্তরিক প্রতিজ্ঞা—মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন—কিছুতেই বিচলিত হয় না।"

হবীবর বেদান্তবাগীশ বঙ্গের দেশহিতৈষীদিগকে যেরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, পরলোকগত কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর এবং বঙ্গের বর্ত্তমান অনেকানেক দেশহিতৈষী যে তদ্রূপ দেশহিতৈষী, তাহার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, যৌবনের প্রারম্ভে কৃষ্ণদাস পাল রাজা রামমোহন রায়ের এক জন বিশেষ ভক্ত ছিলেন, বিধবা বিবাহ এবং স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু পরে যখন কৃষ্ণদাস পালের বঙ্গ সমাজে প্রাধান্য লাভ হইল; যখন সার রিচার্ড টেম্পেলের সময় হইতে ক্রমান্বয়ে বঙ্গের সমুদায় লেফটেনাণ্ট গবর্ণর কৃষ্ণ-

দাসের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখনই কৃষ্ণদাস পালের আচরণ রূপান্তরিত হইল। এক দিকে লোকানুরাগের অনুরোধে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের অনুষ্ঠানের বিরোধী হইলেন, বিধবা বিবাহ অন্যায় বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং একেবারে হিন্দুসমাজের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের একটী সর্ব্বপ্রধান ভক্ত হইয়া উঠিলেন; পক্ষান্তরে আবার গবর্ণমেণ্টের দুই একটী অবৈধ * আচরণ সমর্থন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ইংরাজ সৈন্যের সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে হইলে তাহাদিগকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সৈন্য বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিন্তু এই সময় হইতে কৃষ্ণদাস বিশেষ রাজভক্ত হইলেন। ইংরাজ সৈন্যদিগকে "আমাদের সৈন্য" বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিলেন। আমাদের সৈন্য আফগানস্থানে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া পাওনিয়ার প্রভৃতি এঙ্গলো ইণ্ডিয়ানদিগের ধূঁয়া ধরিলেন। এইরূপে কৃষ্ণদাসের রাজনৈতিক কৌশল রূপান্তরিত হইতে লাগিল।

পাঠকগণ এই সকল বিষয় একটু বিশেষ চিন্তা সহকারে পাঠ করিলেই হবীবর বেদান্তবাগীসের চিত্রিত বঙ্গীয় দেশহিতৈষীদিগের সঙ্গে পরলোকগত রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের আচরণের কোন সাদৃশ্য আছে কিনা, তাহা সহজেই অবধারণ করিতে সমর্থ হইবেন।

বস্তুতঃ এ হতভাগ্য বঙ্গ দেশীয় লোকের কোন প্রকার প্রাধান্য লাভ হইলেই তাহাদিগের আচরণ একেবারে রূপান্তরিত হইয়া যায়। কখনও কখনও তাঁহারা এতদূর রূপান্তরিত হইয়া পড়েন যে, পরে আর তাঁহাদিগকে মনুষ্য বলিয়া চিনিবার সাধ্য থাকে না।

ঈদৃশ পরিবর্ত্তন ও বিকাশের (Evolution) মূল কারণ বঙ্গের বর্ত্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বঙ্গের সামাজিক কুসংস্কার এবং বঙ্গের কুৎসিৎ দেশাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে, জন সাধারণের শ্রদ্ধা হারাইতে হয়। আবার ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের অন্যায়াচরণের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত প্রতিবাদ করিলে গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, সুতরাং জন সাধারণের সদ্ভাব রক্ষার্থ সমাজ প্রচলিত বিবিধ দূষিত আচার ব্যবহারের সমর্থন, এবং গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ লাভের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের অন্যায়াচরণ সম্বন্ধে কৌশল পূর্ণ প্রতিবাদই এখন এ দেশীয় লোকদিগকে সহজে দেশহিতৈষী এবং দেশসংস্কারের পদ প্রদান করিতে পারে। বঙ্গের ঈদৃশ দেশহিতৈষী, ঈদৃশ সমাজ সংস্কারক এবং ঈদৃশ সমাজের অগ্রণীদিগের আচরণ ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আর অধিক বাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন। বঙ্গদেশে যদি কেহ প্রকৃত দেশহিতৈষী হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকার যশ; এবং পদ প্রভুত্ব লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া এক দিকে সমাজ সংস্কারার্থ সর্ব্ব প্রকার সামাজিক কুসংস্কারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে; পক্ষান্তরে আবার গবর্ণমেণ্টের প্রসন্নতা লাভের স্পৃহা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দেশের রাজনৈতিক অত্যাচার নিবারণে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। আর

* এই সকল অবৈধ আচরণ পরে যথা স্থানে উল্লিখিত হইবে।

কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার না করিয়া সমাজ সংস্কারক এবং দেশহিতৈষী হইবারও বিলক্ষণ উপায় রহিয়াছে। প্রাচীন "আর্য্য-ধর্ম্ম" "আর্য্য সভ্যতা" "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব" বলিয়া কিছুকাল চীৎকার করিলেই লোক সহজে সমাজসংস্কারক হইতে পারে। এবং সার্ জন চাইল্ড * (Sir John Child.) সদৃশ দস্যু বৃত্তি অবলম্বনকারী গবর্ণরকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সুদীর্ঘ অভিনন্দন প্রদান করিলেই অনায়াসে দেশহিতৈষী নাম লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

বাবু রামগোপাল সান্যাল এই শেষোক্ত শ্রেণীর দেশহিতৈষীর জীবনী লেখক স্বরূপ সাধারণের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রণীত পুস্তকখানি বোধ হয় তাঁহার প্রথম চেষ্টার ফল।

কৃষ্ণদাস পাল হবীবরের চিত্রিত বঙ্গীয় দেশহিতৈষী হইলেও, তাঁহার জীবনের কোন কোন ঘটনা যে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাঁহার জীবনের সেই সকল ঘটনা রামগোপাল বাবু বিশেষ সুস্পষ্টরূপে পাঠকদিগেরর দৃষ্টি পথে সংস্থাপন করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণদাসের বিবিধ কার্য্য-কলাপের মধ্যে রামগোপাল বাবু ঔচিত্য, ন্যায়পরতা এবং সঙ্গতভাব প্রদর্শন করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। আজ কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরকে ভারতবর্ষের সৈন্যাধ্যক্ষ লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগডালা কোন কার্য্যের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন, কাল লেফটেনাণ্ট গবর্ণর কোন বিষয়ে তাঁহার সাহায্যের প্রার্থী হইলেন; এই সকল বিষয়ের সমুল্লেখ দ্বারাই রামগোপাল বাবু—স্বীয় আরাধ্য দেবতার মহত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগডালা কিম্বা লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের অনুরোধানুসারে কার্য্য করিয়া কৃষ্ণদাস পাল ন্যায়ানুগত আচরণ করিয়াছেন কিনা, তৎসম্বন্ধে রামগোপাল বাবু কিছুই বলেন নাই। লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগডালা এবং লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের অনুরোধ স্বয়ং কৃষ্ণদাস পালকে তাঁহার জীবিতাবস্থায় যদ্রূপ উল্লসিত করিত, কৃষ্ণদাস পালের জীবন-চরিত লেখক বাবু রামগোপাল সান্যালও তদ্রূপ উল্লসিত হইয়া এই সকল বিষয় তাঁহার প্রণীত পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বিষয় সম্বন্ধে কৃষ্ণদাসের কার্য্যের ঔচিত্যানুচিত্য তিনি প্রদর্শন করেন নাই।

লেফটেনাণ্ট গবর্ণর কিম্বা গবর্ণর জেনে-রেলের সাদর সম্ভাষণ, অনুগ্রহ এবং অনু-রোধ পত্রই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহত্বের একমাত্র অখণ্ডনীয় প্রমাণ নহে। বঙ্গে হয়তো কোন কালে এইরূপ লেফটে-নাণ্ট গবর্ণরও ছিলেন যাহার উষ্ণীষ বেশ্যা কিম্বা নারী-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতা কুলটাদিগের চরণেও অবলুণ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং যদি লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের সাদর সম্ভাষণই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র প্রমাণ হয়, তবে প্রাগুক্ত কুলটাদিগকেও অতি শ্রেষ্ঠ দেশহিতৈষী বলিয়া তাহাদিগের এক খানি জীবনচরিত লিখিতে হইবে। রাম-গোপাল বাবুর পুস্তক পাঠ করিয়া অনি-

* Sir John Child is said to have seized thirteen large ships at Surat, the property of the merchants of the place, and to have retired with his shameful spoil to Bombay. It afterwards appeared on oath in the Court of Exchequer that the value of this spoil was 30,00,000 lacs of Rupees. Vide White's Account of Indian Trade.

বার্য্যরূপে আমাদিগের মনে এইরূপ সংস্কার হইয়াছে যে,গ্রন্থকর্ত্তা মানব জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব অবধারণে একেবারেই অসমর্থ।

তৃতীয়তঃ, রামগোপাল সান্ন্যালের প্রণীত পুস্তক খানি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশের শাসন সম্বন্ধীয় প্রায় সমুদয় প্রধান প্রধান ঘটনার সঙ্গেই কৃষ্ণদাস পালের বিশেষ সংশ্রব ছিল। সেই সকল বিষয়ের বিস্তারিত সমুল্লেখ ভিন্ন রায় কৃষ্ণ-পাল বাহাদুরের কার্য্যকলাপের উপকারিতানুপকারিতা পাঠকগণ বিচার করিতে সমর্থ হইবেন না।

আমরা শুদ্ধ কেবল রামগোপাল বাবুর এই অসম্পূর্ণ পুস্তক সমালোচনার্থ এইরূপ দীর্ঘ কোন প্রবন্ধ লিখিতামনা। বঙ্গ-দেশের অনেকানেক লোকই কৃষ্ণদাসের অবলম্বিত রাজনীতির বিশেষ পক্ষপাতী। কৃষ্ণদাসী রাজনীতির সমালোচনাই আমা-দের এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাবু রামগোপাল সন্যালের প্রণীত পুস্তক সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই অসম্পূর্ণ পুস্তকে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহা-দুরের প্রকৃত ছবি প্রতিবিম্বিত হয় নাই। সুতরাং রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের মতামত পাঠক-দিগের অবগত্যর্থ এই স্থানে প্রকাশ করি-তেছি।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে কলি-কাতা নগরের বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের পার্শ্বস্থিত একখানি ক্ষুদ্র গৃহে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পাল এই সময়ে পনের টাকা বেতনে শিবকৃষ্ণ দত্তের পাটের দোকানে কার্য্য করিতেন। কৃষ্ণদাসের পিতার বিশেষ অর্থের সংস্থান ছিল না। সুতরাং বাল্য শিক্ষার পর, কৃষ্ণদাস প্রগাঢ় অধ্যবসায় এবং আত্মাবলম্বন দ্বারাই ইংরাজি শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সাধন করিলেন। কিছুকাল তিনি হিন্দু মেট্রো-পলিটান কলেজে ডি, এল, রিচার্ডসন সাহে-বের নিকট ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রগাঢ় অধ্যবসায় এবং আত্মাবলম্বনই কৃষ্ণদাসের ভাবী উন্নতির একমাত্র মূল কারণ ছিল। বঙ্গদেশে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের ন্যায় অপর কেহ শুদ্ধ কেবল অধ্যবসায় এবং আত্মাবলম্বন দ্বারা এতদূর উন্নতি লাভ করেন নাই। বঙ্গ-দেশীয় লোকের তিনটী সদ্গুণের সম্পূর্ণ অভাব। বাঙ্গালীর অধ্যবসায় নাই, বাঙ্গা-লীর মধ্যে আত্মাবলম্বন এবং আত্মসম্মানের ভাব নাই। কিন্তু এই তিনটী সদ্গুণই কৃষ্ণদাস পালের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর, কৃষ্ণদাস পাল আলীপুরের জজের ট্রান্সলেটরের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই পদের বেতন বোধ হয় ১০০ এক শত টাকা ছিল। আত্ম-সম্মান-বিবর্জ্জিত বাঙ্গালীজাতি গবর্ণ-মেণ্টের অধীনে পদ লাভ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই লালায়িত। কিন্তু এই সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস পাল বাঙ্গালী সাধারণের অসদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন নাই। তিনি অনতি-বিলম্বে এই পদ পরিত্যাগ করিয়া ১২৫ টাকা বেতনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ে-সনের সহকারী সাম্পাদকের পদ গ্রহণ করি-লেন। কৃষ্ণদাসের ঈদৃশ পদত্যাগ তাঁহার জীবনের একটী মহদ্গুণের পরিচায়ক। আবার এই পদত্যাগই তাঁহার ভাবী

সৌভাগ্যের বীজ বপন করিয়াছিল। কৃষ্ণদাস পাল সাধারণ বাঙ্গালীদিগের ন্যায় যদি গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ পদের প্রলোভন পরিত্যাগে অসমর্থ হইতেন, তবে আর তাঁহার নামের ধ্বনিতে সমগ্রভারত কথনও নিনাদিত হইত না। বঙ্গদেশে কৃষ্ণদাস পাল নামে যে কোন লোক জন্মিয়া ছিলেন, তাহাও জনসাধারণ জানিতে পারিতেন না। কৃষ্ণদাস পালের জীবনের এই ঘটনা বাঙ্গালীদিগের সর্ব্বতোভাবে অনুকরণের উপযুক্ত। উচ্চাভিলাষ শূন্য ক্ষুদ্রাশয় বাঙ্গালীর জীবনের কোন উচ্চ লক্ষ্য নাই। কৃষ্ণদাসের জীবনী স্পষ্টাক্ষরে শিক্ষা দিতেছে যে, যাহার জীবনে উচ্চ লক্ষ্য নাই, উচ্চাভিলাষ নাই, তাহার মধ্যে মনুষ্যত্বও নাই।

১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের সময় হইতেই কৃষ্ণদাস পাল হিন্দু পেট্রিয়টে বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দু পেট্রিয়টের সুবিখ্যাত সম্পাদক বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তখন পর্য্যন্ত মৃত্যু হয় নাই। সম্পাদকের ভার এই সময় তাঁহার হস্তেই ছিল। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর কিছু কাল বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হইলেন। তৎপর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণদাস পাল হিন্দুপেট্রিয়টের সম্পাদক হইবার পর, ক্রমেই শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে পেট্রিয়টের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর যে, বিশেষ বিজ্ঞতা সহকারে পেট্রিয়টের সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু তাঁহার পত্রিকার নাম পেট্রিয়ট ছিল বলিয়া তাঁহাকে আমরা পেট্রিয়ট কিম্বা দেশহিতৈষী নামের উপযুক্ত বলিয়া মনে করি না। তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ লোক ছিলেন। অন্যান্য অনেকানেক সদ্‌গুণও তাঁহার মধ্যে ছিল। বঙ্গ সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়া তিনি অনেকানেক লোকের উপকার করিয়াছেন। কিন্তু নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক প্রকৃত দেশহিতৈষীর ন্যায় দেশহিতকর কার্য্যে কখন ব্যাপৃত হয়েন নাই, সর্ব্বদাই হাতের পাঁচ হাতে রাখিয়া কার্য্য করিতেন।

তিনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর কমিসনারের পদে নিযুক্ত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত মিউনিসিপালিটীর কার্য্য করিয়াছেন। একদিকে যেরূপ বঙ্গের অদ্বিতীয় রত্ন মহামান্য শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মিত্র, বিশেষ বিজ্ঞতা সহকারে, স্বীয় পদোচিত কর্ত্তব্যসাধন করিয়া, বাঙ্গালী যে উচ্চ পদের অনুপযুক্ত নহে, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে রায় কৃষ্ণদাসপাল বাহাদুর তদ্রূপ বিজ্ঞতা সহমিউনিসিপালিটীর কার্য্য করিয়া বাঙ্গালীর স্বায়ত্ব শাসনের ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মৃত রায় বাহাদুর কৃষ্ণদাস পাল কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর একটী প্রধান অঙ্গ ছিলেন। লর্ড ইউলিক ব্রাউন (যিনি ইংরাজি ভাষা অপরিজ্ঞাত বাঙ্গালীদিগের নিকট উল্লুক নামেই পরিচিত) কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত হইয়া, বাঙ্গালীদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিবার উদ্যোগ করিলে পর, রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর বিশেষ তেজস্বিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কমিসনারদিগের অধিকার রক্ষার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন।

রায় কৃষ্ণদাস পালের জীবনীলেখক কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরকে দেশহিতৈষীর পরিচ্ছদ প্রদানান্তর সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াই তাঁহার জীবনচরিত খানি শিক্ষাপ্রদ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। রায় কৃষ্ণদাস পালের সমুদয় কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে কেহই তাঁহাকে দেশহিতৈষী বলিয়া স্বীকার করিবেন না। কিন্তু কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর যে বিশেষ বিজ্ঞতার সহকারে আপন পদোচিত বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের অবলম্বিত এবং তাঁহার প্রতিপদিত রাজনৈতিক কৌশল আমরা যারপর নাই দূষিত এবং ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করি। তিনি বলিতেন, কলে কৌশলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে বশীভূত করিয়া, স্তব স্তুতি দ্বারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট করিয়া, গবর্ণমেণ্ট হইতে এক একটী রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে হইবে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোকদ্দমার পর জাতীয় ভাণ্ডার (National Fund) সংস্থাপনের ঔচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর স্বীয় পত্রিকায় যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাও তিনি ঈদৃশ রাজনৈতিক কৌশল প্রতিপাদন করেন। কিন্তু বিগত কালের ইতিহাস-প্রতিপাদিত শিক্ষা এবং বিগত শতাধিক বৎসরের অভিজ্ঞতা ঈদৃশ রাজনৈতিক কৌশলকে যে কেবল ভ্রমাত্মক বলিয়া সাব্যস্ত করিতেছে, তাহা নহে; ইতিহাস-প্রতিপাদিত শিক্ষা ঈদৃশ কৌশলের অসারতা এবং অপকারিতা স্পষ্টাক্ষরে সপ্রমাণ করিতেছে।

প্রথমতঃ রাজনৈতিক কৌশল নামে অভিহিত বিবিধ কপটাচরণে ইংরাজদিগকে পরাস্ত করিতে পারে, এইরূপ কোন জাতি পৃথিবীতে নাই। কৌশলের পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভারতবাসী জন সাধারণ যে কোন অধিকার লাভ করিবেন, তাহার কোন আশা নাই। হীনবুদ্ধি ভারতবাসীদিগের অপেক্ষা ইংরাজগণ শতগুণে অধিকতর বুদ্ধিমান ও কৌশলী। রাজনৈতিক কৌশল ও কপটাচরণ সম্বন্ধে পাঁচ বৎসর বয়স্ক একটী গ্রাম্য বালক এবং চীনাবাজারের একজন চিরাভ্যস্ত প্রতারকের মধ্যে যে বিভিন্নতা রহিয়াছে, ভারতবাসী এবং ইংরাজদিগের মধ্যে ঠিক তদ্রূপ বিভিন্নতা। সুতরাং রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের প্রতিপাদিত কৌশলের মত যে নিতান্ত অসার, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ অতীত ইতিহাস আমাদিগকে কি শিক্ষা প্রদান করিতেছে? ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শুদ্ধ কেবল অর্থ সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত ভারতে আগমন করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগন রাজ্য লাভের প্রারম্ভে এবং তৎপূর্ব্বে কখনও কখনও সাধারণ দস্যুদিগের ন্যায় এদেশীয় লোকের সম্পত্তি অপহরণ করিতেন। এবং তাহাদিগের ঈদৃশ দস্যুবৃত্তি কোর্ট অব ডিরেক্টর ইংলণ্ডীয় জন সাধারণের নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিতেন। সার্ জন চাইল্ড (Sir John Child) নামে বম্বের একজন গবর্ণর সুরাটে (Surat) দেশীয় বণিকদিগের তেরখানা বাণিজ্যের নৌকার উপর ডাকাতি করিয়াছিলেন। এই বণিক-

দিগের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোন বিবাদ ছিলনা। অর্থ লোভে সাধারণ দস্যুগণ যদ্রূপ ডাকাতি করে, সার্ জন্ চাইল্ড কেবল অর্থাপহরণ করিবার নিমিত্ত ঠিক তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টর এই ডাকাতি গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এ বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। কোর্ট অব একচিকার (Court of Exchequer) সম্মুখে হলপান জবানবন্দিতে এই অপহৃত সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ত্রিশ লক্ষ টাকা সাব্যস্ত হইল। কোম্পানী আপন কর্ম্মচারীদিগকে ঈদৃশ কুকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতেন। কিন্তু পরে এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার কিরূপে নিবারিত হইল? ভারতবাসীগণ কি স্তব স্তুতি করিয়া পুরাতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ঈদৃশ দুর্ব্ব্যবহার হইতে বিরত করিয়াছিলেন? না কোন রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করিয়া এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন?

ইংলণ্ডেশ্বর প্রদত্ত চার্টার অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারত বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার সংস্থাপিত হইল। ইংলণ্ডের অন্যান্য লোককে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য করিতে দিতেন না। সুতরাং ইংলণ্ডবাসী অন্যান্য লোক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার রহিত করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে ঘোর রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। শতাধিক বৎসর যাবৎ এই আন্দোলন চলিতে লাগিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার রহিত করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের জন সাধারণ, ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুষ্ঠিত বিবিধ অত্যাচার, দুর্ব্যবহার, এবং নৃশংসাচরণ ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টের গোচর করিতে লাগিলেন। ঈদৃশ আন্দোলন হইতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার এবং দুর্ব্যবহার দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল। বস্তুত ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে সপ্রমাণ করিতেছে যে, রাজনৈতিক আন্দোলন ভিন্ন প্রতিষ্ঠিত শাসন প্রণালী সংস্কারের অন্য কোন উপায় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার সম্বন্ধে ইংলণ্ডে ঘোর আন্দোলন না হইলে তাহারা কখন ভারতের সুশাসনার্থ কোন সুনিয়ম অবলম্বন করিতেন না।

কিন্তু রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর ঈদৃশ রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই সভ্যতার দিনে কেহ রাজনৈতিক আন্দোলনের উপকারিতা অস্বীকার করিলে তৎক্ষণাৎই তাহাকে অপদস্থ হইতে হয়। সুতরাং পাল বাহাদুর রাজনৈতিক আন্দোলনের উপকারিতা অস্বীকার করিতেন না। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি এক প্রকার স্বতন্ত্র মত প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই স্বতন্ত্র মত, তাঁহার লিখিত জাতীয় ভাণ্ডার (National Fund) সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ এবং হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত অন্যান্য শত শত প্রবন্ধে বিশেষ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পাল বাহাদুর বিশেষ কৌশল পূর্ব্বক বলিতেন যে, যেরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে বাধা প্রদান করে (agitation which embarasses the Government) তাহা পরিহার করিতে হইবে। হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত জাতীয় ভাণ্ডার (National Fund) সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে

কৃষ্ণদাস পাল বলিয়াছেন, জাতীয় ভাণ্ডার সংস্থাপন দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী একটী চিরস্থায়ী পক্ষ সৃষ্ট হইবে, সুতরাং তদ্দ্বারা অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হইবার সম্ভব নাই।

কিন্তু যে সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের অন্যায়াচরণ নিবারণার্থ ঈদৃশ চিরস্থায়ী পক্ষের অভাব রহিয়াছে, সে সকল দেশের রাজনৈতিক সংস্কার কখন সম্ভবপর নহে। চীন এবং পারস্য প্রভৃতি দেশই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। এই সময় পাল বাহাদুর এদিকে গবর্ণমেণ্টের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের মনোরঞ্জনার্থ তাঁহাকে ভারতসভার সভ্যদিগের কার্য্য কলাপের প্রতিবাদ করিতে হইত। কিন্তু আবার একেবারে প্রকাশ্যরূপে গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিলে দেশীয় লোকের উপর পাল বাহাদুরের কোন প্রভুত্ব থাকে না। সুতরাং পাল বাহাদুর অর্থশূন্য প্রলাপ বাক্য দ্বারা এক বাক্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের উপকারিতা এবং অনুপকারিতা উভয়ই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতেন। পাল বাহাদুরের মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করিয়া অমৃত বাজারের সম্পাদক বিশেষ বিজ্ঞতা সহকারে বলিয়াছেন যে, "দুই পক্ষ রক্ষা করিবার চেষ্টা কৃষ্ণদাস পালকে অত্যন্ত সঙ্কটে নিপতিত করিয়াছিল, এবং তদ্রূপ সঙ্কটাপন্নাবস্থাই কৃষ্ণদাসের অকাল মৃত্যুর অন্যতর কারণ।"

রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর কখনও দেশহিতৈষী ছিলেন না। শুদ্ধ কেবল স্বার্থসাধনই তাঁহার একমাত্র চিন্তা ছিল। সুতরাং তাঁহার প্রতিপাদিত রাজনীতিকে আমরা "কৃষ্ণদাসী রাজনীতি" নামে অভিহিত করিয়া জন সাধারণের নিকট ঈদৃশ রাজনীতির অনুপকারিতা সপ্রমাণ করিলাম।

আমরা স্বীকার করি যে, কৃষ্ণদাস পাল হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক স্বরূপ প্রথম কয়েক বৎসর সাধারণের মঙ্গলার্থ বিশেষ তেজস্বিতা সহকারে লেখনি ধারণ করিয়াছিলেন। রোডসেস্ সংস্থাপনের সময় তিনি সার জর্জ কেম্বেলের কার্য্য-কলাপের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে গবর্ণমেণ্টের প্রসাদাকাঙ্ক্ষা, জমিদারদিগের প্রসন্নতালাভ ইত্যাদি নীচ অভিলাষ কৃষ্ণদাসকে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য (Individuality) বিবর্জ্জিত করিয়াছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কৃষ্ণদাস পাল একেবারে জমিদারদিগের বেতনভোগী ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের দশ আইন জারির পর, প্রজা এবং ভূম্যধিকারিদিগের মধ্যে কিঞ্চিৎ মনোভঙ্গ উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইল। ঈদৃশ মনোভঙ্গ ১৮৭৩ সনের পাবনা প্রজাবিদ্রোহের পর দিন দিন ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাগুপ্ত ১৮৭৩ সনের পর রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর জমিদারদিগের উকীল স্বরূপ কেবল জমিদারদিগের পক্ষই সমর্থন করিতেন। প্রজার মঙ্গলের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না।

রায় কৃষ্ণদাস পালের জীবনচরিত লেখক বাবু রামগোপাল সান্ন্যাল তাঁহার প্রণীত পুস্তকের ১৬৭ এবং ১৬৮ পৃষ্ঠায় প্রজা ভূম্যধিকারী আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস পালের সুদীর্ঘ বক্তৃতা হইতে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া, কৃষ্ণদাস পালের নিরপেক্ষতা সপ্রমাণ করিবার

চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু রামগোপাল বাবু একটু অল্প কষ্ট স্বীকার করিয়া কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের সমুদয় বক্তৃতাটী পাঠ করিলে, পাল বাহাদুরের বক্তৃতার প্রাগুপ্ত কয়েকটা কথা উদ্ধৃত করিতে কখনও সাহস করিতেন না। রামগোপাল বাবুর পুস্তকের প্রধান দোষ এই যে, এই পুস্তকে পাল বাহাদুরের কোন কোন বক্তৃতার দুই একটী কথা মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণদাস পালের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রমাত্মক সংস্কার উপস্থিত হইবার সম্ভব।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ—ব্যবস্থাপক সমাজে প্রজা ভূম্যধিকারী আইনের পাণ্ডুলিপির সমালোচনা আরম্ভ হইলে পর, প্রথমত ইলবার্ট সাহেব কৌন্সিলে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত উপলক্ষে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিলেন। তৎপরে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে বিবিধ আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক আপন বক্তব্য বিষয় বলিতে লাগিলেন। পাল বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে বলিলেন, তিনি কেবল জমিদারদিগের স্বার্থ সমর্থনার্থ কৌন্সিলে উপস্থিত হয়েন নাই, কোটী কোটী প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতিও তাহার দৃষ্টি রহিয়াছে। কিন্তু তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে প্রজার স্বার্থ সমর্থনের একটী কথাও ছিল না। জমিদারগণ কখনও কখনও গবর্ণমেণ্টকে ঋণ প্রদান করিয়া সাহায্য করেন, জমিদারগণ বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে মুক্ত হস্তে চাঁদা প্রদান করিয়া গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য করেন, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকে প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে ক্ষমতা প্রদান করিলেই ভাল হয়; এইরূপ কতকগুলি অসার কথা তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে ছিল। রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের বক্তৃতা শেষ হইবা মাত্রই উদারচেতা মেজর বেয়ারিং রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের প্রতি বিশেষ অবজ্ঞা প্রকাশ পূর্ব্বক পরিহাসচ্ছলে বলিলেন,—

"রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে বলিয়াছিলেন যে, তিনি প্রজা ভূম্যধিকারী উভয়ের স্বার্থ সমর্থন করিবেন। কিন্তু তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতার মধ্যে প্রজার স্বার্থ সমর্থনের একটী শব্দও শুনিতে পাইলাম না। তিনি যাহা কিছু বলিলেন, তৎসমুদয়ই জমিদারের পক্ষ সমর্থন করে।" ইত্যাদি (১৮৮৩ সনের মার্চ্চ মাসের ইণ্ডিয়া গেজেট দ্রষ্টব্য)

জমিদারদিগের স্বার্থ রক্ষার আগ্রহাতিশয় রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরকে কখনও কখনও ন্যায় ও বিবেকের পথ ভ্রষ্ট করিয়াছে। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁইতি (কাঁথি) সব ডিবিসনের খাষ মহলের প্রজাদিগের কর বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে যখন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বিবিধ অন্যায় উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণদাস পাল গবর্ণমেণ্টের একজন বিশেষ সাহায্যকারী হইলেন। খাষ মহলের কর বৃদ্ধির আইনে কৃষ্ণদাস পাল সম্মতি প্রদান করিলেন। আমিরআলী কেবল এই আইন সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশের মতানুসারে এই অন্যায় আইন বিধিবদ্ধ হইল। কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের কোন বন্ধু তাঁহার নিকট লিখিলেন, ঈদৃশ অন্যায় আইনে তিনি কিরূপে সম্মতি প্রদান করিলেন? প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণদাস পাল লিখিলেন যে,

গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগকেও ঈদৃশ কর বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রদানার্থ শীঘ্রই নূতন আইন জারি করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সুতরাং জমিদারদিগের স্বার্থের অনুরোধে তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইয়াছে। এই গোপনীয় বিষয় কাহারও জানিবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের মৃত্যুর পর ইণ্ডিয়ান মিররের কোন পত্র প্রেরক এই বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়টী কতদূর সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারিনা। কিন্তু এই ঘটনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ রহিয়াছে। এই ঘটনা যদি সত্য হয়, এবং ইণ্ডিয়ান মিররের সংবাদদাতা যদি মিথ্যা কথা প্রকাশ করিয়া না থাকেন, তবে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর যে কিরূপ দেশহিতৈষী ছিলেন, তাহা জন সাধারণ সহজেই বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

আদালত অবজ্ঞার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় দণ্ডিত হইলে পর, কৃষ্ণদাস পাল ইণ্ডিয়ান মিরর এবং ষ্টেটস্‌ম্যানের সম্পাদকের ন্যায়, বিশেষ আগ্রাহাতিশয় সহকারে সুরেন্দ্র বাবুর পক্ষাবলম্বন করেন নাই, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার ঔদাসীন্য দর্শনে যখন দেশের সমগ্র লোক তাঁহার প্রতি হতশ্রদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন তিনি স্বীয় পদ সংরক্ষণার্থ ক্ষীণ স্বরে দুই চারি কথা লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

লর্ড লিটনের প্রণীত মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের আইন (Vernacular Press Act) রহিত করাইবার উদ্দেশ্যে ভারতসভা বিশেষ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর ভারতসভার সঙ্গে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ মাত্রও সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের আইন রহিত করাইবার নিমিত্ত কৃষ্ণদাস পাল কিঞ্চিৎ মাত্রও চেষ্টা ও যত্ন করেন নাই।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের আইন (Vernacular Press Act) বিধিবদ্ধ হইলে পর, কৃষ্ণদাস পাল পেট্রিয়টে লিখিলেন—

"And when it is remembered that the Government is now presided over by a statesman, who is himself a votary of literature, and an advocate of free speech and writing, and that he takes the responsibility of the measure, the reader may rest assured that His Excellency would not have moved in the matter, without good and valid reason. It cannot be denied that the fate, which has evertaken the Vernacular Press is greatly due to the follies and indiscretions of many of its unworthy members."—অর্থাৎ যখন দেখা যায় যে, লর্ড লিটনের ন্যায় সাহিত্যোপাসক এবং স্বাধীনতা সমর্থক এইরূপ আইন জারি করিয়াছেন, তখন পাঠকগণ জানিবেন যে, বিশেষ এবং উপযুক্ত কারণ না থাকিলে লর্ড লিটন এই আইন জারি করিতেন না। দেশীয় সম্পাদকদিগের এই দুর্ভাগ্য শুদ্ধ কেবল তাহাদিগের মধ্যের অনুপযুক্ত সম্পাদকমণ্ডলীর কার্য্যকলাপের ফল।

আমরা এই স্থানে কৃষ্ণদাস পালের ভক্তদিগকে এবং কৃষ্ণদাসী রাজনীতির অবলম্বিদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের আইনের কি সত্য সত্যই কোন প্রবল কারণ ছিল? মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের আইনের পাণ্ডুলিপি কৌন্সিলে সমালোচিত হইবার সময়, তৎ-

কালের কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর হাই-কোর্টের বারিষ্টার পল সাহেব, সুলভ সমাচার, সাধারণী এবং অমৃত বাজার প্রভৃতি বাঙ্গালা পত্রিকা হইতে কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে, এই সকল কথা রাজবিদ্রোহ প্রতিপাদক। কিন্তু পল সাহেবের উদ্ধৃত কথা কয়েকটী কি সত্য সত্যই রাজবিদ্রোহ প্রতিপাদক ছিল? পল সাহেবের উদ্ধৃত কথা কয়েকটী—ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের পক্ষপাতিত্ব প্রতিপাদক ছিল। কিন্তু কোন এক ইংরাজ কর্ম্মচারির পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন কথা বলিলেকি তাহা রাজবিদ্রোহ প্রতিপাদক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে? যদি তাহাই হয়, তবে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, হণ্ট ম্যাকেঞ্জি, সার চার্লস মেটকাফ, জন ফ্রেডেরিক সোর প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভারত রাজনীতি বিশারদগণ অত্যন্ত রাজবিদ্রোহী ছিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্টের কমিটার সম্মুখে স্বীয় সাক্ষ্য-বাক্যে বলিয়াছেন যে ভারতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা মুসলমানদিগের গবর্ণমেণ্ট অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর ছিল। সার জন ফ্রেডেরিক সোরের (Notes on Indian affairs) নামাঙ্কিত পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের কুকার্য্য গোপন করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু ক্ষুদ্র বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগের লঘু দোষে গুরুদণ্ড প্রদান করেন। হণ্ট ম্যাকেঞ্জি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি বিশেষ দূষিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, দেশীয় লোক উপযুক্ত হইলে তাঁহাদিগকে উচ্চ পদ প্রদান করা যাইবে, এই কথার অর্থ এই যে, দেশীয় লোকদিগকে কখনও উচ্চ পদ প্রদান করা হইবে না। কারণ অগ্রে তাহাদিগকে উচ্চ পদ প্রদান করিয়া উচ্চ পদের উপযুক্ত করিবার চেষ্টা না করিলে, তাহারা কখনও উচ্চ পদের উপযুক্ত হইবে না। বস্তুত ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দেশীয় লোকদিগকে সর্ব্ব প্রকার রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া যেরূপ দুরবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহাতে দেশীয় সম্পাদকগণ বিশেষ তীব্রভাবে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ সমালোচনা করিলে যে তাহাদিগের বড় অপরাধ হয়, তাহা কোন সহৃদয় লোক মনে করিতে পারেন না। কিন্তু রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন যে "উপযুক্ত কারণাভাবে লর্ড লিটন দেশীয় সম্পাদকদিগের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের আইন দেশীয় সম্পাদকদিগের নিজের কুকার্য্যের ফল।"

এইতো বাবু রামগোপাল সান্যালের পরমারাধ্য দেশহিতৈষীর ছবি!!!

রামগোপাল বাবু রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরকে বিশেষ বিজ্ঞ, উপযুক্ত এবং কার্য্যদক্ষ লোক বলিয়া যদি কেবল প্রশংসা করিতেন, তবে আমরাও তাঁহার মতে সম্মতি প্রদান করিতাম। কিন্তু রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরকে তিনি দেশহিতৈষী নামে অভিহিত করিয়াই দেশহিতৈষী নাম কলঙ্কিত করিয়াছেন।

ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের সময় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর স্বীয় দলবল সহ কেসউইক, হেনরী বেল এবং ব্রানসন প্রমুখ দলের সঙ্গে যোগ প্রদান করিয়া প্রজা ভূম্যাধিকারী আইনের পাণ্ডুলিপি প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। ইলবার্ট বিলের

আন্দোলন উপলক্ষে যাহারা ভারতবাসী-দিগকে মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, নীচাশয় এবং অসভ্য বলিয়া সহস্রবার গালি বর্ষণ করিয়াছে, স্বার্থের অনুরোধে তাহাদিগের সঙ্গে সম্মিলিত হইলে কতদূর নীচাশয়তা প্রকাশ পায়, তাহা পাঠক মাত্রেই সহজে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

পরলোকগত কৃষ্ণদাস পালের বিরুদ্ধে আমরা কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাব পোষণ করি না। কৃষ্ণদাস পালের যে সকল সদ্‌গুণ ছিল, তাহা আমরা বারম্বার স্বীকার করিয়াছি। মৃত লোকের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অবজ্ঞাসূচক বাক্য প্রয়োগ করাকে আমরা অন্যায় বলিয়া মনে করি। কিন্তু সত্যের অপলাপ ও ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করা তদপেক্ষা অধিকতর অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদিগকে উল্লেখ করিতে হইল।

পরলোকগত পরম বিজ্ঞ রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর এখন জীবন্মুক্ত হইয়া স্বর্গ রাজ্যে বিরাজ করিতেছেন। এখন আর কোন প্রকার সংসারের স্বার্থপরতা তাঁহার বিচার শক্তিকে কলুষিত করিতে পারে না। সুতরাং স্বর্গ রাজ্যে বিরাজিত রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের এখন এই সংসার-বাসী লোকের সঙ্গে কথা বলিবার সাধ্য থাকিলে, তিনি নিজেই সংসারে অবতরণ পূর্ব্বক বলিতেন—"Paint me as I was for the sake of truth and fair play."

শ্রীচ :—

বাঙ্গালীর খাদ্য--আমিষ ভক্ষণ। (১)

অধুনা বাঙ্গালির খাদ্যাখাদ্য লইয়া কতক পরিমাণ আন্দোলন হইতেছে, ইহা যে একটী সুলক্ষণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ বাঙ্গালির উপযুক্ত খাদ্য নিরূপিত হইলে, ও সেই খাদ্য ব্যবহৃত হইলে, জাতীয় উন্নতির অনেক আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বিষয়টী যেরূপ গুরুতর এই আন্দোলনে তদপযুক্ত মনো-যোগ দেওয়া হইতেছে না, এবং সমুদয় বিষয়টী যথেষ্টরূপে আন্দোলিত না হইয়া কেবল আমিষ ভক্ষণের আপত্তি উত্থাপন করাই যেন উহার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। প্রায় সকল বিষয়ের আলোচনার উদ্দেশ্যানুসারে যুক্তি ও পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে; অতএব তর্ক দ্বারা কোন একটী বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, পুর্ব্বে উভয় পক্ষের সাধারণ উদ্দেশ্য কি, তাহা স্থির করিয়া লওয়া উচিত। খাদ্য বিষয়ক আলোচনা করিতে হইলে শারীরিক উন্নতি, মানসিক উন্নতি, বা অধ্যাত্মিক উন্নতি ও জাতীয় বা ব্যক্তিগত উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে কি না, তাহা স্থির করা উচিত। কারণ কেহ কেহ বলেন, কোন প্রকার খাদ্য দ্বারা শারীরিক উন্নতি হইলেও মানসিক উন্নতি হইবে না; কেহ বলেন এক প্রকার খাদ্য ব্যবহার

করিলে আধ্যাত্মিক অধোগতি হইবে সুতরাং তাহা ব্যবহার করা উচিত নহে। অপর কেহ কেহ আবার খাদ্য বিষয়ে ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি তাহা অনুমান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। জীব হিংসা করা পাপ, সুতরাং মাংস ভোজনেও পাপ হয়, এরূপ সিদ্ধান্তও অনেক করিয়া থাকেন। প্রাচীন হিন্দুগণ নিরামিষ ভোজী ছিলেন, সুতরাং আধুনিক হিন্দুগণ কেন আমিষ ভক্ষক হইবেন, এরূপ আপত্তিও উত্থাপিত হয়।

স্বর্গীয় মহামতি অক্ষয়কুমার দত্ত আমিষ ভক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক গ্রন্থ মধ্যে মত প্রকাশ করিবার পর অবধি ঐ বিষয়ে অনেকানেক মত প্রকাশিত হইয়াছে।

উল্লিখিত বিষয় সকলের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মনুষ্যের সাধারণ খাদ্য সম্বন্ধীয় কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। মনুষ্যের খাদ্য কি? যে সমস্ত বস্তু উদরস্থ হইলে মানবদেহের জীর্ণসংস্কার হয়, ব্যয়িত তেজ পুনঃ সঞ্চিত হয়, দেহের বিধান সকলের অভাব মোচন হয়, ও তাহাদিগের উন্নতি ও বৃদ্ধি হয়, এবং তাহা কর্ম্মক্ষম হইয়া থাকে; অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তু উদরস্থ হইয়া পরিপাক হইলে দেহের ক্ষয় হ্রাস হয়, ও মনুষ্য উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত আপন কর্ত্তব্য সাধনে শক্তিশালী হয়,তাহাই মনুষ্যের প্রকৃত খাদ্য।

মানব দেহের রাসায়নিক উপাদান সমূহের বিষয় আলোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, এই নরদেহ নানা প্রকার ধাতব, উপ-ধাতব ও জৈবনিক পদার্থের সংমিশ্রনে গঠিত। আরও দৃষ্ট হয় যে, ঐ সমুদয় পদার্থের তুল্য পদার্থ ভূমণ্ডলের প্রায় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং মনুষ্যের অভাব মোচনের বিশেষ বিঘ্ন প্রায় ঘটিবার কারণ নাই।

দন্তহীন চর্ব্বণশক্তি-বিহীন অসহায় শিশুর পুষ্টির নিমিত্ত বিধাতা স্তন্য দুগ্ধ সৃজন করিয়াছেন। শিশুর শরীরের পুষ্টি-সাধন মাতার স্তন্য দুগ্ধ দ্বারা সুসম্পন্ন হয় দেখিয়া, সুবিখ্যাত প্রাউট সাহেব স্থির করেন যে, ঐ দুগ্ধে যে যে সামগ্রী আছে, সেই সেই সামগ্রী দ্বারাই মানব দেহ পরি-পুষ্ট ও রক্ষিত হইবে। পরে তিনি সেই দুগ্ধের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া স্থির করেন যে, উহাতে চারি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পদার্থ বিদ্যমান থাকে, যথা—

১। পনিরময়, অর্থাৎ যাহা হইতে ছানা উৎপন্ন হয়।

২। শর্করাময়, যাহা হইতে দুগ্ধের মিষ্টতা জন্মে।

৩। তৈলময়, যাহা হইতে মাখন, ঘৃত জন্মে।

৪। ধাতব ও উপধাতব সামগ্রী, যাহা জলের সহিত মিশ্রিত থাকে।

এই চারি প্রকার সামগ্রীর মধ্যে পনির-ময় অংশ যবক্ষারজান বিশিষ্ট (nitrogenous) ২য় ও ৩য় যবক্ষারজান শূন্য পদার্থ।

মনুষ্যের খাদ্যে ঐ চারি প্রকার পদার্থই থাকা আবশ্যক। শরীরপোষণের নিমিত্ত ঐ চারি প্রকার পদার্থই আবশ্যক কিনা, তাহা স্থির করিবার জন্য অনেকা-নেক পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহা হইতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, কেবল যবক্ষারজান-ময় ও জলমিশ্রিত ধাতব উপধাতব পদার্থ

দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না; ঐ সমুদয় পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্বেত সারময় ও তৈলময় পদার্থ ব্যবহার দ্বারাও স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না; শ্বেতসার ও শর্করা পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল সুস্থ থাকিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তৈলময় পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল যবক্ষারজানময় (য়্যালবুমিনেট) শ্বেতসার, জল ও লবণাক্ত পদার্থ ব্যবহার করিয়া মনুষ্য যে সুস্থ থাকিতে পারে, তাহা প্রমাণিত হয় নাই। আবার জল ও লবণাক্ত পদার্থ ব্যতিরেকে জীবন রক্ষা করা যায় না।

ডাক্তার প্লেফেয়ার, পার্কস, পেভি, লেথবি ও স্মিথ ইত্যাদি পণ্ডিতগণ সকলেই যবক্ষারজানময় পদার্থের আবশ্যকতা সপ্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহারা আরও স্থির করিয়াছেন যে, ঐ চারি প্রকার খাদ্য নিরুপিত পরিমাণে মিশ্রিত না হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না; একের পরিমাণ অতিরিক্ত হইলে অপরের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে।

তাঁহাদিগের দ্বারা আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে, একজন ইউরোপীয় মধ্যমাকার পরিশ্রমী পুরুষের দেহ হইতে প্রতি দিবস প্রায় ৩০০ গ্রেন যবক্ষারজান ও ৪৬০০ গ্রেণ অঙ্গার, মল মূত্র এবং ঘর্ম্ম দ্বারা বহির্গত হয়। সুতরাং এরূপ খাদ্য ব্যবহার করা আবশ্যক, যদ্দ্বারা দেহ মধ্যে ঐ দুই পদার্থ ঐ পরিমাণে প্রবিষ্ট হইতে পারে। তজ্জন্য কত য়্যালবুমিনেট ও কত তৈলময় এবং কত শ্বেতসারময় খাদ্য ব্যবহার করা আবশ্যক, তাহাও তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে,—

১। মনুষ্যের দেহভারের হ্রাস বৃদ্ধ্যনুসারে খাদ্যের হ্রাস বৃদ্ধি করা আবশ্যক, নচেৎ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে।

২। মনুষ্যের পরিশ্রমের সহিত খাদ্যের পরিমাণের বিশেষ সম্বন্ধ থাকে; সুতরাং একের বৃদ্ধি হইলে অন্যের বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক।

৩। শ্রম বিমুখাবস্থায় কেবল দৈহিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হেতু যে তেজ ব্যয়িত হয়, তদনুযায়ী সামান্য খাদ্য ব্যবহার করাই বিধেয়।

৪। জলবায়ু, ঋতু ও ব্যক্তিগত ধাতু ও প্রকৃতি অনুসারে ঐ পরিমাণের কতক তারতম্য আবশ্যক হইয়া থাকে।

উল্লিখিত উপদেশানুসারে আমরা, বঙ্গবাসীর দেহায়তন, ও দেহভার ও কর্ম্মণ্যতা বিবেচনা করিয়া অনুমান করিয়াছি যে, মধ্যমাকার কর্ম্মক্ষম ও বলিষ্ঠ বঙ্গবাসীর দেহ হইতে প্রতি দিবস ২২০ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৩৫০০ গ্রেণ অঙ্গার বহির্গত হয়। অতএব বাঙ্গালীর এরূপ খাদ্য ব্যবহার করা আবশ্যক যাহাতে ঐ ক্ষতিপূরণ হইয়া শরীর সুস্থ থাকিতে পারে।

তৎপরে কতকগুলি দেশীয় খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছি যে, (১) /২ সের দুগ্ধ, ৩ ছটাক ময়দার রুটি ও ১ ছটাক চিনি ব্যবহার করিলে প্রায় ২৪৭ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৩৮০০ গ্রেণ অঙ্গার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে; ইহাতে ঐ দুই পদার্থের পরিমাণ সামঞ্জস্য মত থাকে। তৎপরে (২) এক পোয়া চাউল, ৩ ছটাক ময়দা, ২½ ছটাক ডাইল, ৩ ছটাক মৎস্য, কিছু আনাজ ও ঘৃত আহার করিলেও প্রায় ২১৫ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৩৮৯০ গ্রেণ অঙ্গার উদরস্থ হইতে পারে। (৩) /২ সের দুগ্ধ ও এক

পোয়া চাউলের অন্ন ও এক ছটাক চিনি ব্যবহার করিলেও ২২৮ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৪২০০ গ্রেণ অঙ্গার উদরস্থ হইতে পারে। এবং(৪)৬ ছটাক চাউল ও ডাইল খিচ্‌ড়িরূপে ব্যবহৃত হইলে ২২২গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৪৩০০ গ্রেণ অঙ্গার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। (৫) আরও দেখিয়াছি যে ৮ ছটাক চাউলের অন্ন ও ৮ ছটাক মাংস ও অর্দ্ধ ছটাক ঘৃত ও উপযুক্ত পরিমাণ লবণ ব্যবহার করিলে ২২৮ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৪২০০ গ্রেণ অঙ্গার ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য যেরূপ খাদ্য ব্যবহার করি না কেন,তাহাতে যবক্ষারজানের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প ও অঙ্গারের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হইবেই হইবে। সুতরাং দেহে মেদ সঞ্চিত হইবে ও ক্রমে মেদাপকৃষ্টতা জন্মিবে। যাহারা অধিক শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহাদের শরীরে ঐ মেদ অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে পারে না। কিন্তু যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করেন না, অথচ অধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, তাহাদের মেদাপকৃষ্টতা ও অন্যান্য গুরুতর স্নায়বীয় পীড়া জন্মে।

এক্ষণে বুঝিলাম যে বৈজ্ঞানিক মতে—

১। প্রত্যেক সুস্থ, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী প্রাপ্তবয়স্ক বঙ্গবাসীর শরীরে গড়ে ২২০ গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৩৫০০ গ্রেণ অঙ্গার-বিশিষ্ট খাদ্য প্রবিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

২। ঐ যবক্ষারজান অপেক্ষা অঙ্গার ১৬ গুণ অধিক হওয়া আবশ্যক।

৩। প্রত্যেক খাদ্যের তালিকায় ১ ভাগ যবক্ষারজান বিশিষ্ট খাদ্য থাকিলে প্রায় ৪½ ভাগ শ্বেতসারময় এবং এভাগ তৈলময় পদার্থ থাকা আবশ্যক।

৪। অধিক শারীরিক পরিশ্রম করিলে, সকল পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে তন্মধ্যে অঙ্গার অংশ অপেক্ষাকৃত অধিক হইবে। এবং অধিক মানসিক পরিশ্রম করিতে হইলে যবক্ষারজানের পরিমাণ কিছু অধিক বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৫। ঋতু অনুসারে খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। গ্রীষ্মকালে তৈলময় ও শর্করাময় পদার্থের পরিমাণ হ্রাস ও শীতকালে ঐ সকল পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

৬। অসুস্থ বা অলসাবস্থায় এবং বার্দ্ধক্যে যে সকল প্রকার খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করা ও ভিন্ন ভিন্ন উপকরণের পরিমাণের তারতম্য করা আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

খাদ্যসম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মগুলি অবগত হওয়া গেল; এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক কিরূপ খাদ্য ব্যবহার করে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারিব যে, ঐ সাধারণ নিয়ম কিরূপে ও কি পরিমাণে অবস্থিত হয় ও জলবায়ু বা অন্য কোন কারণে কি পরিমাণে উহার বিপরীতাচরণ ঘটে ও তাহার ফল কি?

ইংলণ্ডের কৃষক প্রতিদিন গড়ে ১৪ ছটাক রুটি, ৭ ছটাক আলু, ১½ ছটাক চিনি, ১ ছটাক মাংস,২½ ছটাক দুগ্ধ,এক ছটাকের কিঞ্চিদধিক পনির ও তৈলাক্ত পদার্থ আহার করে; তদ্বারা মোট ৫৮১০ গ্রেণ অঙ্গার ও ২২৭ গ্রেণ যবক্ষারজান দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সেইরূপ ওয়েলস্, স্কটলণ্ড, ও আয়রলণ্ড নিবাসী কৃষকের খাদ্যে ঐ সামগ্রী যে পরিমাণে থাকে, তদ্দ্বারা ক্রমান্বয়ে ৬৯০০, ৭০০০, ৬২০০ গ্রেণ অঙ্গার ও ২৯০, ৩৩৪ ও ৩৪৭ গ্রেণ যবক্ষারজান উদরস্থ

হয়। ইহারা দরিদ্র ও যথেষ্ট খাদ্য প্রাপ্ত হয় না, এজন্য ইহাদিগকে লোফেড (low-fed) বলা হয়। ইউরোপের উত্তমরূপে পরিপুষ্ট পরিশ্রমী ব্যক্তির খাদ্যে গড়ে ৫.৮ ভাগ যবক্ষারজানময়, ২.৪ ভাগ তৈলময়, ও ১৮.৬ ভাগ শ্বেতসারময় দ্রব্য থাকে, ও তাহা হইতে ৫৮৩৭ গ্রেণ অঙ্গার ও ৪০০ গ্রেণ যবক্ষারজান উদরস্থ হয়।

ল্যাপল্যাণ্ড, গ্রিণল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড ইত্যাদি মেরুপ্রদেশের ও মধ্য আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, পেরু, ব্রেজিল, ইত্যাদি উষ্ণপ্রধান দেশের লোকের খাদ্যের মধ্যে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উত্তর আমেরিকার এসকুইমো জাতীয় লোক প্রায় সম্পূর্ণ মাংসভোজী এবং তাহারা বসা ও তৈলাক্ত পদার্থ অতিশয় ভালবাসে।

আইসল্যাণ্ডনিবাসীগণ প্রায় মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। গ্রীষ্মকালে দুগ্ধ ও মাখন ব্যবহার করে, কিন্তু রুটি কি অন্য কোন উদ্ভিদ পদার্থের অত্যন্ত অনাটন, তজ্জন্য দরিদ্র লোকেরা স্কার্ভি নামক রোগে রুগ্ন হয়। সাইবিরিয়া নিবাসীরা রেন্‌ডিয়ার নামক মৃগ ও মৎস্য খাইয়াই জীবনধারণ করে, রুটী দুষ্প্রাপ্য। মেক্সিকোনিবাসীগণ প্রায় নিরামিষভোজী; তাহারা কৃষিকর্ম্মদক্ষ ও তদুৎপন্ন ফল শস্য ব্যবহার করিয়াই জীবন ধারণ করে; কখন কখন পক্ষী বা শুকরের মাংস খাইয়া থাকে।

অষ্ট্রেলিয়া নিবাসীগণ প্রায় সর্ব্বপ্রকার মাংসই ভক্ষণ করিয়া থাকে; তাহারা আরও নানা প্রকার উদ্ভিদ—বৃক্ষের ত্বক্, শিকড়, কোমল পত্র ইত্যাদি ভক্ষণ করে। নবজিলণ্ডনিবাসীগণও উভয় প্রকার খাদ্য ব্যবহার করে।

চীনেরা খাদ্যবিষয়ে কোন আপত্তি করে না; পুষ্টিকর সামগ্রী মাত্রই তাহাদিগের খাদ্য। আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার শ্রেণীস্থ বস্তুই তাহাদিগের সমান খাদ্য।

জাপানদেশীয় লোক চাউল, ডাইল, পক্ষীমাংস, তিমি, চিঙ্গিড়ী ও অন্যান্য মৎস্য, কর্কট ও অন্যান্য মাংস ব্যবহার করে।

মিসরবাসীরা উদ্ভিজ্জাত পদার্থ ও মাংস, এতদুভয় প্রকার খাদ্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

নিউবিয়া-নিবাসীরা প্রায় কেবল মাংস ভক্ষণ করে; উষ্ট্রমাংস ও দুগ্ধ তাহাদের প্রধান খাদ্য।

আবিসিনীয়ার অধিবাসীগণ কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিতে বিশেষ ভালবাসে।

উল্লিখিত উদাহরণ সমুদয় হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খাদ্য ব্যবহার করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে মানব কেবল নিরামিষভোজী; কোথাও বা আমিষভুক, অনেকস্থলেই মিশ্রভুকরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ইয়ুরোপ, আমেরিকা, চীন ও জাপান ইত্যাদি সভ্য দেশেও আমিষ ভক্ষণ চলিতেছে। কেবল মেক্সিকো নিবাসীগণ প্রায় নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকে।

এই বিষয়ে ডাক্তার পেভি তাঁহার ((Food and Dietetics) নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল।

"It is upon a due admixture of the two that the principle of adjustment is founded and as nitrogenous principles preponderate in animal food, and the carbonaceous or non-nitrogenous in vegetable, we see that the teachings of science harmonize with the instinctive propensity which in-

clines man so universally to the employment of a mixed diet, whenever the circumstances under which he is placed admit of its being obtained." p. 472. "Food and dietetics."—

"Instances are to be found where life is sustained upon a wholly vegetable, a wholly animal, and a mixed diet. The mixed diet, however, may be regarded as that, which, in the place of nature, is designed for man's subsistance. It is upon this that he appears to attain the highest state of physical development and intellectual vigour. It is this which certainly in temperate climates he is led to consume by general inclination when circumstances allow the inclination to guide him, and lastly it is this which stands in conformity with the construction of his teeth and the anatomy of his digestive apparatus in general."

"Notwithstanding these considerations there are those but few in number it is true—who contend that vegetable food alone is best adapted to meet our requirements, under the style of vegetarians they act upon the principle they prefer." p. 491. "Food and Dietetics" by Dr. Pavy. M. D. F. R. S. F. R. C. P.

"এই উভয় প্রকার খাদ্যের যথোচিত মিলনেই যবক্ষারজান ও অঙ্গারের সামঞ্জস্য হইতে পারে এবং যেহেতু আমিষ খাদ্যে যবক্ষারজানময় পদার্থের পরিমাণ অধিক ও উদ্ভিজ্জে অঙ্গারক পরিমাণ অধিক, আমরা দেখিতে পাই যে, বৈজ্ঞানিক উপদেশ মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত এমন সামঞ্জসীভূত হইয়াছে যে, প্রবৃত্তির অনুগত হইয়া মনুষ্য মিশ্র খাদ্য ব্যবহার করিবার সুযোগ থাকিলেই তাহা ব্যবহার করে।"

"কেবল নিরামিষ, কেবল আমিষ, মিশ্র খাদ্য ব্যবহার দ্বারা যে জীবন রক্ষা করা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্বভাবের সৃষ্টি কৌশলে পরিদর্শন করিলে বোধ হয়, মিশ্র খাদ্যই মনুষ্যের জীবন ধারণের জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। এই খাদ্যই ব্যবহার করিয়া মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৈহিক উন্নতি ও মানসিক তেজ লাভ করে। অন্যান্য ঘটনা ঐ প্রবৃত্তির বিরোধী না হইলে, সমশীতোষ্ণ দেশে মনুষ্য নিশ্চয়ই সাধারণ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া এই মিশ্র খাদ্য ব্যবহার করে। কারণ, এই উভয়বিধ খাদ্যই মনুষ্যের দন্ত ও পাচকযন্ত্র সমুদয়ের গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর উপযোগী বলিয়া বোধ হয়।"

"এই সমুদয় কারণ সত্ত্বেও অতি অল্প সংখ্যক লোক আছেন, যাঁহারা বলেন যে, কেবল নিরামিষ খাদ্যই আমাদের যথাবশ্যক পুষ্টিসাধনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী; এবং নিরামিষভোজী নামে তাঁহারা আপনাদের মতের অনুগমন করেন।"

ঐ বিষয়ে ডাক্তার পার্কস্ বলেন,—"জান্তব ও উদ্ভিজ্জ অ্যালবুমিনেটের সমাস অত্যন্ত সদৃশ এবং তাহারা দেহমধ্যে সমান উদ্দেশ্য সাধন করে। আমিষভুক ও নিরামিষভুক (যাহারা অন্ন দাইল ব্যবহার করে) তাহারা উভয়ই সমপুষ্ট। কিন্তু ইহা অনুমিত হইয়াছে যে, ঐ দুই প্রকার খাদ্য ব্যবহার করিলে দেহের পরিপোষণ ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বা অসমান সময়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে; এবং আমিষভুক ব্যক্তি নিরামিষভুক ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী বা অধিক হঠাৎ বল প্রকাশে সমর্থ, কারণ নিরামিষ ভোজীর খাদ্যেও ঐ সমুদয় তেজ সমানাংশে বিদ্যমান থাকিলেও তাহা তত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয় না; আমার মতে এইরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট প্রমাণ নাই।"

"ভারতবর্ষে যাহারা অন্ন ও অল্প পরিমাণ দাইল ব্যবহার করে, তাহারা অল্প বল প্রকাশ করে বটে, কিন্তু যাহারা প্রচুর

পরিমাণে শস্য, অন্ন দাইল ব্যবহার করে, তাহারা শিক্ষিত হইলে আমিষভুকদিগের নিকট পরাভূত হইবে না।"

"ডাক্তার বোমাণ্টের পরীক্ষা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, আমিষ খাদ্য নিরামিষ খাদ্য অপেক্ষা শীঘ্র পরিপাক হয়, তজ্জন্য বোধ হয় মাংস, রুটি বা মটর অপেক্ষা শীঘ্র যবক্ষারজানময় পদার্থের জীর্ণ সংস্কার করিতে পারে; এবং ইহাও সত্য হইতে পারে যে, আমিষভুকের দৈহিক বিধান সকলের পরিবর্ত্তন শীঘ্র ঘটে এবং তজ্জন্য তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র আহার করিতে হয়, কিন্তু ইহাও এখনও সম্যকরূপে প্রমাণিত হইয়াছে এমত বোধ হয় না।"

"The chemical composition of animal and vegetable albuminates is very similar and they manifestly serve equal purposes in the body. The meat eater and the man who lives on corn or peas and rice are equally well nourished. But it has been supposed that either the kind or the rapidity of nutrition is different and that the men who feed on meat or the carnivorous animal will be more active and more able to exert a sudden violent effort than the vegetarian or the herbivorous animal whose food has an equal potential energy but which is supposed to be less easily evolved. The evidence in favour of this view seems to me to be very imperfect. And the evidence in men is the same.—In India the ill-fed people on rice and a little millet or pea may indeed show less power but take the welfed corn-eater or even the wellfed rice and pea-eater or and he will show when in training no inferiority to meat-eaters."

"It appears from Dr. Beaumont's experiments that animal food is digested sooner than farinaceous and possibly meat might therefore replace more quickly the wasted nitrogenous tissue than bread or peas, and it may be true as assumed that the change of tissue is more quick in meat-eaters who therefore require frequent supplies of food. Even this however seems to me not yet thoroughly proved." Manual of Hygiene" By Dr. E. A. Parkes. M. D. F. R. S.—p. 184.

ঐ বিষয়ে ডাক্তার স্মিথ যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। নিরামিষ ও আমিষ এতদুভয় প্রকার খাদ্যে সমান পুষ্টিকর সামগ্রী আছে এবং কতক পরিমাণে ঐ দুই প্রকার খাদ্য পরস্পরের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। এই উভয় প্রকার খাদ্যই দুই পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা যবক্ষারজানময় ও যবক্ষার শূন্য মাংসোৎপাদক ও উত্তাপোৎপাদক।

তবে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পরিপোষণ কার্য্যের সম্বন্ধে বাস্তবিক প্রভেদ কি? উহাদিগের পুষ্টিকারিতার তারতম্য লোকের অভ্যাসের উপর নির্ভর করা সম্ভব। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, মাংসে পুষ্টিকর সামগ্রী সমুদয় বিশেষ সুবিধাক্রমে ও সুপাচ্যরূপে বিদ্যমান থাকে। নিরামিষ খাদ্যে অর্থাৎ বীজ সমূহে এমন অনেক দ্রব্য থাকে, যাহাকে বিশেষ প্রকারে জীর্ণ করিয়া পরিবর্ত্তন না করিলে তদ্দারা দেহের পুষ্টি বা জীর্ণসংস্কার হয় না।

ডাক্তার বোমান সাহেবের পরীক্ষা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, রুটি অপেক্ষা মেষ মাংস এবং আলু অপেক্ষা ডিম্ব শীঘ্র জীর্ণ হইবে।

আবার আমিষ ভক্ষণ করিলে যে পরিমাণে খাদ্য আবশ্যক করে, নিরামিষ ভোজন করিতে হইলে তদপেক্ষা অধিক খাদ্যের প্রয়োজন হয়।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে ইহা অনুমিত হইবে যে, যদিও ঐ উভয় প্রকার খাদ্য দ্বারাই প্রাণ ধারণ করা যাইতে পারে—আমিষ খাদ্য অপেক্ষা নিরামিষ খাদ্য দ্বারা জৈবনিক ক্রীয়া সমুদয় অধিক মন্দ মন্দ বেগে হইয়া থাকে, শ্বাস ক্রিয়া, নাড়ীর গতি ও উত্তাপ উৎপাদন বিষয়ে ঐ রূপই ঘটিয়া থাকে। অতএব এই উভয় প্রকার

খাদ্যের তুলনা করিবার সময় ইহা সাধারণত বলা যাইতে পারে যে, নিরামিষ ভোজন করিলে, অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ খাদ্য আবশ্যক হয়, এবং ঐ খাদ্য উত্তম রূপে রন্ধন করা আবশ্যক; এবং উহা জীর্ণ হইবার নিমিত্ত অধিক সময় ও পরিপাক শক্তি আবশ্যক করে এবং ইহা হইতে জৈবনিক ক্রীয়া সমুদয় অপেক্ষাকৃত অধিক ধীরে ধীরে ও অল্প পরিমাণে নিষ্পন্ন হয়।

"It has already been shown that the same nutritive elements exist in both vegetable and animal foods and that within certain limits the two classes of foods are interchangeable. Also that both are divisible into two sub-classes viz:—nitrogenous and non-nitrogenous, fleshformer and heatgiver. —What is the practical difference between them for the purposes of nutrition? It is probable that this depends upon the habits of men. It is however a general rule that while flesh presents the elements of nutrition in a form the most compendious and easy of digestion, seeds are composed of substances which must not only be digested but thoroughly transformed before they can be used for the reparation of the body."

"The experiments of Dr. Beaumont have shown that mutton will be digested more quickly than bread and an egg earlier than potatoe. To this must be added the greater bulk of the vegetable than of animal food is required to provide a given amount of nutriment."

"It will be inferred from the above statement that although the vital actions may be sustained by both kinds they are more slowly moved by vegetable than by animal foods and this is true whether we regard the respiration, pulsation, or heat production: when therefore we compare them it may be stated generally that vegetable food must be eaten in larger volume and be better cooked, than animal food and that it requires a larger period for, and a greater power of digestion while it excites the vital processes more slowly and to a lower degree." P. 144-145. Foods, by Dr. E. Smith, M. D. L. L. B. F. R. S. F. R. C. P.

ঐ বিষয়ে ডাক্তার লেথবি তাঁহার খাদ্য বিষয়ক পুস্তকেও কতক পরিমাণে মাংস ভক্ষণের স্বাপক্ষতা করিয়াছেন। এবং তিনি ডাক্তার লিবিগের মত ও প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"Indeed the instincts and habits of the human race show beyond all question that a comparatively rich nitrogenous diet is necessary for the proper sustenance of life especially when work is performed. It is very probable that nitrogenous matter assists the assimilation of hydrocarbons and in this way they may help in the development of force without contributing directly to it. This may serve to explain the fact that there is always the relation between the amount of nitrogen contained in the food and the labour value of it."

"Again the Hindu Novices who were employed in making the tunnel of the Bhoreghat Railway and who had very laborious work to perform found it impossible to sustain their health on a vegetable diet, and being left at liberty by th[illegible] caste to eat as they pleased they took t[illegible] common food of the English navigator an[illegible] were then able to work as vigourously. According to Liebing it is the rich nitrogenous diet of Englishmen which is the great source of their indomitable energy, *for it is only necessary, he says, to compare* the performance of German workmen who consume bread and potatoes chiefly with those of English and American workmen who eat meat, inorder to acquire a clear perception of the degree in which the magnitude, energy, and duration of the work done by the latter are augmented by the kind of food they live upon." p. p. 71, 72. On Food by H. Lethoby, M. B. M.A. Ph. D.

এতদ্ব্যতীত ডাক্তার কার্পেণ্টার, রিচার্ডসন, উইলসন্, ফদার গিল,ইত্যাদি সকলেই মিশ্র খাদ্য ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন।

এইত বিদেশী বৈজ্ঞানিকদিগের মত, এই মতের নানা প্রকার প্রতিবাদ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটীর বিষয় আলোচনা করা যাউক।

ইতিপূর্ব্বে যে সমুদয় কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহা অনুমিত হইয়া থাকিবে যে; আমরা কেবল আমিষ ভক্ষণের উপযোগিতা দেখাই নাই; তবে বলিয়াছি যে, যদিও মনুষ্য কেবল নিরামিষ

ভোজন করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারে, (যদিও তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই) তথাচ যেমন অন্যান্য সকল বিষয়ে ক্তি ও পরামর্শ দ্বারা একটী প্রশস্ত উপায় অবলম্বিত হয়, তদ্রূপ এ বিষয়টীও বিশেষ অনুধাবন করিলে ও অপক্ষপাতী রূপে আলোচনা করিলে উদ্ভিজ্জের সহিত কতক পরিমাণে আমিষ খাদ্য ভক্ষণ করাই যে সাধারণতঃ শ্রেয়ঃ, ইহাই বোধ হয়। তাহারই কতক প্রমাণ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে যাঁহারা ঐ মতের বিরোধী, তাঁহাদিগের মতের অনুদারতা ও অন্যান্য অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।

(১) কেহ কেহ বলেন যে, নিরামিষ অপেক্ষা আমিষ ভক্ষণে শারীরিক বলবীর্য্য অধিক হয় না,এবং তদ্দৃষ্টান্ত স্বরূপ হিন্দুস্থানীর সাহসিকতাও বলবীর্য্য ইত্যাদির উদাহরণ দিয়া থাকেন। ডাক্তার পার্কসের যে মত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রচুর পরিমাণে উপযুক্ত ফল শষ্য ভক্ষণ করিতে পারিলে নির্বীর্য্য হইবার কারণ নাই; তবে উদ্ভিজ্জ হইতে তেজ বিলম্বে উদ্ভাবিত হয়, ও নিরামিষ খাদ্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিতে হয়, তজ্জন্য অধিক পাচিকা শক্তির আবশ্যক করে ও যতক্ষণ পরিপাক না হয়, ততক্ষণ শরীর অলস হইয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পরে বিচার করুন যে, হিন্দুস্থানীরা যদি বাস্তবিকই বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ, সাহসী ও পরাক্রমশালী হয়, তবে তাহা কি কেবল তাহাদিগের খাদ্যের গুণে, না জলবায়ুর গুণে, না পূর্ব্ব পুরুষদিগের গুণে, না শিক্ষার গুণে, না অন্য কোন কারণে? বঙ্গদেশের শতকরা ৯৫ জন ব্যক্তি বহুব্যাপক ম্যালেরিয়া রোগে জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়াছে, সে দেশের লোক কি ম্যালেরিয়া শূন্য দেশের লোকের সমান হইতে পারে? যে বঙ্গভূমের আর্দ্র ও উত্তপ্ত বায়ু দৈহিক বিধান সকলকে এককালে অসংলগ্ন করিয়া ফেলে, সে দেশের নিবাসিগণ কখন কি শুষ্ক ও বলকারক জল বায়ুর নিবাসিদিগের সমান হইতে পারে? যে বঙ্গবাসী জলবায়ুর দোষে বা অন্য কোন কারণে প্রায় সহস্র বৎসর পরাধীন, তথাকার লোক স্বাধীন লোকের পুত্র পৌত্রাদির সমান সাহসী ও তেজস্বী কেমন করিয়া হইতে পারে? দেখুন, পশ্চিমাঞ্চলের লোক এখনও যদি রাত্রি ৪।৫ টার সময় পল্টন কুচ (মার্চ্চ) করিবে শুনিতে পায়, তবে তাহারা পৌষ মাসের শীতে দুই বৎসর বয়সের শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া রাজপথের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া পল্টনের প্রতীক্ষা করে। যাহারা আশৈশবকাল ঐরূপ করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের সহিত কি বঙ্গবাসীর তুলনা হয়? যে বঙ্গবাসী পল্টনের নামে ঘরে পলায়ন করে, তাহাদের অন্তরে পল্টন শব্দ ভয় ও অত্যাচার ব্যতীত আর কিছুই আনয়ন করে না। অতএব বাঙ্গালী যদি মৎস্য-ভোজী হইয়াও নিরামিষভোজী হিন্দুস্থানীর সমান বীর্য্যবান ও সাহসী না হয়, তাহার অনেক কারণ আছে। যথা পৈতৃক বলবীর্য্য, জলবায়ু, দেশের আচার ব্যবহার, সাধারণ স্বাস্থ্য। আবার দেখুন, হিন্দুস্থানী মৎস্য বা মাংস ভক্ষণ করে না বটে, কিন্তু একসের আটার রুটি, একপোয়া

দাইল ও অর্দ্ধপোয়া ঘৃত আহার করিয়া সচ্ছন্দে পরিপাক করে। বলুন, কয়জন বাঙ্গালীর পাকস্থলী ঐরূপ করিতে সমর্থ? হিন্দুস্থানীদিগের জোলাপের পর (এক ছটাক ক্যাষ্টর অইল) লঘু আহার খিচুড়ি; বাঙ্গালির আহার জলসাগু। পঞ্জাবনিবাসী শিকেরা আমিষভোজী এবং তাহাদিগের সহিত তো হিন্দুস্থানীর তুলনা হইতে পারে না; পল্টনে তাহা অতি স্পষ্টরূপে দেখিয়াছি।

(২) আপত্তি।—আমিষ ভক্ষণে দৈহিক উন্নতি হইলেও মানসিক উন্নতি হয় না, কোন গুরুতর কার্য্য করিতে পারা যায় না, মন সমাহিত হয় না ইত্যাদি। ভাল, এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে যে যে জাতি প্রধান চিন্তাশীল, রাজনীতিজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, তাহারা কি নিরামিষভোজী না আমিষ ভোজী? মিল, স্পেনসার, কারলাইল, গ্লাডষ্টোন, ডিস্‌রেলী,—টেনিসন, হাক্সলি, টিণ্ডাল, ওয়াটস্, ব্রাইট, গেটে, বিস্মার্ক, টিয়ার্স, ফ্রেসিনে, ইমার্সন, মোক্ষমূলার ইত্যাদি ব্যক্তিগণ কি আমিষভোজী না নিরামিষভোজী? স্পেনসার নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী, কেহ কেহ এরূপও বলিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহাদিগকে স্পেনসারের "এডুকেশন" নামক পুস্তকের ১৫২-১৫৯ পৃষ্ঠা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

যদি আধুনিক সভ্য জাতির প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মিশ্র খাদ্য ব্যবহার করিয়া সমস্ত পৃথিবীর চিন্তাস্রোতের, জ্ঞান জ্যোতির, রাজনীতির ও দর্শন শাস্ত্রের বৃদ্ধি বা উন্নতি করিতে সমর্থ হয়েন, তবে মিশ্র খাদ্য মানসিক উন্নতির অনুপযুক্ত বলা কি শোভা পায়? সমস্ত ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, চীন ও জাপান সভ্য ও উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে, ইহা কি নিরামিষ ভোজনের ফল? ঐ সমুদয় দেশে যাঁহারা নিরামিষভোজী আছেন, তাঁহারাও এমন বিশেষ কোন অলৌকিক কার্য্য করেন নাই। যদি করিতেন, তবে ও নয় মনে করা যাইত যে, আমিষভোজীদিগের অপেক্ষা তাহারা অধিক উৎকর্ষ করিয়াছেন।

(৩) আপত্তি।—মৎস্য মাংস ব্যবহার করিলে কাম, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হয়। এ সম্বন্ধে সচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, কোন এক নিরামিষভোজী সম্প্রদায়ের মধ্যে কাম প্রবৃত্তির আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং উত্তর পশ্চিমের রুটি ও দাইল ভক্ষক হিন্দুরাও এবিষয়ে কোন প্রকার ন্যূন নহে এবং মৎস্য ভোজী বাঙ্গালীর মধ্যে ইহার আধিক্য দৃষ্ট হয় না। হিন্দু বিধবাদিগের বিষয় এস্থলে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না। বৃষ, বন্যমহিষ, বরাহ, বিসন ইত্যাদি নিরামিষভোজী জন্তুর ক্রোধ ও হিংসা সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুক্কুর অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া বোধ হয় না। মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে নিরামিষভোজী হইলে ক্রোধ ও হিংসা শূন্য হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। এমন কি, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচলন কালেও ক্রোধ ও হিংসা দেশ হইতে তিরোহিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং মনুষ্য নিরামিষভোজী হইলে যে, সমস্ত দেশ শান্তি সলিলে নিমগ্ন হইবে, ক্রোধ হিংসা এককালে তিরোহিত হইবে, শান্তিরক্ষক ও বিচারালয়ের আবশ্যক হইবে না, এরূপ তো মনে ধারণাই হয় না।

(৪) আপত্তি।—মাংস ভোজনে নানা প্রকার পীড়া হয়। সত্য, অসুস্থ প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করিলে পীড়া হইয়া থাকে। কিন্তু অসতর্ক হইয়া খাদ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করিলে পীড়া হওয়া তো বিচিত্র নহে। পীড়িত শস্য ভক্ষণ করিয়া কি রোগ জন্মে না? বাঁকুড়া, বীরভূম, ও মানভূমে যে কুষ্ট রোগের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়, তাহা কি মাংস ভোজনের না উদ্ভিজ্জ ভক্ষণের ফল?

লোকোমোটারএটাক্সি নামক পীড়ার কি এক প্রধান কারণ খেঁসারির দাইল নহে? নূতন চাউল ব্যবহার করিলে কি পেটের পীড়া হয় না? সিক্ত চাউল, অধিক দিনের ময়দা, বাসী দুগ্ধ বা তরকারী ব্যবহার করিলে কি রোগ জন্মে না? খাদ্য বিষয়ে অসাবধান হইলে রোগ হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? যদি মাংস ভক্ষণ করাই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে সুস্থ মাংস প্রাপ্ত হওয়ার যে কোন বিশেষ ব্যাঘাত হইবে, এমত বোধ হয় না।

অসুস্থমাংস ভক্ষণ করিয়া যতলোক পীড়িত হয়, অবিশুদ্ধ জল, দূষিত জল, মিশ্রিত দুগ্ধ, দূষিত পদার্থ-মিশ্রিত ময়দা, ঘৃত, সুজি ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া তাহাপেক্ষা শতগুণ অধিক লোক পীড়িত হয়, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? তজ্জন্য দুগ্ধ, ময়দা, ঘৃত ব্যবহার করিতে কেহই ত্রুটি করিতেছেন না। এমন কি যাঁহারা মাংস ভোজনের বিরোধী, তাঁহারাও দুগ্ধ পান করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বিশুদ্ধ দুগ্ধ যে বিশুদ্ধ মাংস অপেক্ষা অধিক দুষ্প্রাপ্য, তাহা তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে উপস্থিত হয় নাই। বিশুদ্ধ দুগ্ধ যে বিশুদ্ধ মাংস অপেক্ষা পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে অনেক মহার্ঘ, তাহা কি বিস্মৃত হইব? অবিশুদ্ধ দুগ্ধ যে বিসূচিকা, টাইফইড, উদরাময় ইত্যাদি রোগের এক প্রধান কারণ, তাহাও কি বিস্মৃত হইব?

(৫) আপত্তি।—আমিষ ভক্ষণ আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্নকর। এ বিষয়ে সম্প্রতি একটী অতি উত্তম বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দর্শন শাস্ত্রেরও প্রকাশ আছে, সুতরাং আমি তাহার বিপরীতে কিছু বলিতে সাহস করি না। কিন্তু বাস্তবিক যদি তাহাই হইত, তবে আমাদের মানস ক্ষেত্রে আর ভাষা বা বিজ্ঞানের চিহ্ন থাকিত না; অন্তঃকরণে ঈশ্বরের মঙ্গলময় ও পবিত্র ভাব কখন উপস্থিত হইত না। মোসেস্, জন, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য ও রামমোহন রায় আবির্ভূত হইতেন না। পরম পূজ্যপাদ আর্য্যঋষিগণও জন্ম গ্রহণ করিতেন না; কারণ তাঁহারা সকলেই মাংসভোজী ছিলেন। কতক বয়সের পর কেহ কেহ মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বাল্যকালে মৎস্য মাংস আহার করিয়া যে মস্তিষ্ক গঠিত হইয়াছিল, তাহাতেই তো প্রথমে বিশ্বপতির ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। পরে তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছানুসারে জীবন গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(৬) আপত্তি।—প্রাচীন হিন্দুরা মৎস্য মাংস আহার করিতেন না। এটী সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। যাঁহারা এরূপ বলেন, তাঁহারা মনুসংহিতা, মহাভারত, রামায়ণ এবং হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন গ্রন্থই পাঠ করেন নাই, এমত কি হইতে পারে? মনুসংহিতার আর্য্যা কোন্ কোন্ মাংস ভক্ষণ করিবেন

তাহার বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। মহাভারত ও রামায়ণে মৃগয়ালব্ধ মাংস ব্যবহারেরও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যাগযজ্ঞে মাংস দান তো প্রথাই ছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমাগত হইলে মাংসের আয়োজন অতি পরিপাটীরূপে হইত। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্রের "ইণ্ডএরিয়ান" পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, গোমাংস কি রূপে কর্ত্তন করা ও পাক করা হইবে, তাহারও সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে। চরক, ভাবপ্রকাশ ইত্যাদি প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থে বৎসরের কোন্ সময় কোন্ মাংস কি পরিমাণ ভক্ষণ করিবে, তাহাও এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে। এতদ্ব্যতীত রোগ বিশেষে কোন্ কোন্ মাংস ভক্ষণ করা আবশ্যক, তাহাও বর্ণিত আছে। এই সমস্ত থাকিতেও যাঁহারা বলেন যে, প্রাচীন হিন্দুরা নিরামিষভোজী ছিলেন, তাহাদিকে কি বলিতে ইচ্ছা হয়?

এতদ্ব্যতীত আরও বলা হয়, মাংস যে মনুষ্যের স্বাভাবিক খাদ্য নহে, তাহার প্রমাণ এই যে, কেবল মাংস খাইয়া কেহই থাকিতে পারে না। সেই রূপ আমরাও কি বলিতে পারি না যে, কেবল উদ্ভিজ্জ ব্যবহার করিয়াও কেহ জীবিত থাকে, তাহারও প্রমাণ নাই। এদেশের বিধবাগণ নিরামিষ ভোজন করেন, কিন্তু "বাৎসল্য ও স্নেহভাব পরিপূর্ণ" গোদুগ্ধ ও তদুৎপন্ন ঘৃতাদি ব্যবহার করিতে আপত্তি করেন না; সুতরাং তাঁহারাও যে, বাস্তবিক নিরামিষ ভোজন করেন, তাহা কিরূপে বলিব? ইহারা যেরূপ প্রায়-নিরামিষ ভোজন করেন, তদ্রূপ প্রায়-আমিষ ভোজী লোকের কথাও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য দিকে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ পরামর্শ দেন না যে, মনুষ্য কেবল আমিষ খাইয়া জীবন ধারণ করিবে। এই মাত্র বলা যায় যে, মনুষ্যের যথার্থ খাদ্য, মিশ্রখাদ্য; অর্থাৎ মিশ্র খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ যবক্ষারজানময় ও অঙ্গারময় দ্রব্য উদরস্থ হইতে পারে। এরূপ মিশ্রখাদ্য—উদ্ভিজ্জ ও আমিষখাদ্য—মৎস্য, মাংস ডিম্ব, দুগ্ধ ইত্যাদি। খাদ্য সম্বন্ধীয় এসকল সাধারণ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; পরে ব্যক্তিগত অভাব মোচনের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বয়ং মনন করিবেন। এই বঙ্গভূমের ছয় কোটী লোক সকলেই ধর্ম্মশিক্ষক হইবেন, এমত নহে; সকলেই যোদ্ধা হইবেন, এমত নহে, সকলেই মিল, স্পেনসার, গ্লাডষ্টোন, বিস্মার্ক হইবেন না। সকলেই কেশব, কৃষ্ণদাস, অক্ষয়কুমার হইবেন না। সুতরাং খাদ্য সম্বন্ধে এমন কোন উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে না, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সমান উপযুক্ত হইবে। প্রত্যেকে আপনআপন ধাতু, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও জীবনগতি নির্ণয় করিয়া উপযুক্ত খাদ্য মনন করিবেন। এ বিষয়ে কতক পরিমাণ স্বাধীনতা থাকা অতি আবশ্যক।

শ্রীধর্ম্মদাস বসু।

পূর্ব্ব স্মৃতি।

কেন বল স্মৃতিদেবি স্বপনের বেশে,
মরমে লুকান কথা জাগাইলে এসে ?
কেন সে শৈশব কথা করালে স্মরণ
হৃদয় ভরিল লো রে পূরিল নয়ন।
অতি দূর দূরান্তরে
ধরণীর পরান্তরে
দুরন্ত তটিনী তটে ছিল মোর বাস।
বলিতে সে সব কথা
পরাণে বাজয়ে ব্যথা
বড় সুখে ছিলাম যে সেথা।
ক্ষুদ্র সে কুটীর মম
চির শান্তি নিকেতন,
হেরিলে সে রম্য স্থান
ঋষির ভুলিত প্রাণ
চিত্রকের সাধ্য কিতা তোলে তুলিকায়।
সম্মুখে বিশাল মাঠ ধূ ধূ করে,
শ্যামল কানন শোভে ধরণী উপরে,
হইলে প্রভাত বেলা
দেখেছি সে ছেলে বেলা
দলে দলে মাঠে যেত পয়স্বিনীগণ,
হাম্বারবে বৎস সবে করিত গমন।
প্রফুল্ল কৃষক কত যেত মাঠ পানে
দেখিত নবীন শস্য অতি সাবধানে।
কচি ধান গাছ গুলি
চেয়ে র'ত মাথা তুলি
যেন আশ্বাসিত চাসাগণে দুঃখ যাও ভুলি ;
সময়ে শ্রমের ফল পাবিরে নিশ্চয়,
সৎকাজে পুরস্কার নাহিক সংশয়।
হরিত বসনে মাঠ কি শোভা ধরিত
নানা জাতি ফুল গন্ধে হৃদয় ভরিত,
যে দিকে ফিরাই আঁখি
এখন তা সাম্‌নে দেখি
মনোহর সেই রম্য ঠাঁই।

হৃদয় সাগরে মোর কত ঢেউ খেলিছে
প্রকৃতির শোভা সেই মরমেতে মেলিছে।
ঘুমায়ে পড়িত যবে সাঁঝের সাগর
খেলিত দুলায়ে নদী তরঙ্গ নিকর।
কত কি মোহন ছবি শোভিত আকাশ পটে
গাইত অপ্‌সরা গান সুরপুরে অকপটে।
যখন আকাশে উঠিত শশী
তারকা উঠিত ফুটিয়া
মধুর জোছনা পড়িত খসি
তটিনী ছুটিত লুটিয়া।
জগত যখন ঘুমের আলসে
ঢলিয়া পড়িত প্রকৃতির কোলে,
চারি দিক হতে উঠিত লহরী
অনিল পরশে অবশ ধরণী
যখন পড়েলো মনে গভীর নিশীথে
ঘুমভাঙ্গা চোখ দুটী না পারি মেলিতে
সাড়া নাই শব্দ নাই
জনপ্রাণী কেহ নাই
তখন যেমন ধীরে
অতি দূরে অতি ধীরে
নাবিকের বাঁশরীর গান
উদাস করিত অলস পরাণ।
তালে তালে ফেলি দাঁড়
খুলিয়া প্রাণের দ্বার
গাইত যে দাড়ীমাঝী ভাটিয়ারী গান।
সাধের তরণী কত নদী বক্ষে ভাসিয়া
তালে তালে চলে যেত নাচিয়া নাচিয়া,
পুরাণ সে তানটুকু আজ কাণে বাজিছে,
শুনিতে সে মধু গীত আজ প্রাণ নাচিছে।
ছিল না সেথায় আমোদের শেষ
ছিলনা সেথায় কপটতা লেশ
বনের পাখীর মত নাচিয়া খেলিয়া,—
গাইয়া সুখের গান কুসুম তুলিয়া,

[illegible] আনন্দে দিন [illegible] ;
কেন সে পুরাণ কথা [illegible] স্মরণ ?
ছিল মোর এক খেলিবার সাথী
দুটী প্রাণ এক সারা দিন রাতি
এত ভালবাসা কোথায় না দেখি।
গুণ গুণ স্বরে দোঁহে কত কি গেয়েছি
বনের হরিণী মত বনে বনে ফিরেছি
প্রাণের প্রাণের কথা কত কি বলেছি।
অমিয় মাখান মুখ খানি তার
চেয়ে চেয়ে সাধ পূরিত না আর
দেখিনি রূপসী তাওত নয়।
কিন্তু দেখিনি তেমন মুখ সুমধুর ভাবময়।
তাই বড় সাধ হয় মনে দেখিতে তার হাসি
মধুর মুখখানি তার বড় ভালবাসি।
এখন ত কতদিন ভাবিতে ভাবিতে
বাতায়ন পাশে বসি মধুর জোছনা রেতে,
বড় সাধ হয় মনে যারে ভাল বাসি
মুহূর্ত্তের তরে সেই বসে কাছে আসি।
স্মৃতি ঢাকা চাঁদে সুধু বাড়ায় যাতনা
আধেক সুখেতে কার পূরেনা বাসনা।
ফুলের বাগান এক ছিল এক কোণে
স্বপনে সে সব কথা জেগে উঠে মনে,
শৈশবে যাহাই ছিল সব যেন ভাল
ফুলফল গাছ গুলি করেছিল আলো ;
সাধের বাগানে আমি অতিশয় যতনে
রোপণ করিয়াছিনু সেফালিকা রতনে।
সযতনে জল ঢেলে দিয়াছি দুবেলা
কাছে তার বসে কত করিয়াছি খেলা।
রেখেছিলাম শিউলিরে অতিশয় যতনে
দিন দিন বাড়িত সে আনন্দিত আননে,
কিন্তু বরষা সেথা আইল যে কালে
ডুবাল অতল জলে শিউলি অকালে ;
কচি প্রাণে সে আঘাত মরমেতে বাজিল
বুঝি প্রাণে বিঁধা শেল আছে মোর আজিও।

[illegible]
[illegible]
শুনিয়া পাখীর গান
হরিবে ধরেছি তান
পাখীদের সনে মাতি প্রভাতী গাইতে
প্রতিমার আঁখি তুলে
তুলি নানা জাতি ফুল
দিতাম মায়ের হাতে মনের হরষে
ফুলাঞ্জলি দিয়া তিনি পূজিতেন মহেশে।
করেছি সকল কাজ ভাই বোনে মিলিয়া,
সস্নেহে মোদের মাতা দিতেন রাঁধিয়া ;
চাকর বাকর সেথা ছিল না কাহার ;
পাচক বামন হাতে ছিল না আহার,
কাজ কর্ম্ম সেরে নিয়ে করিছি কত খেলা,
তখনত ছিলনা ঘোর বড় মানুষি মেলা।
ভাই বোন প্রতিবেশী ছিল সব ভাল
দেখিতে হত না কভু কার মুখ কাল,
অতীতে গিয়াছে যাহা,
আজ প্রাণ চাহে তাহা,
সুখ দুঃখ দুই তথা ছিল ত মিলন,
তবে কেন তার তরে বাসনা এমন ?
অদূরে দুরন্ত নদী হুহু করে গায়
কি জানি কি যেন গেয়ে [illegible]।
দেখিতাম কত নারী আসি নদী কূলে
কহিত কতই কথা কত কাজ ভুলে।
মধুর অধরে কেহ মধুর হাসিয়া,
তটিনীর জলে দিত পরাণ ঢালিয়া।
সুধাইত মৃদুস্বরে কহলো তটিনি
কার তরে সদা তুমি এত পাগলিনী।
লজ্জা নাই ভয় নাই
সদা কর হায় হায়
তুমি কি লো প্রেমভিখারিনী ?
ফিরিতেছ কার উদ্দেশে
সে তোমার কোন্ দেশে
কহলো কহলো মোরে ধ্বনি।

দূরে দূরে অতিদূরে আছে সে আমার
যেমন প্রবাসে পতি আছেন তোমার।

তাইত চঞ্চল এত
সদা পাগলের মত
অন্ত নাই সীমা নাই
কোথাও যে নাই পাই
মোর সেই পরাণ রতন।

বলিতে নিদয় সাগরের কথা
তটিনী পাইত পরাণেতে ব্যথা
উছলি উছলি উছলি উঠিত,
সে দারুণ বেগ তার আর নাহি থামিত।
এক দিন ঢলে ঢলে আধ ঘুম ঘোরে
পড়িলাম সে দুরন্ত তটিনীর বুকে
দিখিদিক হারাইয়া হয়ে জ্ঞান হত
স্রোতমুখে ভাসিলাম বিদ্যুতের মত।
ভাসিতে ভাসিতে আসি ঠেকিলাম হেথা
পথ ঘাট নাহি চিনি যাই তবে কোথা?
শৈশবের কথা সব হইলে স্মরণ

পলকের তরে যেন
মনে মনে হয় হেন
যদি হইতাম পাখী
শুন লো প্রাণের সখি
শৈশব সঙ্গিনী
আকাশে ঢালিয়া দিয়া প্রাণ
গাইয়া সে পুরাতন গান
জনমের মত একবার
দেখিতাম মুখখানি তোমার।
অতীতের সুখস্থান
সুখ ভ্রান্তি বর্ত্তমান

পশ্চাতে চাহিয়া দেখি ঘোর অন্ধকার
কি হবে গো কি হবে আমার?

তাই বলি বার বার
কেন স্মৃতি জাগিলে আবার?

বাই

সাবিত্রী প্রতিবাদের প্রতিবাদ। (২)

তারপর চন্দ্রনাথ বাবু বলেন,যে "বিবাহ ধর্ম্মচর্য্যা ও সমাজ সেবার জন্য।" এবং "যে বিবাহ ধর্ম্মচর্য্যা ও সমাজ সেবার জন্য তাহাই মঙ্গলজনক।" "যদি তাহাই হয়, তবে বিবাহার্থ স্বয়ং কন্যা নির্ব্বাচন না করাই ভাল।" বিজয় বাবুর মত তাহা নহে; তিনি সমাজ সেবা ও পারিবারিক সুখও চাহেন, অথচ নির্ব্বাচনপ্রথা বিবাহকারীর হস্তে রাখিতে চান। তিনি বোধ হয় এ কথাটা জানেন, আমরা যেরূপ মাতা, পিতা, ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ লইয়া একত্র বাস করি, হিন্দু পরিবার প্রথা যেরূপ, অন্য কোন জাতি সেরূপ আত্মীয়বর্গ লইয়া একত্র বাস করে না, তাহাদের পরিবারপ্রথা এ প্রকার নহে। তিনি যে, ইংরাজগণের আদর্শে হিন্দুজাতি মধ্যে নির্ব্বাচনপ্রথা প্রচলনের আকাঙ্ক্ষী, সে ইংরাজগণ বিবাহিত হইয়াই স্ত্রীর সহিত স্বতন্ত্র অবস্থান করেন। সুতরাং ইংরাজ মহিলার অনেক লোকের সহিত মতভেদ-জনিত অশান্তি ও অসুখ ভোগের আশঙ্কা নাই। হিন্দু মহিলাকে যেরূপ এক বিভিন্ন পরিবারস্থ সকলের রুচি প্রকৃতির সহিত আপনার রুচি প্রকৃতি মিশাইতে হয়, পরকে আপনার করিতে হয়, আপনাকে সেই পর হইয়া যাইতে হয়, ইংরাজ

মহিলাকে সে মহান আত্মত্যাগ করিতে, সেরূপ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হয় না। কিন্তু এরূপ মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানের যোগাড় করিবে কে? পরিবারের কর্ত্তা ভিন্ন অন্য কেহ কি বুঝিতে পারেন, তাঁহার পরিবারে কিরূপ পরিবারের কন্যা আনিলে সেই কন্যা তাঁহার পরিবারোপযোগী হইবে? কি করিলে পরিবার বন্ধন দৃঢ় থাকিবে, পরিবারের উন্নতি হইবে, পরিবারে শান্তি ও সুখ বিরাজ করিবে, বিজ্ঞ, বহুদর্শী অভিভাবক যেরূপ বুঝিতে পারিবেন, অনভিজ্ঞ, বিবাহকারী তরুণ যুবক কি সে কঠিন কার্য্যে সক্ষম? জিজ্ঞাসা করি, পরিবারের যাহাতে মঙ্গল, বিবাহকারী যুবকের কি তাহাতে মঙ্গল নহে? তাঁহার মাতা পিতা ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয় পরিজনের যাহাতে মানাপমান, সুখাসুখ, শান্তি অশান্তি হইবে, তাঁহার কি তাহাতে মানাপমান, সুখাসুখ, শান্তি অশান্তি হইবে না? লেখক ব্যক্তিগত সুখ কাহাকে বলেন, বুঝিলাম না। পরম রূপবতী বিলাসিনী পত্নী লাভে ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তিই কি তবে ব্যক্তিগত সুখ? হিন্দুশাস্ত্রে নির্ব্বাচনের যে প্রণালী আছে, এবং চন্দ্রনাথ বাবু যাহার বিশদ ব্যাখা করিয়াছেন, যদি সেই প্রণালী মতে বর্ত্তমান সমাজে নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন হয়, তবে ব্যক্তিগত ও পরিবারগত সকল সুখই সাধিত হইবে। চন্দ্রনাথ বাবু হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝাইয়াছেন, তিনি বর্ত্তমান কালের টাকার পরিমাণে নির্ব্বাচনের নিয়ম করিতে হইবে, একথা বলেন নাই। কুলশীল না দেখিয়া, পিতৃমাতৃ কুলের সবিশেষ পরিচয় না লইয়া, পরিবারের প্রকৃত মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, আজিকার অদূরদর্শী, পরিণামজ্ঞানশূন্য যে সকল অভিভাবক বরকন্যা নির্ব্বাচন করেন, তিনি তাঁহাদের কথা বলেন নাই। শাস্ত্রানুযায়ী দেখিয়া শুনিয়া নির্ব্বাচন হয় না বলিয়াই আজকালকার অনেক পতি ও পত্নী নানা দোষে দোষী হন, তাই বিজয় বাবুর মত ব্যক্তিরা স্থির চিত্তে এই মূল কারণটীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া বলিয়া বসেন, বয়স্থা হইয়া বিবাহিতা হইলে স্ত্রীর অন্তঃকরণের রুচি, প্রবৃত্তি ও গতি পতির সহিত মিশিয়া যাইবে। সকলেই জানেন, নদীর স্রোত প্রথমে নানা দিকে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়া, অবশেষে একটী পথ অবলম্বন করে। আমাদের মতি, গতি, রুচি, প্রকৃতি, স্বভাব চরিত্রও অল্প বয়সে নানা মুখী থাকে, নিয়তই সে সমস্তের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু যখন বয়সের সহিত বুদ্ধি পরিপক্ক হয়, তখন যে শিক্ষা, সংসর্গ ও অবস্থায় থাকা যায়, ঠিক সেইরূপে মন গঠিত হইয়া যায়। তখন যে পরিবারে কন্যা প্রবেশ করেন, সে পরিবারের সহিত কখনই তাহার মিশ খাইবে না। কারণ কোন দুইটী পরিবারের রুচি, প্রকৃতি, মতি গতি একরূপ নহে। সে পরিবারের সহিত যখন মিল হইল না, তখন সে পরিবারে পালিত বিবাহকারী যুবকের সহিতও তাহার মিলন হইতে পারে না। সেই জন্য বয়স হইয়া বিবাহে ব্যক্তিগত সুখ হওয়া দূরে থাকুক, পদে পদে অসুখ, পদে পদে স্বামী স্ত্রীতে মতভেদ, বিবাদ, বিসম্বাদ সর্ব্বদাই মনান্তর হইয়া থাকে। কিন্তু যদি অল্প বয়সে, স্বভাবাদি স্থায়ীভাব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বিবাহ হয়, তবে স্বামী

স্ত্রীকে নিজ পরিবারানুযায়ী, নিজ মনোমত গড়িয়া লইতে পারেন। অপ্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রীর সহিত স্বামীকে মিশিতে চন্দ্রনাথ বাবু নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া বিজয় বাবু ভাবিয়াছেন যে, স্বামী স্ত্রীকে পরিবারানুযায়ী গঠিত করিতেও পারিবেন না। না, তাহা নহে, চন্দ্রনাথ বাবু স্বামী স্ত্রীর সহবাস নিষিদ্ধ বলিয়াছেন; স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর শিক্ষা নিষিদ্ধ নহে। বিজয় বাবু ৯০শ ও ৯১ শ পৃষ্ঠা দুটী ভাল করিয়া কাহারও নিকট বুঝাইয়া লইলে আমার কথার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক, এরূপ জিতেন্দ্রিয় স্বামী হইতে গেলে কিরূপ ভাবে নিজ জীবন গঠিত করিতে হইবে, সেই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথাও চন্দ্রনাথ বাবু অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং লেখকের মতে "জীবনের নৈতিক দুর্গতি কিরূপে হইবে" তাহা তাঁহার মনই বলিতে পারে। আমি ত কিছু বুঝিলাম না। আমি ইহাও বুঝিলাম না, তিনি কোন্ রুচিতে, কি বিবেচনায়, নিম্ন লিখিত অপাঠ্য, আলোচনার নিতান্ত অযোগ্য কথা বলিয়াছেন;—"যুবতীর দিকে যুবক প্রেমের দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করুন; ক্ষতি নাই, তাহাতে যদি ভ্রান্তি জন্মে, চিত্ত বৈকল্য হয়, তাহাও প্রার্থনীয়; কিন্তু বালিকাকে প্রেমময়ী করিয়া গড়িবার চেষ্টা করা কোন প্রকারে উচিত নয়।"

তারপর, তাঁহাকে বক্তব্য এই, তিনি যেন শাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দেন যে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনও জাতিতে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। আর তিনি যে বলিয়াছেন, "পুনর্ব্বিবাহ সংস্কার না হইলে কন্যা বরগৃহে নীতা হয় না"; সেটা কি ষোড়শ বা উনবিংশ বা দ্বাবিংশ বয়সে হয়? জানি না বিজয় বাবু বাঙ্গালি হইয়া কিরূপে বলিলেন, "বাল্যবিবাহ রীতি একান্নবর্ত্তী পরিবারের জন্য কেবল প্রচলিত হইতে পারে না।" যে একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথা মানুষকে নীচ স্বার্থপরতা ভুলাইয়া দেয়, পরোপকার রূপ শ্রেষ্ঠ ব্রতে দীক্ষিত করে, যে প্রথা ভক্তি, প্রণয়, স্নেহ, মমতা, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি সৎবৃত্তি নিচয়ের পূর্ণস্ফূর্ত্তি ও বিকাশের একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র; এক কথায় মনুষ্যত্ব শিক্ষার যাহা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, সমগ্র হিন্দুসমাজনীতি যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, সেই একান্নবর্ত্তী প্রথার খাতিরে তিনি বাল্যবিবাহ দিতে চান না। যে দেশের কথাই ধর না কেন, সমাজের উৎপত্তি কোথা হইতে? পরিবার সমষ্টি কি সমাজের প্রসূতি নহে? সুতরাং সেই পরিবার প্রথার উন্নতি ও পূর্ণতাতে সমাজ উন্নত ও পূর্ণ হইবে না কি? যাঁহারা একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার প্রয়োজনীয়তা এবং মহত্ত্ব উপলব্ধি করেন, বাল্য বিবাহের প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন। ইহার পর রবীন্দ্র বাবুর "অকাল কুষ্মাণ্ড ও হাতে কলমে" প্রবন্ধের প্রতিবাদ। আকাশ পাতাল ভাবিয়া লেখক ইহার একটী দোষ বাহির করিয়াছেন যে, প্রবন্ধটী ইংলণ্ডের ম্যাথিউ আরনল্ড প্রভৃতি লেখকগণের লেখার মত গম্ভীর নহে। আমি এ ছেলেমানুষীর উত্তর দিতে অক্ষম।

"হাতে কলমে" প্রবন্ধে রবীন্দ্র বাবু কোথাও বলেন নাই, দেশের নির্ধন অথচ

শিক্ষিত সংবাদ পত্রাদির সম্পাদক অর্থ দিয়া দেশের অনিষ্ট নিবারণ করুন। সংবাদ পত্র সম্পাদকগণের তিনি কোনও প্রতিবাদই করেন নাই। তিনি সভা আহ্বান এবং বক্তৃতার বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুখের কথায় কিছু হইবে না, কার্য্যে দেশের অভাব দূর কর। তিনি, দেশের ধনীগণকে ঘরের ভিতর টাকা পূরিয়া রাখিয়া, নির্ধন ব্যক্তিগণকে উৎপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্য করিতে বলেন নাই। যাঁহারা দেশহিত ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন যে, বক্তৃতা বা সভায় লোকের অভাব জ্ঞান ও তন্নিবারণের প্রবৃত্তি হইবে না। এক একটী অত্যাচার নিবারণ করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা, কার্য্যে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে হইবে। তিনি বড় বড় ব্যাপারের আন্দোলন না করিয়া, শেষ হইতে কার্য্য আরম্ভ না করিয়া, গোড়া থেকে, ছোট কাজ হইতে আরম্ভ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এমন সহস্র কাজ আছে, যাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের তোষামোদের প্রয়োজন নাই; আমাদের দ্বারাই তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে। রাজনীতি শিক্ষা দিতে গিয়া যাঁহারা ভ্রম পথে পড়িয়াছেন, রবীন্দ্র বাবু তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক তাঁহার প্রবন্ধটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য (Spirit) কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নানা কথা লিখিয়াছেন, এবং অবশেষে জাতীয় ধন ভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ, National Fund এর কথা এখনও বিস্মৃত হন নাই, বোধ হয়।

৭ম ও ৮ম প্রবন্ধ "সোণার কাটী রূপার কাটী" ও "সোণায় সোহাগা"— শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত। লেখক দ্বিজেন্দ্র বাবুকে অতি সঙ্কীর্ণমনা বলিয়াছেন। ইহাতে তিনি কেবল মিথ্যা কথা বলেন নাই, একথা বলাতে তাঁহার পাপ হইয়াছে। দিন দিন আমরা জাতীয়ত্ব হারাইতেছি দেখিয়া, আমাদের আত্ম মর্য্যাদাবোধ ক্রমে লোপ পাইল বুঝিয়া, মনুষ্যত্ব আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছে দেখিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু মর্ম্ম ব্যথায় ব্যথিত হইয়াছেন। প্রবন্ধ দুইটী যেকেহ পড়িবেন, এবং লেখার ভাব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, প্রত্যেক পংক্তি, প্রত্যেক কথা হৃদয়ের শোণিত দিয়া লিখিত। আগা গোড়া তিনি অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার উপহাস গভীর বিষাদের অভিব্যক্তি মাত্র। এ প্রবন্ধ আবার সঙ্কীর্ণ মতের পরিচায়ক! এরূপ উদারভাবে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিয়া কয়জন লিখিতে পারেন? স্বদেশীয়ের হীনতা দেখিয়া, এবং সেই হীনতার জন্য রাজার নিকট স্বদেশীয়ের লাঞ্ছনা দেখিয়া কয়জন এমন করিয়া কাঁদিতে পারেন? জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা হ্যাট-কোট পরিধান করেন, তাঁহারা কি কারণে দেশীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়াছেন? কারণ ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না। অবশ্য, সেই জাতীয় চিহ্নটী তাঁহাদের মনোমত নহে বলিয়া, তাঁহাদের নানা প্রকার স্বার্থের বিরোধী বলিয়াই তাঁহারা জাতীয় পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়াছেন। জাতীয়তায় অনুরাগ কম বলিয়াই ত্যাগ করিয়াছেন। এবং পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যজাতি, জাতীয় পরি-

ছদের দোষই থাকুক বা গুণই থাকুক, জাতীয়তার পূর্ণ অনুরাগ বশতঃই তাহা পরিত্যাগ করে নাই। জাতীয় পরিচ্ছদের দোষ থাকে,—তাহা মোচন কর। কিন্তু এরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিও না, যাহাতে তোমাকে স্বজাতীয় বলিয়া চিনিতে পারা না যায়, অথবা যাহাতে তোমাকে স্বজাতীয়-বিদ্বেষী বলিয়া লোকে মনে করে। লেখক হ্যাটকোটধারী কয়েক জনের নাম করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা পরম দেশহিতৈষী, এবং আমরা "ধূতি চাদর ওয়ালারা ঘরে বসিয়া জেঠাম করি।" মহাত্মা রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি ধূতিচাদর ওয়ালারা ঘরে বসিয়া জেঠামো করিয়াছেন, না? তাঁহাদের অপেক্ষা তাঁহার তালিকার ব্যক্তিদের দ্বারা দেশের অপেক্ষাকৃত অধিক উপকার হইয়াছে বুঝি? আশা করি, যাঁহারা লেখকের মতাবলম্বী আমার কথাগুলিতে তাঁহাদের চৈতন্য হইবে।

"হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না" প্রবন্ধের প্রতিবাদে তিনি বলিয়াছেন, "বয়স্থা হইয়া বিবাহিতা হইলেও যদি কেহ বিধবা হয়, সেও অবশ্য পুনর্বিবাহ করিবে।" তাঁহার আর একটী মত, "অক্ষয় বাবু বিধবার বিবাহ নিষেধ করেন নাই।"

"তারপর ১০ম প্রবন্ধ—হিন্দু রীতি নীতি হিন্দুজাতির অবনতির কারণ নহে"। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে কর্তৃক লাইব্রেরীর গত বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। বীরেশ্বর বাবু শেষ বক্তা; কিন্তু কি জানি তাঁহার প্রতি বিজয় বাবুর বিদ্বেষই থাকুক বা অন্য কোন ভাবই থাকুক, প্রবন্ধের আরম্ভেই তিনি তাঁহাকে, ভদ্রলোকের বিশেষতঃ সাহিত্য চর্চ্চাকারীর অযোগ্য কটুকথায় অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে বীরেশ্বর বাবু কোন এক বৎসরের বক্তার উপযুক্ত নহেন; তিনি লেখক নামেরই অযোগ্য। বোধ হয়, লেখকের প্রথম জ্ঞানোন্মেষ হইতেছে; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস তিনি কিছুই অবগত নহেন। তাঁহার অবগতির জন্য লিখিতেছি, বাঙ্গালা ভাষায় "মানবতত্ত্ব" নামে যে একখানি প্রগাঢ় চিন্তা, অসাধারণ বহুদর্শিতা, অদ্ভুত বিচারশক্তিপূর্ণ পুস্তক আছে, পণ্ডিত ও জ্ঞানী মাত্রেই যে পুস্তকের শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষার সহিত যে পুস্তক থাকিবে; শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে সেই পুস্তকের প্রণেতা। তিনি বহুকাল ধরিয়া তাঁহার নিকট জ্ঞানলাভ করিতেও প্রবন্ধ রচনা শিখিতে পারেন। সুতরাং "বীরেশ্বর পাঁড়ের মত লোক দিয়া কেন প্রবন্ধ পড়ান হইল" এবং "তিনি সমাজ বিজ্ঞানাদি কখনও চোখে দেখিয়াছেন কি না" সে কথা তাঁহার জানিবার কোনও উপায় নাই। দেখিতে পাওয়া যায়, বিখ্যাত হইবার দুইটী উপায় আছে, এক নিজের বিদ্যাবুদ্ধির জোরে,নিজের প্রতিভাবলে; আর এক উপায় বড় লোকের স্কন্ধে চাপিয়া অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে গালাগালি দিয়া। বিজয় বাবু বোধ হয় শেষোক্ত সুলভ উপায়টী অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি যেরূপে বড় হইতে পারেন হউন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু তিনি যে নব্যভারতের পাঠকগণকে "অসার ১০ম প্রবন্ধ সম্বন্ধে

কিছু বক্তব্য নাই” বলিয়া প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে তাহা করিতে দিব না। বীরেশ্বর বাবুর প্রবন্ধে কি আছে, দুচারি কথায় পাঠকবর্গকে তাহা জ্ঞাত করাইতেছি।

বীরেশ্বর বাবু বলেন, আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ এক দিকে দেখিতেছেন যে, তাহাদের স্বজাতির বর্ত্তমান অবস্থা ইয়ুরোপীয় জাতিগুলির সহিত তুলনায় অতিহীন, অতি শোচনীয়। তাঁহাদের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতির স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে; তাঁহাদের পরাক্রম পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির উপর তাঁহারা প্রভুত্ব করিতেছেন। অন্যদিকে আমরা দিন দিন দরিদ্র হইতেছি, আমাদের প্রাচীন শিল্প বাণিজ্য লুপ্তপ্রায়, আমাদের চারিদিকে শত শত অভাব। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে, আমাদের বর্ত্তমান রীতিনীতি আচার ব্যবহার আমাদিগকে নিশ্চই দুর্ব্বল, নির্জ্জীব ও অকর্ম্মণ্য করিতেছে। ইংরাজগণের জীবন যেরূপে গঠিত হইয়াছে, আমাদের জীবন সেভাবে সেই রীতি নীতি অবলম্বনে গঠিত না হইলে, আমাদের দুরবস্থা ঘুচিবে না। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। যে পাশ্চাত্যগণের জ্ঞান ও সভ্যতা এত সমুন্নত, সেই পাশ্চাত্যগণই প্রাচীন হিন্দুজাতির জ্ঞান ও সভ্যতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বৈদিক কালের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপরই তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য। সে সময়কার আচার ব্যবহার পাশ্চাত্যগণের সহিত মিলে এবং উঁহারা যখন সেই অবস্থাকে অতিশয় গৌরবের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই সে সময় অত্যন্ত উন্নতির কাল। আমরা পুনরায় সে সমস্ত অবলম্বন করিলে পূর্ব্বগৌরব, পূর্ব্বমহত্ত্ব লাভ করিব, পাশ্চাত্য জাতিগুলির মত মহিমান্বিত হইব। ইহাতে জাতীয় রীতি নীতি সমূহে বিদ্বেষভাব ঢাকা পড়িবে, অথচ ফাঁকি দিয়া এক মহাজাতি বলিয়া গণ্য হইব। হায়! লাঙ্গুলহীন শৃগাল যে অন্য সকল শৃগালকে স্বস্ব লাঙ্গুল কাটিয়া তাহার দলভুক্ত হইতে বলিতেছে, ইংরাজ প্রভুগণের এ কূটনীতি শিক্ষিতগণ বুঝিতে পারেন নাই। বীরেশ্বর বাবু বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত শিক্ষিতগণের ফাঁকি ধরিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, বৈদিককাল য়ুরোপীয়গণের মতেই আমাদের সভ্যতার প্রথমাবস্থা। সে সময়ে আমাদের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তাহার অনেককাল পরে আমাদের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল, তিনি আমাদের উন্নতির ক্রম অতিবিশদরূপে বিশেষ দক্ষতার সহিত দেখাইয়াছেন। বৈদিককালে হিন্দুসমাজে যে বিশৃঙ্খলা ছিল, কত দিকের কত স্বেচ্ছাচারিতা অপনীত হয় নাই, তাহা তিনি সুন্দর প্রণালীতে বুঝাইয়াছেন। যে সময়ে আমাদের রীতিনীতি নিয়ত পরিবর্ত্তনের অবস্থা অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ ও অতিশয় উন্নত অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল, যখন হিন্দুজাতি মনুষ্যত্বের অনেক উচ্চ শিখরে উঠিলেন, সেই সময়কার—সেই মনুর, রামায়ণ ও মহাভারতের কালের অবস্থা তিনি আলোচনা করিয়াছেন। এই সময় যে প্রকৃত উন্নতির সময়, তিনি ভারতবর্ষীয় আদিম অসভ্যজাতি ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতির রীতি নীতির আলোচনায় দেখাই-

য়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন, অতি প্রাচীন কালের আর্য্যজাতি মধ্যে সেই সব রীতি নীতি অনেকগুলি প্রচলিত ছিল। যদি ভীল সাঁওতাল প্রভৃতির অনুকরণ বাঞ্ছনীয় না হয়, তবে আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি অবলম্বন করা কি যুক্তিসিদ্ধ? শিক্ষিতগণ কি সেই বর্ব্বর জাতি ভুক্ত হইতে উৎসুক? বৈদিক সময়ে আর্য্যজাতির ক্ষমতা কম ছিল। সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী দেশ সমূহ মাত্র তাঁহাদের অধিকৃত ছিল। শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র। যে সকল রীতি নীতি বর্ত্তমানকালে প্রচলিত, আমাদের প্রকৃত গৌরবের অবস্থায় সেই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। যে সময়ে সংস্কৃত সাহিত্য দর্শনাদির প্রভাব সুদূর গ্রীস ও রোম পর্য্যন্ত বিস্তৃতি হইয়াছিল, ফিনিসীয় প্রভৃতি জাতির সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিতেছিল, সকল বিষয়ে যখন ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল জাতির আদর্শ হইয়াছিল, বর্ত্তমান রীতি নীতি সমূহ সেই গৌরবকালের। হিন্দু রীতি নীতি হিন্দুজাতির অবনতির কারণ নহে। অবনতির কারণ স্বতন্ত্র। সামাজিক রীতি নীতিই যদি অবনতির কারণ হইত, তবে যে পাশ্চাত্যগণের কতকগুলি রীতিনীতির সহিত ভীল সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মিল আছে, সেই সকল ঘৃণিত, অসভ্য জাতি মহাপরাক্রমশালী হইতে পারিত।

তারপর বীরেশ্বর বাবু প্রমাণ করিয়াছেন যে, শিক্ষিতগণ ইংলণ্ডের অনেক রীতি নীতির মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে তাহাদের জাতিভেদ নাই বলেন, বিবাহকালে বর কন্যার নির্ব্বাচনে সম্পূর্ণ ক্ষমতার কথা বলেন, তাহা মিথ্যা। তিনি ইংরাজ সমাজের আঁটা-আঁটির কয়েকটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যে স্বজাতীয় রীতি নীতির অনেক বিকৃত অর্থ করিয়াছেন, তাহাও তিনি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। স্থানাভাবে সে সকল স্থল উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। তাহা হইলে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইতেন, বীরেশ্বর বাবুর যুক্তিপ্রণালী, কত উচ্চদরের, কত সূক্ষ্ম, কত উত্তম। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, লেখক কি প্রকারে এ প্রবন্ধকে অসার বলিয়া সাধারণে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন। আমরা এমন কথা বলিনা, তাঁহার প্রবন্ধে একটীও দোষ নাই। দুএকটী সামান্য দোষ দেখিয়া একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধকে অসার বলা অত্যন্ত অন্যায়, অতিশয় হীনতার পরিচায়ক।

পরিশেষে ভূমিকা সম্বন্ধে গুটিকতক কথা। আমি ভূমিকায় লিখিয়াছি, "আমাদের পরম সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা আমাদের দ্বারা দেশের আর একটী হিতানুষ্ঠান হইতে চলিল, আজ আমরা আর একটী কীর্ত্তি স্থাপিত করিতে পারিলাম।" বিজয় বাবু এই কথা গুলির নিম্নলিখিত অর্থ করিয়াছেন, "কিন্তু সম্পাদক যখন এত অল্প দিনের মধ্যেই এটাকে (প্রতি বৎসর অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করানকে) একটা কীর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে শিখিয়াছেন, তখন ভয় হয়, যে পরিতৃপ্তির সুখ ভবিষ্যতের উন্নতির পক্ষে বাধা না জন্মায়।" এখন নিরপেক্ষ পাঠক বিবেচনা করুন, 'কীর্ত্তি' কথাটী আমরা কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছি, এবং লেখক তাহা কি প্রকারে

বিপরীতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "পরম সৌভাগ্য এবং গৌরব" এই দুইটী কথার ভাব কি? কীর্ত্তিটী আমাদের মনে উদিত হইয়াই স্থাপিত হয় নাই, ইহা সামান্য চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমে সম্পন্ন হয় নাই; বিশেষ চেষ্টায়—তাহাও নহে—অদৃষ্ট বশে—মনুষ্যের অজ্ঞাত, মনুষ্যসাধ্যাতীত ঈশ্বরানুগ্রহে সাধিত হইয়াছে। এবং এই অনুগ্রহ প্রাপ্তি কি কম গৌরব ও আনন্দের বিষয়? আশা করি, লেখক এবার আমার কথাগুলির অর্থ বুঝিতে পারিবেন। একটু তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে তিনি জানিতে পারিবেন যে, আমাদের "পরিতৃপ্তির সুখ, ভবিষ্যতের উন্নতির পক্ষে বাধা জন্মাইবে না"। তিনি যে বিষম ভয়ে আকুল হইয়াছেন, তাহা ত্যাগ করুন। আমার কথায় পরিতৃপ্তির কথা আসে না, তাহার বিপরীত ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি আমার কথার যেরূপ মিথ্যা ব্যাখ্যা করিয়া সত্যের অবমাননা করিয়াছেন, যদি আমি সেই কথা গুলিই ব্যবহার করিতাম, তাহাতেই বা কি দোষ হইত? ইতিপূর্ব্বে আমাদের দেশে বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ধরণের অধিবেশন কি হইয়াছিল? অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা কি বাঙ্গালা ভাষায় নূতন ব্যাপার নহে? আমাদের এই সদনুষ্ঠান অন্যান্য লাইব্রেরী বা সভা সমূহের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবে না কি? এবং এইরূপ অনুষ্ঠানে দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে না কি? তিনি যে সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধিবেশনগুলিকে বালস্বভাব সুলভ তাচ্ছিল্যভাবে উড়াইয়া দিয়াছেন, আমরা বুঝিয়াছি, সেটা তাচ্ছিল্য নয়, ঈর্ষা। তিনি জানেন, দেশের অতি অল্প সভায় এত কৃতবিদ্য লোকের সমাগম হয়; অতি অল্প সভায় এত সুশিক্ষিত ব্যক্তি প্রবন্ধ পাঠ করেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য আমরা যে যে অনুষ্ঠান করিয়াছি, সেরূপ অনুষ্ঠান ইতিপূর্ব্বে অতি অল্পই হইয়াছে। আমাদের মুখে বলা শোভা পায় না, সাবিত্রী লাইব্রেরী জ্ঞান চর্চ্চার নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চায় নবোৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে। তিনি আমাদিগকে উপহাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া এত কথা বলিলাম। নহিলে সাবিত্রী লাইব্রেরীর দ্বারা কত কাজ হইতেছে, এবং সেই সমস্ত কাজ যে কত নীরবে সম্পন্ন হইতেছে, একথা জনসাধারণ সকলেই জানেন। যশের আকাঙ্খায় নানা প্রকার স্বার্থে উত্তেজিত হইয়া আমরা কখনও লোকের দ্বারে দ্বারে প্রত্যেক সংবাদপত্রে জয়ঢাক বাজাই নাই। বিজয় বাবু আর এক স্থলে এইরূপে কেবল মাত্র সত্যের মস্তকে পদাঘাত করেন নাই, এক জন ভদ্রলোককে অকারণ মিথ্যাবাদী বলিতে চেষ্টা করিয়া সুরুচি বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। বীরেশ্বর বাবুর প্রবন্ধ উল্লেখ করিয়া আমি লিখিয়াছি, "সভাস্থলে প্রধান প্রধান প্রতিবাদকারীদের প্রতিবাদ কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত উত্তর ও ইহাতে প্রকাশিত হইল।" বিজয় বাবু লিখিতেছেন, "কই? আমরা ত খুঁজিয়া তাহা পাইলাম না। * * বুঝি মুদ্রাকরের গুরুতর অপরাধে তাহা দেখা গেল না।" বিজয় বাবু অনুগ্রহ পূর্ব্বক চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিবেন, ২১২ শ পৃষ্ঠার শেষ প্যারা হইতে ২১৫ শ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সভাস্থলে প্রতি-

বাদ-কারীদের প্রতিবাদ গুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া হইয়াছে কি না। না দেখিয়া না শুনিয়া হঠাৎ সাধারণের সমক্ষে একজন ভদ্রলোককে অপদস্থ করিবার চেষ্টা কি নিতান্ত অপরিপক্ক বুদ্ধির কাজ নহে? কাজটা কি অত্যন্ত গর্হিত হয় নাই?

পরিশেষে বক্তব্য, তিনি শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক লিখিত "বাল্য বিবাহ ও অবরোধ প্রথা" "প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রভেদ," এবং "হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা" প্রবন্ধ তিনটীর প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আশা করি, ইংরাজি সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে যাঁহারা মোহিত হইয়াছেন, শীঘ্রই তাঁহাদের মোহ দূর হইবে। তাঁহারা শান্ত হইয়া, চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া, স্থিরভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

শ্রীগোবিন্দ লাল দত্ত।

যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ।

(প্রতিবাদ।*)

আপনি ফাল্গুন, চৈত্র,বৈশাখ এই তিন মাসের নব্যভারতে "যৌবন বিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ"শীর্ষক যে তিনটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাএবংশেষ সংখ্যায়"তত্ত্বকৌমুদীর উত্তরে" যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি

* বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে বিবাহ বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন উঠিয়াছে। আমাদের এ সকল বিষয়ে কি মত, এই সময়ে ব্যক্ত করা উচিত বলিয়া তাহা করিতেছি। আমাদের কোন মতে ভুল থাকিতে পারে না, আমরা তাহা মনে করি না। যে সকল বন্ধু আমাদের ভ্রম প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের নিকট আমরা চির ঋণী। বিবাহ বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে একটা বিশেষ আন্দোলন হয়, ইহা আমাদের প্রাণগত কামনা। কারণ, এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ যে কতকটা উদাসীন, ইহা আমাদের স্থির বিশ্বাস। আমাদের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর হইতে কতক আন্দোলন উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা এখনও স্থান বিশেষে আবদ্ধ আছে, সমগ্র দেশের লোক তাহাতে যোগ দিতে পারে নাই। আমাদের কথা আমরা বলিয়া যাইলেই কিন্তু উপকার হয় না। অপর পক্ষের মত জানাও একান্ত উচিত। আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ইনি খুব দক্ষতার সহিত অপর পক্ষ দেখাইতে পারিবেন, আমাদের আশা আছে। আমরা আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে জয় লাভ করিয়া ধন্য হই, এ কামনা রাখি না। আমাদের কথায় ভুল থাকিলে তাহা সংশোধিত হয়,সত্য ও ন্যায়ের রাজ্য বিস্তৃত হয়, পুণ্য ও পবিত্রতায় দেশ উজ্জ্বল হয়, ইহাই প্রাণের কামনা। সুতরাং আমরা বিজ্ঞ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের তর্ক যুক্তির নিকট পরাস্ত হইলেও দুঃখ বা ক্ষোভ থাকিবে না। তাঁহার প্রতিবাদের আমরা অবশ্য সমালোচনা করিব। তার ফল কি হইবে, জানি না। কিন্তু আমাদের প্রবন্ধ এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। প্রবন্ধটা শেষ না হইলে প্রতিবাদের উত্তর দিতে আরম্ভ করিব না। কারণ, প্রতি সংখ্যায় এক বিষয়ে ৩।৪টী প্রবন্ধ দেওয়া যাইতে পারে না। পাঠকগণ দয়া করিয়া একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন। আমাদের প্রস্তাব শেষ হইলে, গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা গুলি আমরা খণ্ডন করিয়া দেখাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। ন, স।

অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইয়াছি। মূলবিষয়ে অর্থাৎ বিবাহের উদ্দেশ্য যে ভোগ ও প্রজা বৃদ্ধি নহে, ইহা যে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির এক প্রধান সোপান, সে সম্বন্ধে আমাদিগের উভয়ের মধ্যে মত বিভেদ নাই। আমি যতদূর জানি, এই মূল বিষয়ে বোধ হয় কোন ব্রাহ্মই আপত্তি করিবেন না। ব্রাহ্মসমাজ এই উচ্চ লক্ষ্য হইতে অনেক দূরে থাকিতে পারেন, এই লক্ষ্যের অনুযায়ী বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে না হইতে পারে, তথাপি ব্রাহ্মসমাজ ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না যে, এই লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া যে বিবাহ হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিবাহ। মূল বিষয়ে মত বিরোধ না থাকিলেও আপনি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ প্রণালীর সমালোচনা করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অনেক কথা আমি বিশেষ প্রতিবাদযোগ্য বলিয়া মনে করি এবং তাহারই প্রতিবাদ করিবার জন্য এ প্রস্তাবের সূচনা।

আপনার কথার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া, তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক যেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছেন, আপনি তাঁহার প্রতি যেরূপ বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়াছেন, যাঁহারা আপনার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদিগেরর প্রতি যেরূপ তীব্র উক্তি করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমার মনে এই আশঙ্কা হইয়াছে যে, আমাকেও বোধ হয় সেই রূপ লাঞ্ছিত হইতে হইবে। আপনি তিরস্কারই করুন, আর পুরস্কারই করুন, আপনার যে সকল কথা আমার আপত্তিজনক বোধ হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন না করিয়া আমি বিরত হইতে পারিতেছি না। আপনি প্রতিপক্ষদিগের প্রতি উচিত ব্যবহার করেন নাই বলিয়া আপনাকে যে অনুযোগ করা হইল, আপনি হয় তো বলিবেন, সে অনুযোগ সঙ্গত হয় নাই। সুতরাং এস্থলে আমার অনুযোগের হেতু প্রদর্শন করা উচিত আপনি দ্বিতীয় প্রস্তাবে লিখিয়াছেন, "ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা তাঁহারা (অনিষ্ট চেষ্টাকারী প্রতিপক্ষ) আমাদিগকে শত্রু মনে করিলেও আমরা যেন চিরকাল তাঁহাদিগকে বন্ধুর ন্যায় মনে করিতে পারি।" এখন দেখা যাউক, তত্ত্বকৌমুদীর উত্তরে আপনি সেই মিত্রদিগের প্রতি কিরূপ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

গত বৈশাখমাসের নব্যভারতের ৩৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে আপনি লিখিয়াছেন, "আমাদিগকে অপদস্থ করিতে যে সকল বাক্‌পটু, ধর্ম্মব্যবসায়ী নব্যব্রাহ্ম প্রবীণের সাজ ধরিয়া আজ আসরে নামিয়াছেন এবং নানাপ্রকার কটূক্তি এবং ঈর্ষার ঢিল নিক্ষেপ করিয়া হিংসা বিদ্বেষের পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা যদি এই স্বেচ্ছাচারিতার দিনে একটু ধর্ম্ম, একটু চরিত্র, একটু নীতির সেবা করিতেন, তবে এত দিন ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইত।" মিত্রের প্রতি যাঁহার এত সদ্ভাব, শত্রুকে তিনি কি বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে আপনি বলিবেন "আমাদের পক্ষে শত্রু কেহই নন।" কিন্তু শত্রু মিত্রের অভেদত্ব যদি এইরূপে প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে "আমার বন্ধু হইতে আমাকে রক্ষা কর" একথা যে অনেকেই বলিতে বাধ্য হইবেন, তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিরোধী" কোন

কোন সম্পাদককে "শিথিল-বিবেক ও ব্যবসায়ী" বলাতে আপনি বিরক্ত হইয়া বলিয়াছেন, "অন্য সম্পাদকদিগকে এই আখ্যায় অভিহিত করিয়া তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক প্রকারান্তরে আপনার ধার্ম্মিকতা এবং বিবেক প্রাধান্য সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কি অহঙ্কারের কথা! ছি, ধার্ম্মিকের পক্ষে কি ইহা শোভা পায়।" আপনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, তত্ত্ব কৌমুদী সম্পাদক "ঘর বাহির শত্রু মিত্র গণনা" করিয়া থাকেন, সুতরাং তিনি আপনার শত্রুপক্ষকে তিরস্কার ও নিন্দা করিয়া যদি "প্রকারান্তরে আপনার ধার্ম্মিকতা ও বিবেক প্রাধান্য"প্রদর্শন করিতে চাহেন, তাহাতে লোকে যত না বিস্মিত হইবেন, আপনার ন্যায় উদারচরিত্র ব্যক্তি যাঁহার "পক্ষে বাহির কিছুই নয়, শত্রু কেহই নন" তিনি যদি তাহার প্রতিপক্ষকে ধর্ম্মব্যবসায়ী, ঈর্ষাপরবশ, ধর্ম্ম, চরিত্র ও নীতি বিবর্জ্জিত ভণ্ডতপস্বী চটুল ব্যক্তি বলিয়া গালাগালি দিতে পারেন, তাহাতে লোকে অধিকতর বিস্মিত ও দুঃখিত হইবার কথা। ধার্ম্মিকের পক্ষে এরূপ ব্যবহার শোভা পায় কি না, সে বিচার আপনিই করিবেন। এস্থলে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নিজকে ধার্ম্মিক বলিয়া কোথাও কি পরিচয় দিয়াছি? একথার উত্তরে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদকও ধার্ম্মিক বলিয়া আত্ম পরিচয় দেন নাই। আপনি বলিবেন, প্রকারান্তরে পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যদি অপরকে শিথিল বিবেক ও ব্যবসায়ী বলায় প্রকারান্তরে আপনার ধার্ম্মিকতার পরিচয় দিয়া থাকেন, আপনি অপরকে"ভণ্ডতপস্বী"ধর্ম্মব্যবসায়ী" "স্বেচ্ছাচারী"ধর্ম্ম চরিত্র নীতি"বিবর্জ্জিত বলিয়া কি প্রকারান্তরে আত্ম ধার্ম্মিকতার পরিচয় দেন নাই? অথবা প্রকারান্তরেই বা বলি কেন? যিনি "গুরুতর কর্ত্তব্যের অনুরোধে * * * আপন * * * হৃদপিণ্ডকে বিসর্জ্জন দিতে" পারেন, বিবেক বুদ্ধিতে যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্তি হওয়া যিনি অধর্ম্মের কাজ" মনে করেন, যিনি ঈশ্বরের উপর "নির্ভর করিয়া মরণকেও আলিঙ্গন করিতে" পারেন, তিনি যদি ধার্ম্মিক নন, তবে জগতে ধার্ম্মিক কে? তাই বলিতেছি, অপরে "আমাদিগকে শত্রু মনে করিলেও আমরা যেন চিরকাল তাঁহাদিগকে বন্ধুর ন্যায় মনে করিতে পারি" ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া শেষে তাঁহাদিগকে অত গালাগালি দেওয়া কি ভাল হইয়াছে?

"নব্যভারত সম্পাদকের অপেক্ষা তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক ও লেখকদিগের ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা অধিক বই অল্প নহে" এই কথায় আপনি তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদককে "জ্যেষ্ঠতাত" বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই। যিনি আপনার অপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞতার দাওয়া করেন, তিনি যদি "জ্যেষ্ঠতাত" হন, তাহা হইলে আপনি যখন বলিতেছেন যে, "আমাদিগের বিবেচনায় বিবাহবন্ধন একটী সংসারের বন্ধন নয়, ইহা একটী ধর্ম্ম বন্ধন। কেবল বিজ্ঞান সম্মত হইলেই ইহাতে মঙ্গল হয় না; কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি সম্মত হওয়া একান্ত উচিত।" অথচ "ধর্ম্মসমাজের কার্য্য সংসারের দিক ও বিজ্ঞানের দিক বজায় রাখিয়া নির্ব্বাহিত হইতেছে, আধ্যাত্মিক দিকের কোনই খোঁজ খবর নাই।" তখন আপনাকে অপরে

কি আখ্যা প্রদান করিতে পারেন, তাহার মীমাংসার ভার আপনার হস্তেই সমর্পিত হইল। "আপনার বিবেচনায়, বিবাহ বন্ধন ধর্ম্ম ও নীতি সম্মত হওয়া একান্ত উচিত।" কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এই "আধ্যাত্মিক দিকের কোনই খোজ খবর রাখিতেছেন না" ইহার দ্বারা কেবল ব্যক্তি বিশেষের অপেক্ষা নহে, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা আপনার বিবাহ বিষয়ক আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যে অধিক, ইহা কি প্রতিপন্ন হইতেছে না? আপনি কি এস্থলে নিজের "অধিক অভিজ্ঞতার অভিমান করেন নাই? আপনি অপরকে যে সকল দোষে অপরাধী করিয়াছেন, তাহা হইতে যখন আপনি নির্ম্মুক্ত থাকিতে পারেন নাই, তখন অপরের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত না করিয়াও ধীরতার সহিত সেই সকল অপরাধ প্রদর্শন করিতে পারিতেন। এসকল গেল অবান্তর কথা। এখন মূল অভিযোগের হেতু অনুসন্ধান করা যাউক।

আপনি বলিয়াছেন, "আমাদের উদ্দেশ্য কুটিল, একথা যাঁহারা বলিবেন, তাঁহারা আমাদিগকে আজও চিনিতে পারেন নাই।" কিন্তু আপনার সম্বন্ধে অপরে যে অবিচার করিয়াছেন, আপনি "বন্ধুদিগের" আন্দোলনকে "বিদ্বেষ পূর্ণ" বলিয়া কি তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অবিচার করিলেন না? আপনি যদি অপরের আন্দোলনকে "বিদ্বেষপূর্ণ" বলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা আপনার আন্দোলনকে "ঈর্ষা প্রণোদিত" বলিলে দুঃখিত হইবেন কেন? পরস্পরের প্রতি এরূপ অবিশ্বাস গরল উৎপাদন করিতেছে, একথা উভয় পক্ষেরই স্মরণ রাখা উচিত ছিল। আপনি নীচ উদ্দেশ্যে আলোচ্য প্রস্তাব লিখিয়াছেন, আমার সে ধারণা নাই। তবে সাধু অভিপ্রায় থাকিলেও লোকের ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে, অমৃত মন্থনেও গরল উৎপন্ন হইতে পারে, একথা আপনি বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। আপনার প্রস্তাবের লক্ষ্য সাধু হইলেও আপনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অতি অবিচার করিয়াছেন, ইহা আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে আপনার প্রধান অভিযোগ এই যে, ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ কার্য্য "সংসারের দিক ও বিজ্ঞানের দিক বজায় রাখিয়া নির্ব্বাহিত হইতেছে" কিন্তু আধ্যাত্মিক দিকের কোনই খোজ খবর নাই।" ১৮৭২ অব্দের ৩ আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ও অব্যবহিত পরে ব্রাহ্মসমাজ সংসৃষ্ট দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রে এ সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। সেই সাময়িক সাহিত্য যদি আপনি একবার পাঠ করিয়া দেখিতেন, আপনি ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে এইরূপ গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। ৺কেশবচন্দ্র সেনের বিরুদ্ধে লোকে আর যে কথাই বলুন না কেন, তাঁহার নীচতম শত্রুও কখনও একথা বলিতে সাহসী হন নাই যে, আধ্যাত্মিকতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্য, বিবাহকালীন আচার্য্যের উপদেশ, উদ্বাহ সঙ্গীত প্রভৃতি হইতে এমন অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যদ্দারা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইবে, বিবাহের এক প্রধান লক্ষ্য যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি, তাহা ব্রাহ্মসমাজ

পূর্ব্বাপর স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে আপনি নূতন কথা কিছুই বলেন নাই। প্রায় পাঁচ বৎসর কাল গত হইল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ সভ্যগণ ক্রমান্বয়ে কয়েকবার সম্মিলিত হইয়া বিবাহের লক্ষ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং অল্প কয়েক মাস হইল পুনরায় এবিষয়ে যে আলোচনা হইয়াছে, সেই সকল আলোচনা সভায় যদি আপনি উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন, ব্রাহ্মসমাজের বিবাহের লক্ষ্য আধ্যাত্মিকতা বিবর্জ্জিত নহে। উদ্বাহ সঙ্গীত হইতে দুই একটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইব যে, ধর্ম্ম ও নীতিকে ভুলিয়া কেবল বিজ্ঞানের দিক বজায় রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজ উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন করেন না।

(১)

"আজি এ সন্তান দুটী মিলিছে তোমার।
শিখাও প্রেমের শিক্ষা খোলহে দুয়ার।
যে প্রেম সুখেতে প্রভু, পঙ্কিল না হয় কভু,
যে প্রেম দুখেতে ধরে মঙ্গল আকার।

* * * * * *

যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে,
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক দুজনে।"

(২)

"পবিত্র প্রেম বন্ধনে বাঁধ হে আজি দুজনে।
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে জীবনে জীবনে।
উভয়ের প্রেমনদী, বহে যেন নিরবধি,
সুখেতে অনন্তকাল তব প্রেম সিন্ধু পানে।

* * * * * *

এই নব দম্পতীরে, রাখ দাস দাসী করে,
চির জীবনের মত তোমার চরণে।"

(৩)

দুই হৃদয়ের নদী, একত্রে মিলিত যদি,
বল দেব, কার পানে, আগ্রহে ছুটিয়া যায়?
সম্মুখে রয়েছ তার, তুমি প্রেম পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়,
সেই এক আশা করি দুই জনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুই জনে চলিয়াছে;
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে,যেনগো আশ্রয়মিলে
দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায়।"

বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করা গেল না, এরূপ সঙ্গীত আরও অনেক আছে। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ "ধর্ম্ম ভুলিয়া বিজ্ঞান সম্মত বিবাহ" দেন, একথা সত্য নহে। আপনি বলিতে পারেন, সঙ্গীতে, উপদেশে, ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যে যাহা আছে, ব্রাহ্মের জীবনে তাহা নাই। না থাকা সম্ভব বটে, কেননা হৃদয়ে যাহা অনুভব করা যায়, জীবনে তাহা পরিণত করা সহজ নহে। জীবনপথে ব্রাহ্মের লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধে আপনার অভিযোগ লক্ষ্য ভ্রষ্টতা নহে, লক্ষ্যহীনতা। সে অভিযোগ অমূলক। এখন আবার ইহাও দেখা আবশ্যক, ব্রাহ্মসমাজ যে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ কিনা। মানুষ আপনার জীবনে ঈশ্বরকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতেছে কিনা, ইহা কেবল অন্তর্যামী ঈশ্বরই জানেন। মানুষ অপরের হৃদয়াভ্যন্তরে দৃষ্টি করিতে পারেন না, সুতরাং অপরের হৃদয়ের অবস্থা সম্বন্ধে

তাঁহার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যখন এক একটী সামান্য বিষয়েই দেখা যায়, একে অন্যের সম্বন্ধে মহা ভ্রম করিতেছেন, একে অন্যের প্রতি অযথা দোষারোপ করিতেছেন, তখন একে অন্যের ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত পরিমাণ করিতে সমর্থ হইবেন, একথা কিরূপে বলা যাইতে পারে? আপনি নিজেই বলিয়াছেন, আপনার "উদ্দেশ্য কুটিল" একথা যাঁহারা বলেন, "তাঁহারা আপনাকে আজও চিনিতে পারেন নাই"। আপনি যখন বন্ধুদিগের আন্দোলনকে "বিদ্বেষ-ভাব পূর্ণ" বলেন, তখন যে আপনিও তাঁহা-দিগকে চিনিতে ভ্রম করেন নাই, একথা কি নিশ্চয়তার সহিত বলিতে পারেন। যখন সামান্য বিষয়েই এত গোলযোগ, পরস্পরের চিনাচিনি এত অল্প, তখন একে অন্যের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরি-মাণ করিতে যাইয়া যে ভ্রম করিবেন না, তাহা কিরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

আইনে "কন্যার বিবাহের ন্যূন বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর ও বালকের বিবাহের ন্যূন বয়স অষ্টাদশ বৎসর ধার্য্য হইয়াছে" ইহা দেখিয়া আপনি অনুমান করিয়াছেন যে, "এই সময়ে এ প্রশ্ন একেবারেই উঠে নাই যে, ১৪ ও ১৮ বৎসর বয়সে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ জ্ঞান জন্মি-বার সম্ভাবনা নাই।" এ প্রশ্ন সে সময়ে উত্থাপিত হয় নাই, এবং "এ সম্বন্ধে তখন কিছুই বিবেচনা" করা হয় নাই, আপনার এ অনুমান যথার্থ নহে। আপনি সে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন নাই, সুতরাং বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া সে সময়ের কথা এরূপ দৃঢ়তার সহিত বলা ভাল হয় নাই। আপনি যদি সেই সাম-য়িক সাহিত্য পাঠ করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই জানিতে পারিবেন, এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা হইয়াছিল। কিন্তু যে সকল "যুবক যুবতীর প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মে দীক্ষা" হয় নাই, আপনি তাহাদিগকে এবং সঙ্ক্ষেপতঃ এদেশের প্রায় সমস্ত লোককে "নরকের পথ ব্যভিচারের পথ" দেখাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এদেশের প্রায় সমস্ত লোক, এই জন্য বলিলাম, কেননা এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে, বাল্যকালে ধর্ম্মভাব বিকশিত হয় না; আপনার মতে বিবা-হের উচ্চ আদর্শ "বাল্য বিবাহে সাধিত হইতেই পারে না" সুতরাং তাহাদিগের নরক ও ব্যভিচার ভিন্ন আর গতি নাই। কিন্তু অপর ব্রাহ্মেরা দেশের সমস্ত লোককে "নরকের পথ—ব্যভিচারের পথ" দেখা-ইয়া দিতে যদি কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন, আশা করি তাঁহাদিগের এ দুর্ব্বলতা ক্ষমার যোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। বিবা-হের উচ্চ আদর্শ জীবনে রক্ষিত না হইলে নরক ও ব্যভিচারের পথ আশ্রয় করিতে হইবে, ইহা বীরত্বের কথা হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞতার কথা নহে। যে সকল মহাপুরুষ ব্রাহ্মসমাজের কুৎসার কথা শুনিয়া আপনার বিজ্ঞতার প্রশংসা করি-তেছেন, তাঁহারা একবার আপনাদিগের নিজনিজ পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখিয়া-ছেন কিনা বলিতে পারি না। আপনার কথা সত্য হইলে তাঁহাদিগের চৌদ্দ পুরুষ যে নরকের কীট হইয়া বাস করিতেছেন, এবং ব্যভিচারে যে তাঁহাদিগের নিজের জন্ম, ব্রাহ্মসমাজের কুৎসা শ্রবণ করিয়া উৎ-

ফুল্ল হইবার সময়ে এ মর্ম্মব্যথায় যদি একবার নিপীড়িত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা আপনার বিজ্ঞতার এত প্রশংসা করিতে সাহসী হইতেন কিনা, বলিতে পারি না। আদর্শ জীবনে পরিণত না হইলেই যদি নরকে গমন ভিন্ন আর উপায় না থাকে, তবে ইহাই বলিতে হইবে যে, ঈশ্বর মানুষের জন্য স্বর্গের ব্যবস্থা করেন নাই; নরকই তাহার বাসস্থান। এমন মানুষ জগতে কে আছেন, যিনি বলিতে পারেন, তাঁহার জীবন আদর্শের অনুরূপ হইয়াছে? আর কেবল এক আদর্শ পূর্ণ হইলেই হইল না, এক আদর্শের অপূর্ণতা হেতু যদি নরককে আশ্রয় করিতে হয়, তবে অন্য আদর্শের অপূর্ণতার ফলও তাহাই হইবে। সুতরাং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ যাঁহার ইহ জীবনে না হইয়াছে, তাহাকেই নরকাশ্রয় করিতে হইবে। এমন মানুষ কে আছেন, যাঁহার জীবনে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে? তবে সকলের পক্ষেই কি নরক এক মাত্র গন্তব্য পথ নহে? এ চিত্র কি ভয়ানক!!

আপনি নিজেই বিবাহের তিনটী লক্ষ্য স্বীকার করিয়াছেন;—শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক। ইহার প্রত্যেক লক্ষ্যই যে ঈশ্বরের বিধান, একথা বোধ হয়, আপনি অস্বীকার করিবেন না। মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি পতিপত্নীর সম্বন্ধে যেরূপ সংসিদ্ধ হইতে পারে, বন্ধুত্বে তাহা সম্পন্ন হইবার পক্ষে কোন বিঘ্ন দেখা যায় না। শারীরিক সম্বন্ধকে অনেকে বিবাহের নীচ লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন, জীব স্থিতি রক্ষাকে আপনি "অসার গণনা" বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরূপ। এ লক্ষ্য নীচ নহে, মানুষের উৎপত্তি অসার গণনা নহে। মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবার পূর্ব্বে মানুষের উৎপত্তি। বীজ ভিন্ন বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না। যে ক্ষুদ্র বীজে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহাতে মহেশের যে মহাশক্তি নিহিত রহিয়াছে, যিনি তাহা অনুভব করিতে পারেন, তিনি রচনা কৌশল দেখিয়া স্তব্ধ হন, তিনি উহাতে নীচ লক্ষ্য বা অসারতার চিহ্ন দেখেন না। মহামতি পার্কার বিবাহের শারীরিক সম্বন্ধে পরম সুখ, অতি গূঢ় লক্ষ্য নিহিত দেখিয়া কৃতজ্ঞতা ভরে ঈশ্বরের চরণে অবনত হইয়াছিলেন। অসার গণনার পরিবর্ত্তে—"মানুষের পক্ষে যে গণনা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ" বলিয়া আপনি উল্লেখ করিয়াছেন, সে গণনাও কি সর্ব্বদা সিদ্ধ হয়? যদি তাহাই হইত, দেবতার গৃহে কখনও অসুরের সৃষ্টি হইত না, ধার্ম্মিকের সন্তান কখনও অধার্ম্মিক হইত না, পণ্ডিতের সন্তান মূর্খ হইত না। অপর দিকে অধার্ম্মিকের ঘরে ধর্ম্মাত্মার জন্ম, কামুকের ঘরে জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ, মূর্খের গৃহে পরম জ্ঞানীর উৎপত্তি হইতে দেখা যাইত না। সর্ব্বত্র মনুষ্যের গণনা ঠিক হয় না কেন, আমাদিগের চিন্তার অতীত কার্য্য ঘটে কেন, এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে আমি অসমর্থ। এস্থলে ফলাফল চিন্তা না করিয়াও একথা বলা যাইতে পারে যে, এক লক্ষ্য সিদ্ধি বা লক্ষ্যত্রয়ের আংশিক সিদ্ধি পাপ নহে, তাহাতে নরকের পথ প্রশস্ত হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পরিমাণে সম্পন্ন হয়, তাহাই পুণ্য। আপনার প্রদর্শিত উক্ত লক্ষ্য যাঁহারা অনুভব না

করেন, তাঁহারাই পাপ করেন, একথা বলা অসঙ্গত। পতি পত্নীর শারীরিক সম্বন্ধ পালন নীতি ও ধর্ম্ম মূলক। পতি অন্য স্ত্রীতে এবং পত্নী অন্য পুরুষে অনুরক্ত হইলে তাহা যদি দুর্নীতি বলিয়া গণ্য হয়, তবে পতি পত্নীর শারীরিক ও মানসিক শুদ্ধাচার, একান্ত অনুরক্তি সুনীতি বলিয়া গণ্য হইবে না কেন? সতীত্ব কি সুনীতি নহে, ইহার মূলে কি ধর্ম্ম ভাব নিহিত নাই? আপনি বলেন, বিবাহ "সংসারের জন্য নয়, স্বর্গের জন্য।" আমি বলি, সংসারের কর্ত্তব্য পালনেই স্বর্গ। সাংসারিক কর্ত্তব্য যাঁহারা বিস্মৃত হন, তাঁহারা স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু স্বর্গলাভ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। শরীরকে উপেক্ষা করিয়া মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যেমন সম্ভবপর নহে, সংসারকে উপেক্ষা করিয়া স্বর্গের প্রত্যাশাও সেইরূপ। ঈশ্বরের নিয়োজিত কর্ত্তব্য পালনেই স্বর্গ। সে কর্ত্তব্য শারীরিকই হউক, মানসিকই হউক, আর আধ্যাত্মিকই হউক, তাহার কাহাকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে। শারীরিক কর্ত্তব্য পালনকে আপনি সংসারের কার্য্য মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইহা যদি সংসারের কার্য্য হয়, আমি বলিব, এই সংসার কার্য্য পালনই বিবাহের প্রধান লক্ষ্য, জীবস্থিতি ইহার মূলে। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অন্য রূপেও সংসিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং বিবাহের এই একটী লক্ষ্য সাধনাও পাপ নহে, ব্যভিচার নহে, ইহাতেও পুণ্য ও ধর্ম্ম আছে, সুনীতির সংশ্রব আছে, ইহা দ্বারা নরকের পথ প্রশস্ত হয় না। যাহারা এই এক লক্ষ্যেই বিবাহ করেন, সেই লক্ষ্যই প্রতিপালন করে, শারীরিক নিষ্ঠা হইতে বিচ্যুত হন না, তাহারা নরকে গমন করেন না, বরং আংশিক স্বর্গাধিকারী হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ আদর্শ-বিবাহ না হইলেও উহা নরকের পথ—ব্যভিচারের পথ নহে।

"ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস" জন্মিবার পূর্ব্বে যে বিবাহ হয়, আপনি তাহাকেই "ব্যভিচার এবং দুর্নীতি" বলিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের বিবাহের এই জঘন্য চিত্র এই "গলদ দেখিয়া দারুণ নিরাশা আসিয়া "আপনার "প্রাণকে অস্থির করিয়া ফেলিতেছে।" এই অস্থিরতার চিহ্ন আলোচ্য প্রবন্ধের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। তবে ইহাই সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, "ব্যভিচার এবং দুর্নীতি" বলিলে লোকে সচরাচর যাহা বুঝিয়া থাকে, আপনি চিত্তের এই অস্থিরতার অবস্থায়ও ব্রাহ্মসমাজের উপর সে কলঙ্ক নিক্ষেপ করিতে অগ্রসর হন নাই। আপনার সমস্ত প্রবন্ধ খুঁজিয়া ইহার অতি সামান্য আভাসও কুত্রাপি পাওয়া গেল না। আদর্শের নিকট ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ নিতান্ত হীনপ্রভ হইলেও, এই মহাকলঙ্ক হইতে যে উহা উন্মুক্ত, ইহাও অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

আপনি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহের আরও কয়েকটী "গলদ" ও "জঘন্য চিত্র" দেখাইয়াছেন "আজ যিনি দাদা কাল তিনি স্বামী" আপনার মতে ইহা একটা "ভয়ানক গর্হিত কার্য্য"। যাহাদেগের সহিত রক্ত মাংসের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব আছে, ব্রাহ্মসমাজে তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহ দিবার রীতি নাই, আইনেও তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

রক্ত সামীপ্য নিবন্ধন সন্তানাদি দুর্ব্বল হইয়া থাকে একথা বিজ্ঞানে বলে; ইহা কেবল "বিজ্ঞান সম্মত" দোষ বলিয়াই এ রূপ বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি অনেক দেশে, অনেক সমাজে এরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে; ইংরেজেরা শালীকে বিবাহ করিতে পারেন না, আইনে উহা নিষিদ্ধ আছে; কিন্তু পিতৃব্য কিম্বা মাতৃব্য কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন, মুসলমানদিগের মধ্যেও এরূপ বিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে। হিন্দুসমাজে মিথিলায় মাতুল কন্যাকে বিবাহ করার রীতি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে এমন অনেক বর্ণ আছে, যাহাদিগের মধ্যে ভাগিনেয়কে কন্যা সম্প্রদান করা রীতি। ব্রাহ্মসমাজের বিবাহে এরূপ রক্তসামীপ্য দোষ ঘটিতে পারেনা। যাহার সহিত কোন রূপ রক্ত সংশ্রব নাই, এমন ব্যক্তিকে এক সময়ে যদি কেহ দাদা ডাকিয়া থাকেন, তবে তাহাকে তিনি বিবাহ করিবার অধিকারিণী হইবেন না, এমন স্থলে বিবাহ হইলে অতি গর্হিত কার্য্য হইবে, আপনি কেবল এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আত্মমতের পরিপোষক কোন যুক্তি দেখান নাই। সম্পর্কের পরিবর্ত্তনে কি নীতি দোষ ঘটে, তাহা না শুনিয়া কোন উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, এরূপপাতান সম্পর্কের পরিবর্ত্তন সকল সমাজে ঘটিয়া থাকে; রক্ত সম্পর্ক স্থলেও যে অনেক সমাজে বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বিবাহে সম্পর্কের "গাম্ভীর্য্য ও পবিত্রতা" উপেক্ষিত হয়, ইহার অর্থ বুঝিলাম না। এস্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য যে, আপনি শব্দ কি ভাবের পরিবর্ত্তনকে দোষ মনে করেন? ব্রাহ্মেরা যখন সকল লোককেই ঈশ্বরের সন্তান ভাবেন, ঈশ্বরের পুত্রকে ভ্রাতা, ঈশ্বরের কন্যাকে ভগিনী মনে করা যখন তাহারা একটী সাধনার বিষয় মনে করেন, তখন এভাব কথায় ব্যক্ত না হইলেও ব্রাহ্মসাধকের হৃদয়ে তাহা পরিলক্ষিত হইবে। এই ভাবটী অন্য কোন ঘনিষ্ঠ ভাবের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাওয়া যদি দোষ হয়, তাহা হইলে আপনি সাধনাতৎপর ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার যে বিবাহ দেখিতে চান, তাহা সম্ভব হয় না। যাঁহারা ঈশ্বরের সন্তান জ্ঞানে অন্য নারীকে ভগিনীর ন্যায় শ্রদ্ধা, সম্মান ও পবিত্রতার চক্ষে দর্শন করেন না, কেবল তাঁহারাই কি বিবাহের অধিকারী হইবেন? এক পবিত্র ভাব অন্য পবিত্রভাবে নিমগ্ন হইলে, তাহা অপবিত্র হয় না। অপবিত্র আকাঙ্ক্ষা যে কোন নারীর সম্বন্ধে করা যায়, তাহাতেই পাপ হইয়া থাকে।

"পাশ্চাত্য সমাজের কুপ্রথা সকল অল্পে অল্পে" ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছে। সে "সমাজে যাহা গর্হিত কার্য্য এ সমাজে তাহাও চলিতেছে" আপনার আর একটী অভিযোগ এই। কিন্তু কোন গুলি পাশ্চাত্য সমাজের কুপ্রথা, তাহা আপনি উল্লেখ করেন নাই। কথার ভাবে বোধ হয়, বর কন্যার এক গাড়ীতে ভ্রমণ বা বিবাহের পূর্ব্বে এক বাড়ীতে বাস কুপ্রথা। অথচ আপনার আর একটী কথায় বোধ হয় আপনি "একত্রে ভ্রমণ উপবেশনের" বিরোধী নহেন, কেবল তাহা "যথাভাবে সম্পন্ন হইতেছে কি না, অভিভাবকের তাহাতে সম্মতি আছে কি না, এ সকলের প্রতি

দৃষ্টি" রাখাই আপনার উদ্দেশ্য। যদি আপনার অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমার ভ্রম না হইয়া থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, কোন্ বর কন্যা অভিভাবকের সম্মতি না লইয়া এক গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াছেন? আর "যেখানে সেখানে" একথাটার অর্থ কি? এমন দৃষ্টান্ত কি একটীও দেখাইতে পারেন যে, বরকন্যা "যেখানে সেখানে" ভ্রমণ করিয়াছেন। বরকন্যা এক গাড়ীতে ভ্রমণ করিলে কি অপরাধ হয়, পাশ্চাত্য সমাজের এ প্রথাটার কি দোষ, তাহা বলিয়া দিলে ভাল হইত। বরকন্যা এক গাড়ীতে "যেখানে সেখানে" ভ্রমণ কালে সহিস, কোচমানকে বিদায় করিয়া দিয়া নিজেরাই গাড়ী চালাইয়া ছিলেন কি না, একথাটা জানান উচিত ছিল। বিবাহ প্রস্তাব অবধারিত হওয়ার পর "বর কন্যা এক বাড়ীতে অনেক দিন বাস করিয়াছেন" এসংবাদ আমি অবগত নহি। আর যদি কোথাও সেরূপ বাস করিয়া থাকেন, তবে তাহারা একা ছিলেন, কি অন্য লোকের সহিত এক গৃহে বাস করিতেন, তাহা বলা উচিত ছিল। আর বিবাহের প্রস্তাব হইবার পূর্ব্বে এক বাড়ীতে বাস করিলে যদি তাহা দূষনীয় হয়, তবে আপনার "প্রদর্শিত ও অবলম্বিত" একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা "কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে? যাহাদিগের সহিত রক্তমাংসের সম্বন্ধ আছে, আপনি কেবল তাহাদিগের মধ্যে একান্নবর্ত্তী-পরিবার-প্রথা সংস্থাপন করিতে চাহেন না, ধর্ম্মবন্ধনও এই মিলনের উপযোগী মনে করেন এবং তদনুসারে কার্য্যও করিতেছেন। তবে কি আপনি বলিবেন, যাঁহারা একবাড়ীতে বাস করিবেন, তাঁহাদিগের পরস্পর বিবাহ হওয়া নিষিদ্ধ? এই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তবে আপনার চিত্রিত বিবাহের উচ্চ আদর্শ কি দূরে নিক্ষেপ করিতে হয় না? এক গৃহে বাস করিয়া দুই হৃদয়ের যখন এক আকাঙ্ক্ষা হয়, একত্রে সাধনা করিয়া উভয়ের উন্নতির গতি যখন এক স্রোতে চলিতে থাকে, এক উদ্দেশ্যে উভয় জীবন উৎসর্গ করিতে যখন ইচ্ছা হয়, তখন যদি দুই জনকে চিরজীবনের জন্য একত্রে মিলিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে বিবাহের উচ্চ লক্ষ কেবল কল্পনার চিত্রে অঙ্কিত থাকিবে, জীবনে কখনও পরিণত হইবেনা। এক গৃহে কেবল একজন পুরুষ ও এক জন স্ত্রীলোকের অবস্থিতি দূষনীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু বহু লোকের এক গৃহে অবস্থিতি যদি দোষের হয়, তাহা হইলে যে বাড়ীতে স্ত্রীলোক আছেন, সে বাড়ীতে পুরুষের স্থান হওয়া উচিত নহে। বন্ধু বান্ধব অতিথি সকলকেই বিদায় করিয়া দিতে হয়। কে বলিতে পারে যে, সে গৃহের কোন অবিবাহিতা স্ত্রী কোন অবিবাহিত পুরুষের প্রেমে মুগ্ধ হইবেন না? ব্রাহ্মসমাজের বরকন্যার প্রতি আপনার যেরূপ অবিশ্বাস, তাহাতে আপনি কোন্ সাহসে একান্নবর্ত্তী পরিবার স্থাপন করিতে চাহিতেছেন? অথবা আপনি কি ইহাই বলিতে চাহেন যে, কেবল বরকন্যাই অবিশ্বাসের পাত্র, অপরকে বিশ্বাস করিতে কোন আপত্তি নাই। আপনার কার্য্য দৃষ্টে যেন ইহাই বোধ হয়। একগাড়ীতে অন্য যুবক যুবতীকে যাইতে দিতে কি আপনার আপত্তি আছে? আমি দেখাইতে পারি যে, আপনি যাঁহাদিগের

অভিভাবক, তাহাদিগের সম্বন্ধে আপত্তি করেন না।

আপনার অপর আপত্তি "যুবতী বিধবা ও প্রৌঢ় বিপত্নীকের" বিবাহ। আপনার মতে এরূপ বিবাহে "ধর্ম্মটা লক্ষ্য নয়"। আপনার নিজের কথায় আপনার নিজ মত রক্ষা হওয়া কঠিন। আপনি বলিয়াছেন, "বিবাহের মূলে যে ধর্ম্ম বন্ধন" বাল্যবিবাহে "সে ধারণা থাকে না।" সুতরাং আপনি "বাল বিধবা ও বালবিপত্নীকের" বিবাহে তত আপত্তি করেন না। কিন্তু এস্থলে ইহা ভাবা উচিত, বাল্যকালে যাহাদিগের বিবাহ হইয়াছে, যাঁহারা ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া সম্মিলিত হন নাই, একে অন্যের ভাল বাসার উপযুক্ত কি না, বিবাহের পূর্ব্বে একথা চিন্তা করিবার সুযোগ যাঁহাদিগের কখনও উপস্থিত হয় নাই, এমন স্বামী স্ত্রীর প্রেমের প্রবাহ যে "অনাবিল পবিত্র" ভাবে স্বর্গের দিকে ছুটিবে, তাহার কি কিছু নিশ্চয়তা আছে? আপনি নিজেইত চন্দ্রনাথ বাবুর মত খণ্ডন করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "বয়স্থ পতি বিবাহের পর বালিকা পত্নীকে গড়াইয়া পিটাইয়া মিশাইয়া লইবেন, একথাটীরও অর্থ আমরা বুঝিলাম না। গড়াইয়া পিটাইয়া ভালবাসা সৃষ্টি করা যায়, আমরা মনে করিতে পারি না।" যদি পরস্পরে ভালবাসা না থাকে, উভয়ের হৃদয়ের গতি, মনের আকাঙ্ক্ষা এক পথে ধাবিত না হয়, তাহা হইলে যে আপনার প্রদর্শিত "একাত্মকভাব" সাধন হইতে পারে না, তাহা প্রদর্শন করা নিষ্প্রয়োজন। এমন স্থলে পতি পত্নীর "কর্ত্তব্য ও জীবনের লক্ষ্য" এক হইল না, তাঁহারা জীবনের উচ্চ কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে পারিলেন না। ইহার পর যদি এক পক্ষের মৃত্যু হয়, এবং অপর পক্ষ আপনার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত রহিয়াছে দেখিয়া আপনার জীবনব্রত প্রতিপালনের জন্য আপন হৃদয়ের অনুরাগী ব্যক্তিকে পুনরায় বিবাহ করেন, তাহা হইলে কি তিনি পাপ করিবেন? এই বিবাহে যে তাঁহার ধর্ম্ম লক্ষ্য নয়, ইহাই কি প্রতিপন্ন হইতেছে? "ধর্ম্ম জীবন" লাভই যদি "বিবাহের পণ" হয়, তবে যে বিবাহে সে পণ ছিল না, কিম্বা পণ থাকিলেও যাহা সিদ্ধ হয় নাই, তাহাতো প্রকৃত বিবাহ নামেই গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং এমন ব্যক্তি যদি পুনরায় বিবাহ করেন, এবং ধর্ম্ম লাভ সেই বিবাহের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে এমন বিবাহকে আপনি অধর্ম্মের কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিতে সাহসী হন কি রূপে? আপনি কি ইহাই বলিতে চাহেন, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, উচ্চ লক্ষ্য বুঝিয়া হউক, না বুঝিয়া হউক, যাঁহারা একবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহকালে পরকালে এক হইয়া থাকিতে হইবে। যদি ইহাই হয়, তবে চন্দ্রনাথ বাবুর "গড়াপিটার" কথাটা তো ঠিক বলিয়াই মানিতে হয়। "যদি গড়া পিটায় ভালবাসা না জন্মে এবং প্রীতিহীন দুই আত্মাকে একত্র ভাবে ইহকালে পরকালে থাকিতে হয়, ও 'ঝগড়া' কলহ "বিবাদের" শোচনীয় অবস্থায় চিরজীবন কাটাইতে হয়, তাহা হইলে তো আপনি তাহাদিগের জন্য "অনন্ত নরক" সৃষ্টি করিলেন। কেবল ইহাই নহে, যাঁহারা না বুঝিয়া বা বুঝিয়াই দুর্ব্বলতা বশতঃ একবার জীবনে কোন অপরাধ বা ভ্রম করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সংশোধনের পথও বন্ধ করিলেন। ইহাই

কি আদর্শবিবাহের লক্ষণ? মানুষ অন্য অপরাধ করিয়া তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিলে অপরাধী হয় না। কিন্তু বিবাহ, যাহা জীবনের একটী অতি প্রধান কর্ত্তব্য, তাহাতে যদি কেহ কোন অপরাধ বা ভ্রম করিয়া থাকে, তবে তাহা হইতে ইহ পরকালে নিস্তার পাইবার সম্ভবনা নাই, ইহা কি সঙ্গত কথা?

"সম্বন্ধের পর অনেক দিন অপেক্ষা করা আপনার মতে বড়ই দূষণীয়। দোষটা কাহার পক্ষে? যদি অল্প বয়স্ক বালক বালিকা অথবা ধর্ম্মবিশ্বাসহীন স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে হয়, তবে সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নাই। কেননা আমি পরে দেখাইব যে,অল্প বয়সের বিবাহে এবং ধর্ম্মহীন ব্যক্তিদিগের বিবাহে ব্রাহ্মসমাজের সহানুভূতি নাই। এরূপ বিবাহ যাহাতে রহিত হয়,ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তবে যাঁহারা ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া বিবাহিত হইতে চাহেন তাহাদেগের পক্ষেও যদি বাগ্দানের পর অধিক দিন অপেক্ষা করা অপরাধ হয়,তাহা হইলে ধার্ম্মিকের চিত্র অপরের চক্ষে বড় প্রীতিকর দেখাইবে না। এস্থলে উচ্চ লক্ষ অপেক্ষা ভোগাভিলাষেরই প্রাধান্য দেখাইতেছেন।

আপনি লোকের এরূপ ধারণা জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, ব্রাহ্মসমাজে সাধারণতঃ ১৪ বৎসরের বালিকার ও ১৮ বৎসরের বালকের বিবাহ হইয়া থাকে এবং কোন স্থলে "বর কন্যার পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয়তঃ ১১।১২ বৎসর বয়সের সময় হইতেই আরম্ভ হয়।" এস্থলে ১১।১২ বৎসর বয়স কাহার, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। বর কন্যা উভয়েরই ১১।১২ বৎসর বয়স বোধ হয়। ১১।১২ বৎসরের বালককে কোন ব্রাহ্ম পিতা মাতা বা অভিভাবক বিবাহ দিতে চাহেন এবং কন্যা মনোনয়ন করিয়া উভয়ের দেখা সাক্ষাতের সুযোগ করিয়া দেন, একথা আমি কখনও শুনি নাই এবং বিশ্বাস করিতে পারি না। ১১।১২ বৎসর বয়সের বালিকার "বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক" করিয়া বর কন্যার দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া কেহ দিয়াছেন, আমি একথাও শুনি নাই। কন্যার বয়স চৌদ্দ বৎসর পূর্ণ হইলেই বিবাহ দিবেন, এমন ইচ্ছা কোন কোন ব্রাহ্মের আছে জানি। কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প, এবং তাঁহারা বর কন্যার দেখা সাক্ষাতের সপক্ষ নহেন। কন্যার ১১।১২ বৎসর বয়সের সময় হইতেই তাঁহারা বরকে দেখা সাক্ষাৎ করিতে দিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। আপনার এ-কথা অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত বলিয়া বোধ হয়। আপনি কি এই কথার সমর্থনকারী দৃষ্টান্ত দুই চারিটী দিতে পারেন? ব্রাহ্মেরা সাধারণতঃ ১৪ বৎসরের বালিকার ও ১৮ বৎসরের বালকের বিবাহ দিয়া থাকেন, একথাও ঠিক নহে। ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক নারীর এবং ১৮ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষের বিবাহ হইতেই পারে না। উক্ত আইন প্রচলিত হওয়ার পর যত বিবাহ হইয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল একটী বিবাহের পাত্র কেশব বাবুর পুত্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন। আর একটী বিবাহে পাত্রের বয়স ১৯ বৎসর ছিল। তদ্ব্যতীত যত বিবাহ হইয়াছে,তাহার কোন বিবাহেই পাত্রের বয়স ২১ বৎসরের ন্যূন

নহে এবং ২১ বৎসর বয়স্ক পাত্রও কেবল মাত্র দুই তিনটী। সুতরাং ১৮ বৎসরের পাত্রের বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে সাধারণতঃ হইয়া থাকে, একথা অতি অসঙ্গত। ব্রাহ্ম-সমাজে যে সকল বিধবার বিবাহ হইয়াছে, তাঁহাদিগের অধিকাংশই বিবাহকালে প্রাপ্ত-বয়স্কা ছিলেন। ১৬, ১৭, ১৮ বৎসর বয়স্কা বিধবা ৭।৮ টীর অধিক বিবাহিত হন নাই। কেবল ১৫ বৎসর বয়স্কা দুইটী বিধবার বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার একটীর বিবাহ হিন্দু পিতা মাতা নিজে যাজ্ঞিক হইয়া ব্রাহ্ম পাত্রের সহিত দিয়াছিলেন। অপরটী নব্যভারত সম্পাদকের নিজের গৃহে, তাঁহার নিজ আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া-ছিলেন। যতদুর নির্ণয় করিতে পারা গিয়াছে, তাহা দেখিয়া জানা যায় যে, ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে ৬০টী কুমারীর বিবাহ হইয়াছে, তন্মধ্যে কেবল ১৪টী ১৪ বৎসর বয়স্কা ছিলেন। তন্মধ্যে তিনটী ব্রাহ্ম পিতা মাতার সন্তান নহেন এবং ব্রাহ্ম গৃহেও প্রতিপালিত হন নাই। ১৫ বৎসর বয়স্কা কুমারী ১৬টী, অবশিষ্ট ১৬ বৎসর ও তদধিক বয়স্কা। ইহার দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, যে সকল ব্রাহ্ম কুমা-রীর ১৪ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদিগের সংখ্যা একষষ্টাংশের বড় অধিক নহে। ২০, ২১, ২২ বৎসর বয়সে অনেক ব্রাহ্মকুমারীর বিবাহ হইয়াছে এবং এই বয়সের অনেক ব্রাহ্মকুমারী এখনও অবিবাহিত আছেন। আপনি ইহাও জানেন যে, অনেক ব্রাহ্ম চৌদ্দ বৎসর বয়স্কা বালিকার বিবাহে যোগ দেন না। চৌদ্দ বৎসরের বালিকার বিবাহ দান-রীতি ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

তবে আপনি বলিবেন, অধিক বয়সে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হইলেই বা কি হইল? "বিবাহের উপযুক্ততা বয়সানুসারে নির্দ্দেশ না করিয়া চরিত্র ও ধর্ম্ম জীবন গঠনানু-সারে নির্দ্দেশ করা উচিত। অভিভাবকের মতামতের উপর এসম্বন্ধে অধিক পরিমাণে নির্ভর করা উচিত।" কেবল বয়সের উপর নির্ভর করিয়াই যে ব্রাহ্মসমাজ বিবাহ দেন, বর কন্যার চরিত্র ও ধর্ম্মজীব-নের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না, একথা কি সত্য? অভিভাবকের মতামতের উপর নির্ভর না করিয়া কয়টী বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে সম্পন্ন হইয়াছে? বর কন্যার বয়স একুশ বৎসর পূর্ণ না হইলে তো অভিভা-বকের সম্মতি ব্যতীত বিবাহ হইতেই পারে না। চরিত্র ও ধর্ম্ম জীবন গঠিত হইয়াছে কি না, ইহা নির্দ্ধারণের ভার আপনি অভি-ভাবকের হস্তে রাখিতে চাহেন। অভি-ভাবকের হস্তে এই ভার রাখিলে যদি কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজে যে সকল কুমারীর বিবাহ হইয়াছে, তাঁহাদিগের বিবাহে "ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে কোন সংবা-দই" ছিল না, একথা কি পরস্পর বিরোধী নহে? আর একটী কথা "চরিত্র ও ধর্ম্ম জীবন" গঠিত হইয়াছে কি না, তাহা নির্দ্দেশ করিবার সহজ উপায় কি? আপনি যাঁহাকে ধার্ম্মিক মনে করিতে পারেন, অপরের তাঁহার সম্বন্ধে সমুচিত বিশ্বাস না থাকিতে পারে, আবার অপরের যাহার ধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রতি বিশ্বাস আছে, আপনার তাঁহার প্রতি সমুচিত বিশ্বাস থাকিতে না পারে। এক সময়ে যাঁহাকে আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন, অন্য সময়ে আবার তাহার প্রতি সেই বিশ্বাসের অভাব হইতে

পারে। এতদ্ব্যতীত আপনি এক প্রকারের কার্য্যকে প্রকৃত ধর্ম্মের কার্য্য মনে করিতে পারেন, অন্যে তাহাকে সেরূপ করিতে না পারে। সুতরাং ভিন্ন লোকের ভিন্ন সংস্কার বশতঃ এই বিষয়ে মতের একতা থাকা কঠিন। এই মত বিভেদ বশতঃই আপনি সম্ভবতঃ মনে করিয়া থাকিবেন, ব্রাহ্ম সমাজে পাত্র পাত্রীর ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় না। ব্রাহ্মেরা এবিষয়ে উদাসীন, আমি একথা বলিতে পারি না।

"ব্রাহ্মসমাজে দ্বাদশদিন যাপন করিতে না করিতেই বিবাহের আয়োজন চলিল" এরূপ ঘটনা ব্রাহ্মসমাজে কয়টা ঘটিয়াছে? আপনি কি ইহা অবগত নহেন যে, পাত্রপাত্রী ব্রাহ্মসমাজে অন্যূন এক বৎসর না থাকিলে অনেক ব্রাহ্ম তাহাদিগের বিবাহে যোগ দেন না এবং এরূপ বিবাহ ব্রাহ্মসমাজে ক্রমেই অতি অল্প হইয়া আসিতেছে। বর কন্যার সহিত সকলের পরিচয় থাকিতে না পারে, সে কারণে বিবাহে যোগ না দেওয়া সঙ্গত হইবে না। তবে অভিভাবককেও চিনেন না, কিম্বা অভিভাবকের উপর বিশ্বাস নাই, এমন কয়টী বিবাহে ব্রাহ্মেরা যোগ দিয়াছেন? বরং আমি ইহাই জানি যে, অভিভাবকের প্রতি বিশ্বাস থাকিলেও, কোন কোন বর প্রকৃতপক্ষে চরিত্রবান কি না, এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, অনেক ব্রাহ্ম সেরূপ বিবাহে যোগ দেন নাই; কোন কোন বিবাহ ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়াই গণ্য হয় নাই। এসকল কি সমাজের জীবনীশক্তির পরিচায়ক নহে?

আপনার মতে বরকন্যা নির্ব্বাচন করিবার ভার অভিভাবকের উপরই প্রধানরূপে থাকা আবশ্যক; তবে "বরকন্যারও কতক মতামত থাকা উচিত।" আপনি একাযটা ভাগাভাগী করিয়া ফেলিতে চাহেন। কিন্তু সুগঠিত চরিত্র ব্যক্তির পক্ষেও যদি এই কাযটা ভাগাভাগীর উপর নির্ভর করিতে চাহেন, তাহা হইলে আপনার আদর্শ বিবাহ যে কি রূপে সাধিত হইবে, আমি বুঝিতে পারি না। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় আজ প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব, তবে এই মাত্র জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, যে স্থলে অভিভাবক এবং পাত্র কন্যার মত স্বতন্ত্র হইবে, তথায় কাহার মত প্রবল হইবে?

আপনি যে সকল অবান্তর বিষয়ের আলোচনা উপস্থিত করিয়াছেন, একটা প্রস্তাবে তাহার আলোচনা হইতে পারে না, এই হেতু আমি কেবল মূল অভিযোগ গুলির সম্বন্ধেই আমার অভিমত ব্যক্ত করিলাম। পরিশেষে একটী কথা বলা আবশ্যক। আপনি অন্য দেশের লোকের প্রতি অতিশয় অবিচার করিয়াছেন। আপনি লিখিয়াছেন "বাল্য বিবাহে ভারতে যে কুফল ফলিতেছে, ধর্ম্মশূন্য যৌবনবিবাহে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যে সহস্রাংশে তদপেক্ষা অধিক কুফল ফলিতেছে, একথা কোন ইতিহাসজ্ঞ অস্বীকার করিতে পারেন না। আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া আমার অনভিজ্ঞতা দূরীকরণার্থ উল্লেখ করিবেন যে, কোন্ দেশের কোন্ ইতিহাসে উভয়ের ফলাফল তুলনা করিয়া এরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে?

শ্রীদ্বারকানাথ গাঙ্গোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

তরী বহে যায়।

১

তরী ব'হে যায়,
আঁধারের ছায়।
মেঘেরা আকাশে
ঘনাইয়া আসে।
বনানী দুধারে
শ্বসিছে আঁধারে।

দূরে, নদী পারে,
কুটীরের দ্বারে,
জ্বলিতেছে দীপ
করি টিপ্ টিপ্।

যা বেড়াই খুঁজি,—
এ নির্জ্জন গ্রামে,
চাষীদের ধামে
তাই আছে বুঝি!
সে উপকথায়
দিন বুঝি যায়!

২

তরী ব'হে যায়,
আঁধারের ছায়।
মেঘেরা আকাশে
ঘনাইয়া আসে।

অশ্বত্থ নিবিড়,
ভগন মন্দির।
কাংস্য ঘণ্টা রোল,
বম্ বম্ বোল।
উদাস হৃদয়,
মায়া সমুদয়!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

তারা।

রমণীর ভালে যেন সিন্দুর বিন্দুর
মৃদু রেখা,
সিন্ধুর বুকেতে যেন মেঘে ঢাকা চাঁদ
আধ দেখা,
বিষাদ মাথান মুখে অধরের কোণে
ক্ষীণ হাসি,
অশ্রুভরা জ্যোতিহারা আঁখে যেন দ্রুত
জ্যোতিরাশি,
নিশার ললাট ভাগে নিত্য ওঠ ফুটে,
নিত্য যাও,
কি কাহিনী মিলাইয়ে প্রকৃতির ভালে
নিত্য গাও?
তুমি কিহে নিশার প্রহরী, দেব দূত
স্নেহধারা?
অন্তরের বাহিরের তুমি কি মিলন
ওহে তারা?

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

তারকা।

তুমি দেবি নগ্ন প্রাণ, অসীম সুন্দর,
দূর—দূর, কত দূর, অতি উচ্চতর—
আমাতে তোমার সত্তা, তোমাতে আমার,
প্রাণে প্রাণে মেশামেশি একি একাকার,
যখনি গো গাই গান তুমি এস হেসে,
আঁখি কোণে কত কথা বল হোথা বসে।
দেখ দেবি! মনে কর ভাব একবার,
কি সম্বন্ধ প্রাণে প্রাণে তোমার আমার।
উপল-মণ্ডিত সেই সাগরের কূল,
একটী বোঁটায় সেথা ছিনু দুটী ফুল।
অবস্থার বিপর্য্যয়ে, তুমি জ্যোছনার ছবি,
আমি হেথা মরতের, প্রকৃতির দীন কবি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

সবে যায় ভুলে।

কক্ষ ভ্রষ্ট তারাটির মত ;—
কিম্বা নিশিথিনী বুকে বীণার ঝঙ্কার ;—
অথবা মধুর হাসি, বাসন্তি প্রকৃতি মুখে ;—
শ্যামল দুর্ব্বার দলে, অথবা শিশির হার ;—
রবি করে জলবিম্ব প্রায় ;—
অথবা নিদাঘে যথা মলয় পবন ;—
তেমতি দণ্ডের তরে ধরায় জীবন-খেলা।
এই জাগরণে আছি, এই ঘুমে অচেতন!

পবন বহিয়ে যায় ধীরে।
জলবিম্ব মিশে যায় তটিনীর জলে।
নিদাঘের মেঘ ছায় বসন্তের হাসি মুখ।
শিশির শুকায়ে যায় ;—
মগ্ন তারা মহাশূন্য কোলে।
তেমতি ফুরালে খেলা,
অমনিই সবে যায় ভুলে!

শ্রীকিশোরীলাল গুপ্ত।

বসন্তের স্মৃতি।*

১

এক দিন মধু মাসে শুনেছি, দেখেছি,—
পাপিয়ার স্বরে কাঁপিল সোহাগে
প্রেমের মধুর গান ;
প্রেমে ভোর বায়ু চুমি মাতাইল
মুকুল-বধূর প্রাণ ;
ছোট ছোট ছায়া পরী-নারী মত
নাচিল মনের সুখে,
সুতনু তনুতে করি কোলাকুলি
প্রশান্ত-আলোর বুকে।

২

শুনেছি, দেখেছি, হলো বহুদিন,
ক্ষণেকের তরে বসন্তে নবীন,—
পাখী-কল-কণ্ঠে প্রেমের কথা,
চূত মুকুলের মধুর ব্যথা,
ছায়া (রবি প্রিয়া) হরষে রঙ্গিনী
সুতনু-শরীর আলো-বিহারিণী ;—
জাগিছে স্মৃতিতে সকলি এখন
সুন্দরে মধুরে অপূর্ব্ব মিলন ;
কতই সুন্দর, মধুর কত
স্মৃতি-পথ-চারী বসন্ত বিগত।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

* After "Parblo's song" in George Eliot's "Spanish Gypsy."

চন্দ্রের প্রতি। (১)

কি আছে তোমার চাঁদ! যাহে বিচলিত
করেরে হৃদয়? হায়, শৈশবে সতত
পুঁছিয়াছি অশ্রুজল, তোর হাসি ভরে ;
বোনটী আমার যেন ; তোরি হাত ধোরে,
অন্তরীক্ষে সাঁঝাসাঁঝি যেতাম ছুটিয়া,
না হোলে প্রভাত আর আসিনি ফিরিয়া!
বৃক্ষ হোতে হেন ফল তুলিনি কখন,
ও মাধুর্য্যে স্নিগ্ধ যার না হত আনন!
ফলময় জল, ভাবে অদ্ভুত বচন,
যখন সে জল পরে, মিলে মিলে নৃত্য করে,
এক সাথে তোর আর আমার নয়নঃ
ও চারুনয়নে তুমি, না হেরিলে বনভূমি,
অরণ্যের শ্যামলতা, কুঞ্জের মাধুরী,
অপূর্ণ সতত যেন রহিত সুন্দরি!

* * * *

বয়স হোয়েছে এবে, এখনো তোমার—
মিশে আছে ও কিরণে আকাঙ্খার ধার।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

(১) Keats এর Endymion হইতে। ইংরাজিতে চন্দ্র স্ত্রীলিঙ্গ।

যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ। (৪র্থ)

স্বেচ্ছাচারিতা, ধর্ম্মহীনতার একটী প্রধান কারণ। ভগবানের বিধান না বুঝিতে পারায়, এবং স্বেচ্ছা বা সংসারাসক্তির প্রবল উত্তেজনায়, মানুষ যথাস্থানে পরিণীত হইতেছেন না, বলিয়াছি। বিলাসিতা ধর্ম্মহীনতার আর একটী কারণ, তাহাও ইঙ্গিতে বলিয়াছি। বাস্তবিক বিলাসিতা বর কন্যা মনোনয়নের পথে এক কঠিন অর্গল দিয়া রাখিতেছে। বাহ্যবেশ ভূষার আচ্ছাদনে শরীর ঢাকিয়া, মানুষ যাহা নয়, তাহাই জগতে দেখাইতেছে। এ সকল কথা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিয়া মনোনয়ন-প্রথা সম্বন্ধে অন্যান্য কথা লিখিব।

নানা কারণে লোকের মন সংসারের দিকেই অধিক অনুরক্ত। সংসারটা প্রত্যক্ষ, স্বর্গটা কিছু অপ্রত্যক্ষ। সংসারের নানা সুখ কামনায় মানুষ বড় ব্যতিব্যস্ত। সংসার ধরিয়া স্বর্গে উঠা যায়,এ গণনা করিয়া অতিঅল্প লোক চলে। স্বর্গ বা ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল সংসারের জন্য সংসার-সেবা করে—অধিকাংশ মানুষ। টাকা কড়ি, যশ মান, রূপ রস, এই সকল দিকেই মানুষের ঝোঁক অধিক। ভাল খাইব, ভাল পরিব, ভাল থাকিব—এ চিন্তা অতি শৈশব হইতে মানুষকে ধরে। চরিত্রবান হইব, বিশ্বাসী হইব, ভক্ত হইব—এ সকল চিন্তা অতি অল্প লোকের মধ্যে নিবদ্ধ। দেশের প্রবীণ লোকদিগের প্রদত্ত শিক্ষাও সেরূপ নয়। পিতা, মাতা, সন্তানের বাল্যকাল হইতেই, বেশ ভূষার প্রতি অধিক মনোযোগী হইয়া পড়েন। বিদ্যা শিক্ষার জন্যও কেহ কেহ মনোযোগ করেন বটে, কিন্তু বালক বালিকার নীতি শিক্ষার প্রতি শতকরা একজন অভিভাবক মনোযোগী কিনা সন্দেহ। সংসার সাধনের জন্য, সংসারের শিক্ষা, অর্থকরী বিদ্যা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু সে সকল মানুষের পরিণাম নয়। স্বর্গই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য। স্বর্গের শিক্ষা,ভগবৎ প্রেমও জ্ঞান লাভ সহস্র গুণে অধিক প্রয়োজনীয়। কিন্তু কি এক দুঃসময় উপস্থিত হইয়াছে, এ দিকে দৃষ্টি অতি কম। এই একমাত্রলক্ষ্যের প্রতি মানুষ যেরূপ উদাসীন, এরূপ কিন্তু সংসার সম্বন্ধে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধী লাভের সহিত কত যুবক যে অহঙ্কারী, আত্মাভিমানী, হইয়া সংসারে ফিরিতেছেন, কে না জানেন? কলেজে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও কত যুবক যে আজ কাল নীতি ও চরিত্রহীন হইয়া সাংসারিকতার দাস হইয়া ঘুরিতেছেন, তাহাই বা কে না জানেন। এই সকল চরিত্রহীন শিক্ষিত যুবক বৃন্দের উত্তেজনায়, ছলনায় দেশের যে কি শোচনীয় চরিত্রহীনতার ছবি ফুটিয়া পড়িতেছে,তাহা কল্পনা করিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। পমেটম্, লেবেণ্ডার, হুউডিকলং আতর, ও গোলাপ রঞ্জিত ফুরফুরে ধুতি পরিধেয়, চেন্ ঘড়ি শোভিত, অহঙ্কারস্ফীত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কথা দূরে থাকুক। তাহাদের নিকট দেশ অনেক আশা করিয়া থাকিলেও, সে আশায় অনেক স্থানে ছাই

পড়িয়াছে। তাঁহারা সংসারের কীট হইতে বসিয়াছেন, তাহাই হউন। পবিত্র ব্রাহ্ম-সমাজের উজ্জ্বল ছবি সাংসারিকতার ঘোরতর বিলাসের ইন্ধনে ধূমময় হইয়া উঠিবে, কে স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? অবশ্য একথা স্বীকার্য্য, কতিপয় সাধু ভক্ত সন্তান সমাজের এই প্রবল বিলাসের স্রোত ফিরাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টায় যে বড় সুফল ফলিতেছে, মনে করিতে পারিতেছি না। দিন দিনই বেশ ভূষার দিকে অনেকের ঝোঁক বাড়িতেছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশীয় মহিলাদের অলঙ্কারের প্রতি অধিক ঝোঁক ছিল। গহনার উত্তেজনায়, এদেশের কত পত্নী স্বামীকে চরণে ঠেলিয়া খেয়ালের সেবা করিয়াছেন, সংখ্যা করা যায় না। ব্রাহ্মসমাজে সেরূপ দৃশ্য ঘটে নাই। কিন্তু ব্রাহ্ম বালক বালিকার মধ্যে যে পরিচ্ছদাদির প্রতি একটা ভয়ানক আসক্তি বাড়িয়া উঠিতেছে, একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। বিলাসের দিকে যখন মানুষের আন্তরিক ঝোঁক পড়ে, তখন যে ধর্ম্মে বড় একটা মতি থাকে না, এ কথায় সন্দেহ বড় কম। আজ কাল নানাপ্রকার নূতন নূতন প্রণালীতে এই বেশ ভূষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। একটা অতি সামান্য রকমের জ্যাকেট বা কোট প্রস্তুতে ৭।৮ টাকা লাগে। কত প্রকারেই বাহ্য শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। ইহার সহিত ধর্ম্মে মতি গতিও অনেক কমিয়া যাইতেছে। এ দোষ কাহার? আমাদের মতে এ দোষ—উপদেষ্টা এবং অভিভাবকদিগেরই অধিক। হিন্দু অভিভাবকেরা যেমন স্কুলে বিদ্যা শিক্ষার জন্য বালকদিগকে পাঠাইয়াই অনেক স্থলে সন্তুষ্ট থাকেন, নীতি শিক্ষা যে তাদের একটা লক্ষ্য, কুকার্য্যে যোগ দেওয়া যে ভয়ানক গর্হিত কার্য্য, এ সকল বিষয়ে যেমন বিশেষ কোন শিক্ষা দেন না, ব্রাহ্ম উপদেষ্টা বা ব্রাহ্ম অভিভাবকগণও, সমাজে যাতায়াতের পথ খুলিয়া দিয়া, সেইরূপ, অন্য বিষয় সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত। কেবল কি নিশ্চিন্ত?-না। তাঁহারাই প্রকারান্তরে বালক বালিকাদিগের বিলাসের খেয়ালে ইন্ধন দিতেছেন—ধার কর্জ্জ করিয়াও পরিচ্ছদাদির উৎকৃষ্টতা বজায় রাখিতেছেন। ভিতরের দিকে দৃষ্টি পড়ুক, চরিত্র ভাল হউক, ধর্ম্মে মতি হউক, এ সকল ইচ্ছা, প্রকারান্তরে, যেন অভিভাবকদিগের মন হইতে বিদায় লইতেছে। কেন বলিতেছি?—না হইলে—বালক বালিকাদিগের বেশ ভূষা লইয়া তাঁহারা যত ব্যস্ত, চরিত্রগঠনে তদপেক্ষা অধিক ব্যস্ত হইতেন। আমরা অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মের মুখে আক্ষেপ করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, "গরীব লোকের ব্রাহ্ম হওয়া বড়ই দায় হইয়া উঠিল। নবাবের মত জাঁকজমকের জন্য এত টাকা কোথায় পাইব?" আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এক সময়ে যাহারা আক্ষেপ করেন, তাঁহারাও অবশেষে দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, ধার কর্জ্জ করিয়া, বালক বালিকাকে নানা সাজসজ্জায়, সাজাইয়া তোলেন। এ সকল অন্যায় কি ন্যায়, সে বিষয়ে মতভেদ থাকা সম্ভব। সভ্যতা রক্ষার জন্য পরিচ্ছদ ইত্যাদির উৎকৃষ্টতা সাধন প্রয়োজনীয় কিনা, সে গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চাই না। আমরা এই মাত্র বলি, যার অবস্থায় কুলায় না, তার এ সম্বন্ধে অধিক অগ্রসর হওয়া ভাল নয়। আমরা এই মাত্র বলি, ধর্ম্ম

সমাজের পক্ষে এ সকল বাহ্য-বিষয়ে ঝোঁক ভাল নয়। এই সকল দিকে আদর যত কম থাকে, ততই ভাল। চরিত্র গঠন ধর্ম্ম সমাজের প্রধান লক্ষ্য। চরিত্র গঠিত হইলে আর চাই কি?—বাহ্য পোষাক পরিচ্ছদের জাঁকজমক ইত্যাদি কিছুই চাই না। ভিতরে যে দেবত্ব ঋষিত্ব পাইয়াছে, বাহিরে তার মলিন পোষাক থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। ধর্ম্মসমাজে জীর্ণ শীর্ণ মলিন বস্ত্র-পরিধায়ী, চরিত্রবান ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর হওয়া উচিত। আর চরিত্রহীন হইলে, হাজার জাঁকাল বেশ ভূষায় শোভিত হইলেও, লোকের আদর পাওয়া উচিত নয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, অনেক স্থলে তাহা হয় না। একজন চরিত্রহীন লোক খুব জাঁকজমক করিয়া বাড়ীতে আসুন, দেখিবে, অনেক স্থলে সে ব্যক্তি ঐ ছিন্নবস্ত্র-পরিধায়ী চরিত্রবান লোকাপেক্ষা অধিক আদর সম্ভাষণ পাইবে। কেবল হিন্দু সমাজের কথা বলিতেছি না। ব্রাহ্মসমাজও কতকটা ধন-গৌরব বাহ্য-গৌরব ইত্যাদির অধিক আদর করিতেছেন, কিন্তু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কে জানে, চরিত্রবান ও ধার্ম্মিককে অবহেলা করিতেছেন। এই কুদৃষ্টান্ত দেখিয়া বালক বালিকারা কত কুশিক্ষা পাইতেছে। কিন্তু তবুও বাহ্যাড়ম্বরের সাজসজ্জা অপ্রতিহত প্রভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বাহ্য বস্তু সকলের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ পড়ায়, বালক বালিকারা অন্তঃসারশূন্য হইয়া, দিন দিন ভয়ানক বিলাসের দাস দাসী হইয়া পড়িতেছেন। খোলার ঘরে বসিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে এখনকার শিক্ষিতা বালিকারা কত বিরক্ত। বাজার হইতে মৎস্য তরকারী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিতে এখনকার বালকেরা কত লজ্জা বোধ করে। কথায় কথায় মান বাড়ে, কথায় কথায় মান যায়। মান সম্ভ্রম পাইবার জন্য প্রাণের একটা গভীর লালসা। বাহ্য শোভা সৌন্দর্য্য, গৌরব আস্ফালন, এখনকার সময়ের লোকের একটা প্রধান আদরের সামগ্রী। বরকন্যার মনোনয়নের সময় এই বাহ্য বিলাসপ্রিয়তা যে কত স্ফূর্ত্তি পায়, তাহা সংক্ষেপে বলা যায় না। চরিত্রের বলে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা অপেক্ষা, শোভা সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতেই যেন বর কন্যা অধিক মনোযোগী, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংসারটা প্রত্যক্ষ, স্বর্গটা কিছু অপ্রত্যক্ষ। সুতরাং এই সংসারের বাহ্য সম্পদ বিভব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর পাইবে, তাতে সন্দেহ কি? বাস্তবিক, খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, ইহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, মনোনয়ন-প্রথায় ঢাকাঢাকি চাপাচাপি ভাব বাহ্য সৌন্দর্য্যের তাড়নায় অধিক স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। বিবাহের প্রস্তাবের পর যে দেখা সাক্ষাত হয়, তাতে বরকন্যার ভিতরের সৌন্দর্য্য বড় একটা অধিক জানা যায় না, কারণ উভয়ই তখন কিছু সতর্ক হন। অন্য দিকে উভয় যদি উভয়কে ঠকাইতে প্রস্তুত হন, তবে মিষ্ট আলাপে, মিষ্ট হাসিতে পরস্পর যে পরস্পরকে অল্পেই ভুলাইয়া ফেলিতে পারেন, তাতেই বা বিচিত্র কি? বস্তুত অনেক স্থলে ইহা হওয়াই সম্ভব। অনেক সময়, বাহ্য সৌন্দর্য্যের চাকচিক্যে যে অনেকে ভুলেন, তাতে বড় ভুল নাই। অনেক সময় দেখা যায়, বাহ্য শোভার জন্যই বর

কন্যা অধিক লালায়িত। অন্তরের গুণ না জানিয়া কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যে মজিলে, মিলন কিছুতেই গাঢ় হইতে পারে না। কারণ বাহ্য শোভা সৌন্দর্য্য অধিক দিন স্থায়ী থাকে না। অন্তত কতক ভিতরের সৌন্দর্য্য জানিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। বাহ্য আকৃতিতে কতক ভিতর জানা যায় বটে, কিন্তু তাহাও অনেক স্থলে বেশ ভূষায় ও বাহ্য জাঁকজমকে চাপা থাকে। অভিভাবকগণ যদি এস্থলে চরিত্র সম্বন্ধে মতামত দিতে অনধিকারী হন, তবে এস্থলে বর কন্যা যে পরস্পরকে চিনিতে ভুল করিবেন না, কেমনে বলিব ? চারিত্র্য, মহত্ত্ব ও প্রকৃত ধর্ম্মভাব অল্প দিনের দেখা সাক্ষাতে বুঝা কিছু কঠিন। তার পর পরস্পরকে ঠকাইতে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে বুঝা যে আরো কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বরকে ভুলাইতে কন্যা চেষ্টা করেন; কন্যাকে ভুলাইতে বর চেষ্টা করেন। উভয়ে উভয়ের হৃদয়জাত ভাররাশিকে চাপিয়া রাখিয়া, বাহ্য শোভার আকর্ষণে উভয়ের মন পাইলেন। তারপর বিবাহ-মিলন হইল। তারপর দুবৎসর বাদে উভয় উভয়কে প্রকৃতরূপ চিনিলেন। এমন কি, পূর্ব্বে যেরূপ পরস্পরকে বুঝিয়াছিলেন, মনে কর, এখন তার ঠিক বিপরীত রূপ বুঝিতেছেন। এখন ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত—দারুণ অশান্তি উপস্থিত। বিবাহ-ভঙ্গ-প্রথা যখন প্রচলিত নাই, এবং থাকাও যখন উচিত নয়, তখন ভাব, কত অশান্তি ভোগ করিতে হয়। পরস্পরের মত যখন পরিবর্ত্তনশীল, তখন অন্য কারণেও ভবিষ্যতে অমিল হইতে পারে। কিন্তু সে কথা এখানে বিচার্য্য নয়। ভুল বুঝাতে যে দুর্ব্বিসহ কষ্ট হয়, সে কষ্টের সহিত অন্য কষ্টের তুলনা হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, তাহারা নিজেরাই যখন পায়ে শৃঙ্খল দিয়াছে, তখন আর কে কি করিবে? আমাদের বিবেচনায়, একথাটী সঙ্গত নয়। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের আবশ্যকতা পৃথিবীতে এই জন্য যে, সকল বিষয়ে পরস্পরের সাহায্য পাওয়া যাইবে। এই সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া কেহই সুখ শান্তিতে থাকিতে পারেন না। অন্যান্য সময়ে যেমন পরস্পরের সাহায্য প্রয়োজন, এই কঠিন ব্রত গ্রহণের সময়ও সেইরূপ প্রয়োজন। আমাদের বিবেচনায়, এই জন্যও বর কন্তার মনোনয়নের ভার কতক অভিভাবকের উপর রাখা একান্ত উচিত। অভিভাবকেরা পূর্ব্বে সৎ পাত্র বা কন্যা মনোনীত করিবেন। চরিত্রগত মহত্ত্বে এবং প্রকৃতিতে উভয়ের সহিত সামঞ্জস্য আছে কিনা, প্রথম অভিভাবকেরা বিচার করিবেন। তার পর বর কন্যাকে দেখা সাক্ষাতের অধিকার দিয়া, ভগবানের বিধান প্রভৃতি বুঝিতে দিবেন। যাহাদের অভিভাবক নাই, তাদের পক্ষে, প্রতিপালকদের মতামত মান্য করা উচিত। যদি প্রতিপালকের মতের সহিত বর কন্যার মত না মিলে, তবে সমাজের এই বিষয়ে হাত দিয়া মীমাংসা করা উচিত।

এস্থলে আর একটী কথা। অভিভাবকদিগের এবং তদভাবে সমাজের প্রবীণ লোকদের অজ্ঞাতে বিবাহসম্বন্ধে কোন প্রকার কথা বার্ত্তা চলিতে দেওয়া উচিত নয়। হঠাৎ যদি অনুরাগ হইয়া উঠে, তবে তাহাও সর্ব্বাগ্রে অভিভাবককে জানান উচিত। অভিভাবকের যদি তাহাতে অমত থাকে, তবে তদ্

নই তাহা প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করা উচিত। বহু দিন চেষ্টা করিয়াও যদি প্রতিরোধ না হয়, তবে অগত্যা ২।৩ বৎসর পর তাহাদের স্বভাবচরিত্রের কঠোর পরীক্ষা করিয়া, সমাজ বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন। এই অপেক্ষার সময়ে, কয়েক জন লোকের অন্ততঃ বর কন্যার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। গোপনে গোপনে অনুরাগ বৃদ্ধি পাইলে, বা বিবাহের প্রস্তাবের পর অনেক দিন অপেক্ষা করিলে ভিতরে যে কি গরল উৎপন্ন হয়, তাহা আবার বলিতে হইবে বলিয়া বোধ হয় না। এ সকল স্থানে দেবতারও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। সামান্য মানুষের মনে যে গরল জন্মিবে, বিচিত্র কি? সামাজিক নিয়মের কঠোরতা অন্য কোন স্থানে না রাখিতে চাও, না রাখ, কিন্তু এই অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষের ব্যবহারাদি সম্বন্ধে কতক রাখিতেই হইবে। চিরকালের জন্য অবশ্য কোন নিয়ম প্রণয়নের আমরা পক্ষপাতী নহি। তবে বর্ত্তমান কালের জন্য নিয়ম বা আচার ব্যবহারপ্রণালী নির্দ্ধারিত না থাকিলে, যৌবন বিবাহ প্রবর্ত্তনে যে কুফল ফলিবে, নীতি-শিথিলতা জন্মিবে, তাহা এক প্রকার স্থির নিশ্চয়।

যাঁহারা চরিত্র এবং ধর্ম্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে এসকল ভয়ের বিশেষ কোন কারণ নাই। কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক লক্ষের মধ্যে একজন মেলা ভার। চলিত ভাষায় যাহাদিগকে ধার্ম্মিক বলে বিবাহরূপ কঠিন পরীক্ষার সময়, তাহাদিগের অনেকেরই পদস্খলন হয়, দেখা গিয়াছে। সুতরাং খুব সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত উচিত। সর্ব্বপ্রযত্নে বিলাসিতা এবং সাংসারিকতার স্রোত নিবারণ করিতে সকলের চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টা কেবল বক্তৃতায় নহে, কথায় নহে, কিন্তু দৃষ্টান্তের দ্বারা করা উচিত। সাংসারিকতার স্থানে স্বর্গের চিন্তা, বিলাসিতার স্থানে চরিত্রের মাহাত্ম্য যাহাতে বালক বালিকাদের মনে বদ্ধমূল হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। এ কার্য্যের সহায়তার জন্য সর্ব্বদাই চরিত্রবান লোকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হইবে এবং বেশভূষামূলক বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি ঘৃণা দেখাইতে হইবে। এবং বর কন্যা মনোনয়নের সময় উভয়ের মনে যাহাতে বাহ্য সৌন্দর্য্য স্থান না পায়, তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য করিতে হইবে। পূর্ব্ব হইতে এ সম্বন্ধে অভিভাবকদিগের যে গুরুতর দায়িত্ব আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে, এবং সমাজকে প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, বাহ্য চাকচিক্যাধিক্যে, অল্প দিনের দেখা সাক্ষাতে, হৃদয়গত মহত্ত্ব বুঝা বড়ই কঠিন। আমরা অন্যত্র এ কথাও বলিয়াছি যে, বিবাহের কথাবার্ত্তার পর আর অধিক দিন অপেক্ষা করাও উচিত নয়। আবার স্থানান্তরে একথাও বলিয়াছি যে, বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যার এক বাড়ীতে অবস্থিতি করা উচিত নয়।* চিন্তা সূক্ষ্ম ভাবে না করিলে এ সকল কথাতে ইহাই বুঝা যায়, আমরা বিবাহের

* কেন যে আমরা এই সকল প্রথার বিরোধী, পূর্ব্বে কতক কতক তাহার আভাষ দিয়াছি। আমরা গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিবাদের উত্তর দিবার সময় এ সকল কথার আবার আলোচনা করিব।

পূর্ব্বে বর কন্যাকে পরস্পরের মহত্ব জানিতে দেওয়ার কিছু বিরোধী। বাস্তবিক তাহা নয়। আমরা বিশ্বাস করি, মানুষ যখন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় সরল এবং পবিত্র হয়, যখন বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, তখন ভগবানের বিধানে বরকন্যা অতি অল্প সময়েই পরস্পরকে চিনিতে পারে। যেখানে ধর্ম্ম নাই, সেই স্থানেই যত গোল। বিবাহ কার্য্য কিছু অপবিত্র কার্য্য নয়। যাঁহারা খুব মনোযোগের সহিত আমাদের স্বামী স্ত্রী নামক প্রবন্ধ পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, এই মিলনকে আমরা কত পবিত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। তবে বিবাহের পূর্ব্বে গর্হিত নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য না হয়, এ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা একান্ত উচিত। ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ অতি অল্প। সংসারাসক্ত লোকদিগের সম্বন্ধেই যত ভয়, এবং অনেক স্থলে তাহাদের দ্বারাই সমাজ কলঙ্কিত হয়। পরস্পরকে চিনিতে তাদেরই অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ধর্ম্ম ও চরিত্রহীন যুবক যুবতীর জন্যই এই সকল সতর্কতার কথা। রিপুর উত্তেজনায় স্বর্গের দেবতারও পদস্খলন সম্ভব, মানুষ কোন্ ছার জীব। এই জন্য বাধ্যবাধকতার বড়ই প্রয়োজন। এই সময় এ কথা গুলি ব্রাহ্মসমাজ এবং সমগ্র দেশ চিন্তা করেন, এই আমাদের বিনীত অনুরোধ।

যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু সমাজ হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে। হিন্দুসমাজে কোন্ ঘরের পাত্রের সহিত কোন ঘরের পাত্রীর বিবাহ হইতে পারিবে, তার একটা নির্দ্দিষ্ট রেখা আছে। কিরূপ সম্বন্ধ থাকিলে, তাহা ভাঙ্গিয়া পাত্র পাত্রীর সহিত বিবাহ হইতে পারিবে, তারও একটা নিয়ম আছে। অধিকন্তু সেখানে স্ত্রীস্বাধীনতা নাই। পক্ষান্তরে সেখানে অভিভাবকেরাই বাঁধা ধরে পাত্র পাত্রীর সম্বন্ধ ঠিক করেন। অন্যদিকে, সেখানে বাল্য বিবাহ অনেকটা প্রচলিত। সুতরাং সেখানে এ সকল বিষয়ে বড় একটা নীতিশিথিলতা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা সেরূপ নয়। এখানে স্ত্রীস্বাধীনতা আছে, এখানে বর কন্যার মনোনয়নের প্রথা আছে, এখানে যৌবন বিবাহ প্রচলিত,—অথচ সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষা করিতে হয় না, এবং জাতিভেদ ইত্যাদি না থাকায় বাঁধা ঘর ইত্যাদিরও প্রয়োজন হয় না। এ সমাজের বিবাহপ্রণালী নির্দ্ধারণে যে কি গভীর চিন্তার প্রয়োজন, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনায়াসেই বুঝিবেন। ঈশ্বর পিতা, আমরা সকলে ভ্রাতা ভগ্নী—এই উদার এবং পবিত্র সম্বন্ধের মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে কয় জন ব্যক্তি? যে এত উপরে উঠিয়াছে, সে রিপু পরিচালনা না করিয়াও প্রেমের সাধনা করিতে পারে। প্রজাবৃদ্ধির কামনা, নিতান্ত অসার কামনা, যদি তাহার মূলে ভগবদ্ভক্তি না থাকে। আধ্যাত্মিক ভক্তি বিশ্বাসহীন লোকের দ্বারা যে প্রজাবৃদ্ধি হয়, সেটা নরকের ছবি; জগতের তাতে উপকার হয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। তারপর ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধেই বা সকলের একরূপ ধারণা হইবে কেন? লোকের নিকট উপদেশ পাইয়া ঈশ্বরের যে স্বরূপবোধ জন্মে, সেটা প্রকৃত স্বরূপ-বোধ নয়। যাহারা শাস্ত্র মানে না, তাহারা সার্ব্বভৌমিক ঈশ্বর-স্বরূপ যে কি সূত্রে স্বীকার করিবে, বুঝি না। এখানে আদেশ বা

বিবেকের কথাই অধিক প্রতিপাল্য। ভগবান যার নিকট যে স্বরূপ প্রকাশ করেন, তাহাই সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। স্বরূপ স্বীকার করা ও স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা, স্বতন্ত্র কথা। সন্দেশের মিষ্টত্ব অন্যের মুখে শুনিয়া স্বীকার করা এবং নিজে আহার করিয়া যে মিষ্টত্বের বোধ জন্মে, তাতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সার্ব্বভৌমিক স্বরূপ স্বীকার, গুরু ও শাস্ত্র-তন্ত্রবিরোধী ব্রাহ্মের পক্ষে অসম্ভব। ভগবান যার ভিতরে তাঁর অনন্ত স্বরূপের যে দিকটা প্রকাশ করিতেচান, সেইটাই হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি যে স্বরূপে যে ভাবে মানুষের কাছে উপস্থিত হন,সেই ভাবই তার হৃদয়ঙ্গম হয়। অনন্তস্বরূপ স্বয়ং এই রূপে অনন্ত প্রকৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত না হইলে, কার সাধ্য আছে, তাঁকে স্বরূপতঃ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবে? তাঁর আদেশেই কেহ পিতা, কেহ মাতা, কেহ ভাই, কেহ ভগ্নী, কেহ স্বামী, কেহ স্ত্রী, ইত্যাদি। ঈশ্বরের পিতৃত্বই যে সকলের পক্ষে সাধনার বস্তু,তা নয়। কেহ পিতারূপে, কেহ স্বামীরূপে, কেহ শক্তি-রূপে, নানা রূপে নানা সাধক তাঁকে দেখেন, তাঁর স্বরূপ যে সকলের নিকট একরূপ, তা নয়। যাঁর নিকট তিনি যে ভাবে প্রকাশিত, সে তাঁর সেই রূপই ধরিবে, সেই রূপই বুঝিবে। যে তাঁকে স্বামীরূপে দেখিবে,সে কিছু পৃথিবীর নরনারীকে ভাই-ভগ্নীরূপে দেখিবে না। এসকল কথা একটু সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা যে কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছি, সে কথাটা এই—ভগবান যাকে ভগ্নীরূপে হৃদয়ে সম্বন্ধ পাতাইয়া দিয়াছেন, তাকে আর স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা যায় না। আজ একরূপ কাল অন্য রূপ, এরূপ তাঁর বিধানই নয়। ভগবান যদি ভগ্নীকে চিনাইয়া না দিয়া থাকেন, তবে তাকে ভগ্নী বলিয়া ডাকিব না। আর যদি চিনাইয়া দিয়া থাকেন, তবে চিরকাল ঐ এক সম্বন্ধ। সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন ঘটে, ঘটিতে পারে তখন, যখন মানুষ রক্ত মাংসের সম্বন্ধও মানে না, এবং বিধাতার আদেশও বুঝে না,বা মানে না। তখন —যখন মানুষ আপন খেয়ালে,কাহাকে মা, কাহাকে দিদি, ইত্যাদি কথায় সম্বোধন করে। এরূপ খামখেয়ালির ডাকাডাকিতে যে কিরূপ বিপদ ঘটিতে পারে, বুঝাইয়া বলিতে হইবে কি? তবে কয়েকটী কথা বলিতেছি।

মনে করুন, একটী গৃহস্থ কয়েকটী অনাথ বালক এবং অনাথ কয়েকটী বালিকাকে বাড়ীতে স্থান দিয়াছেন। সকলেই খেয়াল অনুসারে দাদা দিদি বলিয়া ডাকিতেছে। অভিভাবক এ পবিত্র সম্বন্ধের মধ্যে কোন অপবিত্র ভাব আসিতে পারে,তাহা বুঝিতে-ছেন না। সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। এদিকে ভিতরে ভিতরে কোন বালক বালিকার মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হই-য়াছে। কিন্তু বাহিরের যেমন ডাকা ডাকি, তেমনই চলিতেছে। পূর্ব্ববৎ অভি-ভাবক নিশ্চিন্ত আছেন। ক্রমে ক্রমে কীট দেখা দিল। ক্রমে কীটে কুসুম কাটিল;—নীতির মূল ছিন্ন হইল। অবশেষে অভিভাবক বুঝিলেন। তখন হায় হায় পড়িয়া যাইল। আর কিছু বলিব না। এরূপ প্রতারণার জন্য দায়ী কে? এরূপ প্রতারণা নিবারণের জন্য সমাজ কি কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না? স্ত্রী স্বাধী-নতা ও যৌবন বিবাহ যে সমাজে প্রচলিত,

সে সমাজে, দুশ্চরিত্রতা নিবারণের জন্য, সম্বন্ধের পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা করা কি সর্ব্বতোভাবে উচিত নয়? সম্বন্ধের ভিতরে ভগবানের যে বিধান বর্ত্তমান, সেই বিধান না বুঝিলে সম্বন্ধ পাতান উচিত নয়। ঈশ্বরের বিধান তোমার আমার সুযোগে কিছু পরিবর্ত্তিত হইবার নয়। সুতরাং যখন বিধানানুসারে এক সম্বন্ধ ঠিক হইল, সে সম্বন্ধের আর অন্য রূপ হইতে দেওয়া উচিত নয়। এ যদি না হয়, তবে স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার দিনে, রিপুর উত্তেজনায়, মানুষ যে এইরূপে বাহিরের পাতান-সম্বন্ধ-রূপ আচ্ছাদনে লুকাইয়া লুকাইয়া, পদে পদে কত ঘৃণিত কার্য্য করিতে প্রশ্রয় পাইবে, তার ইয়ত্তা নাই। অতএব সম্বন্ধের গাম্ভীর্য্য এবং স্থায়ীত্ব রক্ষা করা আমাদের মতে একান্ত উচিত।*

একবাড়ীতে যে সকল নরনারী বাস করেন, আমাদের মতে তাহাদের মধ্যেও বিবাহ প্রচলিত হইতে দেওয়া উচিত নয়। তবে স্থান বিশেষে, অপরিহার্য্য হইলে, অনেক বৎসর অপেক্ষার পর হয়, হউক। এক বাড়ীতে থাকার সময় বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত উচিত নয়। যদিও বা পাকে চক্রে হয়, তবে তাহা তখনই অভিভাবকদিগকে জনান উচিত। তারপরই পৃথক রাখা উচিত। এরূপ স্থলে এক বৎসর—দুই বৎসর অন্তত অপেক্ষা করা একান্ত উচিত। নচেৎ চরিত্রহীনতার অনিবার্য্য কুফল হইতে সমাজকে রক্ষা করিবার আর উপায় থাকে না। আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার পক্ষপাতী, কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবার একটা বিবাহ-পাতানের আড্ডা হয়, ইহা আমরা চাই না। বিবাহটা অপবিত্র কার্য্য বলিয়া নয়, কিন্তু এরূপ স্থলে পতনের সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমরা বিরোধী। আমরা মনে করি, প্রতিপালক, অভিভাবক বা শিক্ষকের সহিত অধীনস্থ বালিকার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়। এ সকল স্থানে খুব সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতায় দারুণ গরল উৎপন্ন হইবে।

আমরা বিবাহ-প্রস্তাব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, সংক্ষেপে আবার বলি। কার কার সহিত কোন্ কোন্ স্থানে বিবাহ হইতে পারিবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। সম্বন্ধের পবিত্রতা ও স্থায়ীত্ব রক্ষা করা উচিত। এক বাড়ীতে থাকা কালীন, এবং এক স্কুলে অধ্যয়নের সময় সম্বন্ধ পাতান উচিত নয়। সম্বন্ধের পূর্ব্বে অভিভাবকদিগের মতামত জানা উচিত। তারপর, সম্বন্ধ ঠিক হইল কিনা, ইহা জানিবার জন্য ভগবানের বিধান বুঝা উচিত। তারপর আলাপাদির সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। সে সময়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণের উপর বর কন্যার আচার প্রণালী পরীক্ষার ভার রাখা উচিত। ইহার পূর্ব্ব হইতে সাংসারিকতা দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করা উচিত। বাহ্য রূপ যে কিছুই নয়, ইহা বুঝান উচিত। মোট কথা, খুব সতর্কভাবে তাহাদের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত। সম্বন্ধ হইলে অধিক দিন অপেক্ষা করা উচিত নয়। কারণ, তাহাতে মন এক চঞ্চলতার অবস্থায় থাকে, তাতে মানসিক দুর্ব্বলতা ঘটা, অসম্ভব নয়। তবে

* গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'প্রতিবাদের' উত্তর দিবার সময়ে এই সব কথা আরো বিশদ করিয়া আলোচনা করিব।

যে স্থলে সাধারণ নিয়মের অন্যথা হইয়াছে, অর্থাৎ যেখানে কতকটা দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়াছে, সেখানে বর কন্যাকে অনেক দিন ধরিয়া পৃথক রাখিয়া মন পরীক্ষা করা উচিত। এবং নিতান্ত আবশ্যক হইলে অনেক-দিন পর বিবাহ দেওয়া উচিত।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এরূপ বাঁধাবাঁধি করিয়া কি সমাজকে পবিত্র রাখা যায়?—এমন আরো কত স্থান আছে, যেখানে লোক পাপ কার্য্য করিতে সুবিধা পাইবে। এ সকল কথা খুব সত্য। বিধাতা মানুষকে পবিত্র না রাখিলে, মানুষ মানুষকে পবিত্র রাখিতে পারে না। তাই বলিয়া মানুষ না ভাবিয়া না চিন্তা করিয়া থাকিতে পারে না। ইহার ভিতরেও ভগবানের বিধান রহিয়াছে। মানুষ কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে যাহা বুঝিতে পারে, তাহাই করিবে। তাতে সমাজ রক্ষা না হইলে, আর মানুষের হাত নাই। চেষ্টা করিয়া ফল না পাইলে দুঃখ কি, ক্ষোভ কি?

অন্যান্য কথা ক্রমে ক্রমে লিখিব।

বঙ্গে সংস্কৃত-চর্চ্চা। (৪র্থ)

টোল ও চতুষ্পাঠী।

আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে নবদ্বীপে সংস্কৃতের কীদৃশী চর্চ্চা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু বলিতে পারি নাই। অদ্য সে বিষয়ে যাহা কিছু জানিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্ব প্রস্তাবে যে যে স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছি, তাহাও প্রদর্শন করিতেছি।

বর্ত্তমান নবদ্বীপ কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত সামান্য গ্রামের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে জনৈক যোগী আসিয়া তথায় এক দেবীর ঘট সংস্থাপন করেন। যোগী সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই নিমিত্ত নানা স্থান হইতে ধর্ম্মানুরাগী জনগণ আসিয়া ঐ মহাপুরুষকে দর্শন ও দেবীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপ তীর্থমধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল।

নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মিথিলা প্রদেশই সংস্কৃত-চর্চ্চার প্রধানতম স্থান বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মিথিলা হইতেই নবদ্বীপে সংস্কৃত দর্শন ও স্মৃতি আনীত হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মিথিলায় গঙ্গেশ উপাধ্যায় নামক একজন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ও তার্কিক প্রাদুর্ভূত হন। তিনি প্রত্যক্ষ-অনুমিতি-উপমান-শব্দ, এই চারি খণ্ডে তত্ত্বচিন্তামণি নামক বঙ্গদেশের এক মাত্র প্রামাণিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রায় পাঁচশত বৎসর অতীত হইল (খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে) জয়ধর উপাধ্যায় তর্কালঙ্কার মিশ্র মিথিলা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তত্ত্বচিন্তামণির আলোক (চিন্তামণ্যালোক বা চিন্তামণি-প্রকাশ) নামক সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন। আলোকই চিন্তামণির প্রাচীনতর

টীকা। জয়ধর উপাধ্যায় পক্ষধর * মিশ্র নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপবাসী বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় গমন পূর্ব্বক পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ পরিসমাপ্ত করিয়া, নবদ্বীপের সন্নিহিত বিদ্যানগর গ্রামে এক চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করেন। চৈতন্যদেব, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি, হরিদাস সার্ব্বভৌম এবং শ্রীপাদ গোস্বামী তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম চিন্তামণির কতিপয় অংশের টীকা করেন। তাহা সার্ব্বভৌমনিরুক্তি নামে প্রসিদ্ধ।

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমাতিথিতে চৈতন্যদেব জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শ্রীহট্ট দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক নবদ্বীপে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি গঙ্গাধর পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃতে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া, অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংস্থাপয়িতা চৈতন্যদেব এবং তাঁহার শিষ্য বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই উভয় ভাষাই সবিশেষ ঋণী। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক নানাবিধ গ্রন্থ ও পদাবলী রচনা করিয়া তাঁহারা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশিষ্টরূপে উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা বঙ্গবাসীর চির প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা ভাজন, সন্দেহ নাই।

চৈতন্যদেবের মতানুযায়ী বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকগণের মধ্যে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যদেব ও তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই।

রূপ ও সনাতন দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। জীব গোস্বামী তাঁহাদের ভ্রাতষ্পুত্র। এই তিন জনেই সংস্কৃতে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের প্রণীত বহুতর গ্রন্থ আছে। ইঁহাদের দ্বারা সংস্কৃত ভাষার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে। ইঁহারা সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন।

সনাতন গোস্বামীপ্রণীত গ্রন্থের মধ্যে

---

* পক্ষধর নামের অর্থ সম্বন্ধে তিনটী মত প্রচলিত আছে। (১) তিনি চতুর্দ্দশ দিবসের মধ্যে এক দিন মাত্র ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। (২) তিনি একবার মাত্র যাহা শুনিতেন, স্মৃতিশক্তির অতি প্রখরতা বশতঃ চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত তাহা মনে রাখিতে পারিতেন। (৩) তাঁহার এরূপ অসাধারণ তর্কশক্তি ছিল যে, তিনি যুক্তি ও তর্ক প্রয়োগ পূর্ব্বক যে কোন মত অব্যাহত রাখিতে পারিতেন। গীতগোবিন্দ ও প্রসন্নরাঘব প্রণেতা জয়দেবদ্বয়ের মধ্যে কেহই এই পক্ষধর নহেন। তাঁহারা উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। (See Dr. Mitra's Notices of Sanskrit mss. vol. I. p.285-86.

বাসুদেব সার্ব্বভৌমই মিথিলা হইতে ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া প্রথমত নবদ্বীপে টোল সংস্থাপন করেন। আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবে শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত ন্যায় শব্দ দৃষ্টে পক্ষধর মিশ্রকে রঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক বলিয়া লিখিয়াছিলাম। রঘুনাথ পক্ষধরের নিকট অধ্যয়ন করেন বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ যে শব্দকল্পদ্রুমের নিয়মানুসারে পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের অধ্যাপক বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাও বোধ হয় ভ্রমাত্মক।

ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, গীতাবলী, দিক্‌প্রদর্শিনী নাম্নী ভাগবতের টীকা, লীলাস্তব-টিপ্পনী সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামী উজ্জ্বল-নীলমণি নামক অলঙ্কার গ্রন্থ,—হংসদূত, উদ্ধব সন্দেশ, শ্রীরূপচিন্তামণি ও ছন্দোঽষ্টাদশ নামক কাব্য,—বিদগ্ধমাধব ও ললিত মাধব নামক নাটক, দানকেলি নামক ভাণিকা (নাটক),—উৎকলিকাবলী, গোবিন্দবিরুদাবলী, প্রেমেন্দুসাগর, বৃন্দা-দেব্যষ্টক, শ্রীনন্দনন্দনাষ্টক, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, শ্রীমুকুন্দমুক্তাবলি-স্তব নামক স্তোত্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি মথুরামহাত্ম্য, পদ্যাবলী, সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত, ভক্তির-সামৃত-সিন্ধু, শ্রীহরিভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর বিন্দু, এবং নাটকচন্দ্রিকা নামক সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

জীব গোস্বামী প্রণীত বৈষ্ণবতোষিণী, লঘুতোষিণী, ষটসন্দর্ভ, গোপালচম্পু, গোপালতাপনী উপনিষদের টীকা, রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা সুপ্রসিদ্ধ।

গোপাল ভট্ট ভট্টমারি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তাঁহার কৃত শ্রীহরিভক্তি-বিলাস নামক সংগ্রহ গ্রন্থ সুবিখ্যাত।

বিদ্যা ও ভক্তির জন্য কায়স্থজাতীয় রঘুনাথ দাস 'দাস গোস্বামী' বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তিনি বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি-স্তোত্র ও মনোশিক্ষা নামক পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন।

গোপাল ভট্টের গুরু প্রবোধানন্দ স্বর-স্বতী বিবেকশতক নামে কৃষ্ণ ভক্তি বিষয়ক এবং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত নামক চৈতন্যদেবের স্তোত্রগ্রন্থ রচনা করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **প্রাচীন আর্য্যরমণীদিগের ইতিবৃত্ত।**—শ্রীমহেন্দ্র নাথ রায় বিদ্যানিধি প্রণীত; মূল্য।৵১০। মৈত্রেয়, লীলাবতী, গার্গী ও বাক প্রভৃতি ২১ জন আর্য্যরমণীর বিবয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্ধকারময় গভীর সাগর হইতে এই সকল রত্নোদ্ধার করিতে গ্রন্থকারকে যে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাতে সন্দেহ নাই। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের এই যুগে এরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া, গ্রন্থকার বাঙ্গালীর যথেষ্ট উপকার করিলেন। বিনা আড়ম্বরে স্ত্রী-শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের যে পথ গ্রন্থকার এই সদনুষ্ঠানের দ্বারা পরিষ্কার করিলেন, তার ব্যাখ্যা হয় না। যদিও বিবরণ গুলি খুব সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে কিছু কিছু নীরস কথোপকথনের উল্লেখে সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে, তবুও, যে সময়ের কাহিনী গ্রন্থকারকে লিপিবদ্ধ করিতে

হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে গ্রন্থকারকে আর দোষ দিতে ইচ্ছা হয় না। তিনি কোথায় বিবরণ পাইবেন? এক এক জনের কাহিনী সংগ্রহ করিতে হয়ত তাঁহাকে কত পুস্তক, কত জীবনের ঘটনা, কত লোকের উক্তির পানে তাকাইতে হইয়াছে। সুতরাং এ সকল ত্রুটী ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করা যায় না। আর্য্যরমণীগণ বেদ মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, ইহা কত গৌরবের কথা। মহেন্দ্র বাবু সেই গৌরব আজ বাঙ্গালায় গভীর-স্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন;—আর্য্য-কীর্ত্তির অক্ষয় যশ ঘোষণা করিতেছেন। মহেন্দ্র বাবুকে শত শত ধন্যবাদ।

কিন্তু দুটী কথা। পুস্তকের ভাষা কিছু কর্কশ, কিছু নীরস এবং স্থানে স্থানে কিছু দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার সহায়তার জন্য যে সকল পুস্তক প্রণীত হয়, সে সকল পুস্তকের ভাষার দিকে দৃষ্টিরাখা খুব উচিত। মহেন্দ্র বাবু সে কার্য্যটী করেন নাই বলিয়া আমরা কিছু দুঃখিত হইয়াছি।

২। একাদশ অবতার বা পঞ্চানন্দ মঙ্গল। শ্রীমহাকবি ধূর্জ্জটি প্রণীত। মূল্য ॥০মাত্র; ৪১নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য। এই পুস্তক খানি অনেক দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। এখানি ব্যঙ্গোক্তিময় গ্রন্থ আমরা সমালোচনারজন্য অতি অল্প দিন হইল পাইয়াছি। এই পুস্তক খানি যে উদ্দেশ্যে লিখিত, সে উদ্দেশ্যের সহিত আমাদিগের কোন সহানুভূতি নাই। একজন প্রতিভাশালী সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে এইরূপ কার্য্যে রত দেখিলে আমাদের প্রাণে দারুন আঘাত লাগে। এই চেষ্টা, এই অধ্যবসায় ভাল কার্য্যে ব্যয়িত হইলে, না জানি বাঙ্গালা ভাষার কত গৌরব বাড়িত। যে সে একজন লোক এই কার্য্য করেন, তাতে ক্ষোভ নাই। কিন্তু একাদশ অবতার-প্রণেতা যে সে লোক নন্। তাঁহার বর্ণনাশক্তি, তাঁর ভাষা-জ্ঞান, তাঁর অলঙ্কার যোজনার ছটা, সর্ব্বোপরি তাঁর কবিত্ব-শক্তি দেখিলে মোহিত হইতে হয়। আমাদের ক্ষোভ এই, গ্রন্থকার এই গ্রন্থে যে শক্তি বিকীরণ করিয়াছেন, তাহা জগতের লোকে দেখিবে না, তাহা জগতে স্থায়ী হইবে না। কারণ ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া যে পুস্তক লিখিত, তার আদর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার নয়। মহাকবি ধূর্জ্জটি পঞ্চানন্দের এক মহৌষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে,—এ ঔষধের ক্ষমতা যে অসাধারণ, তাহাতেও সন্দেহ নাই; এবং ধূর্জ্জটিই যে এই ঔষধ ব্যবস্থা দিবার উপযুক্ত লোক, ঠিক কথা; কিন্তু পঞ্চানন্দকে আমরা যে কারণে আদর করিতে পারি নাই, ধূর্জ্জটিকেও সেই কারণে আদর করিতে পারিলাম না। ইঁহারা উভয়েই আপন আপন শক্তির অপব্যবহার করিতেছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। উভয় গ্রন্থকারই প্রতিভাশালী সুলেখক;—দুঃখ এই, ইঁহাদের উভয়ের পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, তৈল-শোষণ অপব্যয় হইতেছে। এই পুস্তকে ধূর্জ্জটি মহাকবি আশ্চর্য্য কবিতা লিখিবার ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, এজন্য সমাজে তাঁর আদর পাওয়া উচিত। তাঁর এই কবিত্ব শক্তির খাতিরে—নীচ উদ্দেশ্য-মূলক হইলেও, সকলের গ্রন্থখানি এক একবার পাঠ করা উচিত।

৩। ভারত-কোকিল কাব্য—শ্রীতারিণী চরণ সেন প্রণীত; মূল্য ॥• ।

এ কাব্য খানির আগাগোড়া উত্তেজনা পূর্ণ। পড়িতে পড়িতে লেখকের স্বদেশ প্রেমের পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। এখানি ব্যথিত হৃদয়ের বেদনা, হিতৈষীর বিলাপ, মাতার সুপুত্রের প্রাণের উচ্ছ্বাস। কবিত্বাংশে পুস্তকখানি শ্রেষ্ট না হইলেও, ভাবে, উৎসাহে ও স্বাধীন চিন্তায় আদরের জিনিস। পুস্তক খানির মূল্য আরো সুলভ হওয়া উচিত। আশা করি, তাহা হইলে অনেকে পাঠ করিবেন।

৪। অশ্রুকণা—শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত—মূল্য ॥০। পুস্তকখানি অল্প দিন হইল বাহির হইয়াছে। আমরা ইতিমধ্যে সমগ্র পুস্তক খানি দুই তিনবার পড়িয়াছি। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্রীর যে যথেষ্ট গুণপনা প্রকাশ পাইল,তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা কেবল তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, গ্রন্থকর্ত্রী বাঙ্গলায় আর অপরিচিত থাকেন, আমরা ইচ্ছা করি না। শ্রীগিরীন্দ্র মোহিনী দাসী কে, আমরা জানি না। তবে এ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, তিনি একজন বঙ্গবিধবা। যে বঙ্গবিধবা এরূপ উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিতে শিখিয়াছেন, তিনি দাসী নন, তিনি দেবী। ইঁহার বৈধব্যদশায় বাঙ্গালা ভাষা অনেক উপকৃত হইলেন। তিনি বিধবা না হইলে এই "অশ্রুকণা" বাঙ্গালা ভাষাকে অলঙ্কৃত করিত কি,না সন্দেহ। গ্রন্থকর্ত্রী দুঃখ করিয়া ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—" সংসারি সুখের অভিলাষী, শোকাশ্রু কি কাহারও ভাল লাগিবে? আমরা তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছি,—ভাল লাগিবে,—ভাল লাগিয়াছে। প্রাণ ভাসাইয়া অন্যের গলা ধরিয়া,যেকাঁদিতে জানে,তাঁর ক্রন্দনে পাষাণ সদৃশ প্রাণও গলে। কে এমন আছেন, বঙ্গবিধবার এইরূপ ক্রন্দনে যাঁর প্রাণে আঘাত না লাগে;—

১।　　*　　*　　*

মরিয়া বাঁচিয়া যাই, চ'লে যাই সে নগর,
প্রাণের দেবতা মম বাঁধিছেন যেথা ঘর।
হে ধরণি, খুলে নেগো,স্নেহের শিকল তোর!
দেগো ছেড়ে,যাই উড়ে, জনম-তরুতে মোর!
কি আশে রাখিবি পুষে এই তুচ্ছ হীন প্রাণ?
কোন্ কাজ হবে, ধরা,আমা হতে সমাধান!
ও শুভ্র তোমার বুকে কালিমায় বিন্দু হ'য়ে,
থাকিতে পারি না আর এ ভার জীবন ল'য়ে॥"

স্থানান্তরে—"　　*　　*　　*

পাব কি না পাব, কোথায় যাইব?
চাহিনা মরণ-পার।
তাহার ভাবনা,　　তাহার কামনা,
এ অতি সুখ আমার।"

আবার—"　　*　　*　　*

শুয়েছে বিছায়ে স্মৃতি শুষ্ক পর্ণ-রাশি।
শুয়েছে অশ্রুর কোলে হরষের হাসি,
কাঁদিয়া শুয়েছে মোর প্রভাতের প্রাণ।
এ জনমে করিবে না কেহ গাত্রোত্থান।"

অন্যত্র—

"রয়েছে কুসুম ঢালা,
গাঁথা হয় নাই মালা,
প্রখর নিদাঘ-জ্বালা,—শুকাইয়া যায়!
আশার শিশির-বারি
সতত সিঞ্চন করি
বাঁচায়ে যে রাখিতেছি, হবে কি বৃথায়?
সে কি মোর ফুল-হার দেবে না গলায়!"

বঙ্গবিধবার এই গভীর বিলাপে আমাদের প্রাণ অবসন্ন—শরীর নিস্তেজ,নয়ন অশ্রুপূর্ণ; —কিন্তু বিরহ-গানের পাশেই আশার সুমধুর বাণী;—বঙ্গবিধবার গভীর প্রেমের

আত্মত্যাগমন্ত্র হৃদয়কে বৈরাগ্যে লইয়া যায়।—দেখ,তাহা কত গভীর,—কত মধুর—

১। "কোথা আছ নাহি জানি,
জানি না হৃদয় তব!
যা ছিল সকলি দেছি,
লও হে শোকাশ্রু নব।"

২। * * * * *
"তাহার ভাবনা, তাহার কামনা,
তার নামে সব সুখ!
* * * * *
তাহার এদেহ, তাহার বিরহ,
ত্যজিতে নাহিক সাধ!

৩। "অতি ক্ষুদ্র ফুল আমি, প্রবল তরঙ্গ-ঘায়
কতক্ষণ রব টিকে, এমনি ভাসায়ে কায়!
দয়া ক'রে,ফেল মোরে ভাসাইয়া উপকূলে,
নহিলে ডুবে যে মরি,প্রাণের অতল তলে!
তীরে প'ড়ে শুকাইতে,ভাল বাসি,—তা-ই চায়
শুকাতে জনম মোর, শুকায়ে ত্যজিব কায়।"

৪। "আজীবন ও মূরতি বসায়ে মানসে,
প্রেমের কুসুম-হার দিব গলদেশে!
এ হৃদয়ে—এই সিন্ধু কভু না শুখাবে
তোমারি উদ্দেশে, নাথ, সতত রহিবে।"

৫। "তুমি কি গিয়াছ চ'লে?
না না, তা ত' নয়।
য'দিন বাঁচিব আমি,
ত'দিন জীবিত তুমি,
আমার জীবন যে গো
শুধু তোমাময়।
তুমি ছাড়া আমি কেবা—
—শূন্য—শূণ্যময়!"

তারপর মৃতপতির জন্য সাধ্বীর হৃদয়ের প্রার্থনা। দেখ, সে মধুর প্রার্থনায়
কত আত্মত্যাগের ভাব—

"এই ভিক্ষা দাও নাথ,
যা দেবে আমারে দিও, দুখ বা যাতনা ভার!
ব্যথিত সে সখা মোর, যেন নাহি দহে আর।
বড় সে যাতনা পেয়ে ধরা হ'তে চলে গেছে,
স্নেহেতে ডাকিয়া তারে,লও, নাথ লও কাছে।"

এরূপ সতী যে স্বামীর ভাগ্যে মিলে, সে স্বামী চির অমর। ৺নরেশচন্দ্র দত্ত বাঙ্গালা প্রদেশে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, দেবী গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিত্বশক্তি কেবল বিলাপ উক্তিতেই প্রস্ফুটিত। না—তা নয়, কবির প্রকৃতির বর্ণনা আরো মধুর। সমস্ত কবিতা তুলিয়া না দেখাইতে পারিলে কিছুতেই সাধ পুরে না। সর্ব্বত্রই নূতন চিন্তা, নূতন ভাব,—নূতন গান, সে সব শুনিতে শুনিতে প্রাণ মোহিত,হৃদয় স্তম্ভিত। এরূপ প্রতিভাময়ী ললনার আবির্ভাবে বাঙ্গালা আজ ধন্য। এতদিনে এদেশ স্ত্রীশিক্ষার সুফল ফলিয়াছে। এদেশে গিরীন্দ্রমোহিনীর সমতুল্য মহিলা-কবি আর আছেন বলিয়া আমরা জানি না। তাঁহার পূর্ণিমাগীত, যমুনাকূলে, গ্রাম্যছবি, গার্হস্থ্য চিত্র,জ্যোৎস্না, —বর্ষা,বরুণা যাত্রা,সমাধি স্থান,পর্ব্বতপ্রদেশ, পাড়াগাঁ প্রভৃতি কবিতায়, ঐ শক্তি আশ্চর্য্য রূপ বিকশিত হইয়াছে। নমুনা স্বরূপ কেবল একটী স্থান দেখাইব—

"শিয়রেতে জেগে শশী, যেন সে সৌন্দর্য্যরাশি
নেহারিছে মগ্ন হ'য়ে ভাবে।
ছেলে ডাকে আয় চাঁদ, মা বলিছে আয় চাঁদ,
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে!
মা নাই ঘরেতে যার,ছেলে কোলে নাই যার!
যত কিছু সব তার মিছে!
চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি,চাঁদে চাঁদে মেশামিশি,
স্বর্গে মর্ত্তে প্রভেদ কি আছে।"

প্রশংসার কথা অনেক বলিয়াছি। আর বলা সম্ভব নয়। আমরা তাঁর গ্রন্থখানি

সমগ্র তুলিয়া না দিতে পারিলে সকল সৌন্দর্য্য দেখান যায় না। আমাদের তত স্থাননাই। বিশেষত সে কার্য্যে ইচ্ছাও নাই। এ পুস্তকখানি ঘরে ঘরে থাকে, এই ইচ্ছা। এ ইচ্ছা কি সফল হইবে ?

এ গ্রন্থে যে কোন দোষ নাই, তা নয়। চাঁদেও কলঙ্ক থাকে, কমলেও কণ্টক থাকে। এ অশ্রুকণাতেও মলিনতা আছে। স্থানে স্থানে রবীন্দ্র নাথের ছায়া পড়িয়াছে। উভয়ই সম-সাময়িক-কবি বলিয়া আমরা এ দোষ ধরিতেছি, নচেৎ ধরিতাম না।

"আশার স্বপনে থেকে বহিয়ে যে গেল বেলা
কখন খেলিবে আর সাধের প্রাণের খেলা ?
দিগন্ত আঁধার ক'রে আসিছে তামসী নিশি,
এই বেলা ধীরে ধীরে পরাণেতে যাও মিশি।"

এ সকল কবিতা পড়িলে রবীন্দ্রনাথ-কেই মনে পড়ে, গিরীন্দ্রমোহিনীর সৌন্দর্য্য যেন কিছু খর্ব্ব হয়। আর একটী কথা না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। দুই তিনটী স্থানে গ্রন্থকর্ত্রী যেন কিছু পথ-হারা হইয়াছেন। তিনি স্ত্রীলোক, তাঁর লেখায়—

"উরস সরসে কণক মুকুল
রূপের সলিলে ভাসে।" এর ন্যায় পদ না থাকিলেই ভাল হইত।

গ্রন্থকর্ত্রী শেষে সকলের প্রাণে মিলিতে চাহিতেছেন। হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সকলকে ডাকিতেছেন—

"উন্মুক্ত ক'রেছি হৃদি কুটীরের দ্বার,
কে আছ আশ্রয়হীন এস, এস ভাই !
সবারে রাখিতে প্রাণে সাধ মোর যায়,
সবার মাঝারে আমি মিলাইতে চাই।
* * * * * *
তোমাদেরি সুখে দুখে মিশাইয়া প্রাণ,
সাধ—হারাইব এই তুচ্ছ সুখ দুঃখ ;
তোমাদেরি মাঝে থেকে লভি নব প্রাণ,
দেখিবারে পাই যদি সন্তোষের মুখ !
এস সবে, পারি যদি হারাতে আপনা,
জীবন-সমুদ্র-জলে ক্ষুদ্র বারি-কণা।"

ইহাই স্বাভাবিক। সীমাবদ্ধ প্রেম এখন অসীম। এখন জগতে মিলিতে কবির প্রাণের সাধ। জগৎ কি কৃপণের ন্যায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিবে ? না। ঘরে ঘরে, প্রাণে প্রাণে এই অশ্রুকণা মিলিয়া থাকিবে। ভাবে ভাবে মিলন—অনন্ত মিলন হইবে। বঙ্গবিধবার প্রাণ আজ বাঙ্গালীর অনন্ত প্রাণে মিশিয়া গিয়াছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার কি মিষ্ট, কি নীরব, মনমুগ্ধকর ছবি। ধন্য গিরীন্দ্রমোহিনী, ধন্য বঙ্গদেশ।

৫। জীবনপ্রদীপ। উপন্যাস—শ্রীবিষ্ণু চরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১।৶০। বিষ্ণু বাবু যদিও এই প্রথম গ্রন্থকার রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু নব্য-ভারতের পাঠকগণের নিকট তিনি অপরিচিত নহেন। নব্যভারতের পাঠকগণ বিষ্ণু বাবুকে উত্তম রূপে জানেন। সুতরাং তাঁহার অধিক পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

গ্রন্থ খানি খুব বিস্তৃত। অল্প কথায় সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। আমরা বিবরণ না দিয়াই সমালোচনা করিব। যাঁহারা পুস্তক পড়েন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে কিছু অসুবিধা হইবে, কিন্তু উপায় নাই। তাঁহারা ক্ষমা করিবেন। গ্রন্থের দোষ গুণ সম্বন্ধে যাহা বলিবার কেবল তাহাই বলিতেছি।

এই সুলভ গ্রন্থ খানির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ধর্ম্ম এবং চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাই

গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সংসারের ধন ঐশ্বর্য্য, মান অভিমান, রূপ যশ, এ সকল যে প্রকৃত চরিত্রবান ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিকট কোনই আকর্ষণের বস্তু নয়, মহাত্মা হরগোবিন্দের চরিত্রে গ্রন্থকার তাহা অতি দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ঋণ-দায় হইতে মুক্ত হইবার জন্য, ভ্রাতার নির্য্যাতন প্রভৃতির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হরগোবিন্দ যখন অতুল বিষয় বিভব পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, তখনকার সে দৃশ্যটী অতি চমৎকার। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়—চক্ষে জল পড়ে। এমন স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল ছবি আমরা আর কোথাও পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। হরগোবিন্দের চরিত্র বড়ই সুন্দর হইয়াছে।

দ্বিতীয় চিত্র—ভবানীশঙ্করের। ভবানী শঙ্কর একজন নৃসংস চরিত্রহীন জমীদার। ইহার নৃশংস চরিত্রের বর্ণনাও সুন্দর হইয়াছে। সুখদার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া যখন ভবানী-শঙ্কর, তার ভগ্নী মধু ও পূর্ব্ব স্ত্রী সরমার রক্তে ধরাকে সিক্ত করিতেছিল, তখন এই হতভাগ্যের প্রতি বাস্তবিকই বিষম ঘৃণা হইয়াছিল। তারপর ছলনা করিয়া নৃশংস যখন হরগোবিন্দের বিষয় কাড়িয়া লইল, তখন এই পিশাচের প্রতি ক্রোধ এবং ঘৃণা এত বৃদ্ধি হইল যে, আর সহ্য করা যায় না। তারপর কিন্তু হরগোবিন্দের সাধুতার দৃষ্টান্তে ইহার জীবনে পরিবর্ত্তনের ভাব আসিল। পরিবর্ত্তনটা হঠাৎ হইল বলিয়া ভাব কিছু মন্দীভূত হইল। এ ত্রুটী স্বত্তেও ভবানীর চিত্র বড় মন্দ হয় নাই।

সকলের উপরে—কুন্তলা এবং শশাঙ্ক-শেখরের চিত্র। কুন্তলা বনবরা মেয়ে। হরিগোবিন্দের দৌহিত্রী। হরগোবিন্দ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া চরিত্রে, ধর্ম্মে ও শিক্ষায় জন্ম দুঃখিনী কুন্তলাকে একটী আদর্শ বালিকা করিয়া তুলিয়াছিলেন। জীবনের বিষম সংগ্রামে, দুঃখ কষ্টে—কুন্তলা অচলা;—কোন ঘটনাতেই বিচলিত হইবার নয়। কুন্তলাকে গ্রন্থকার সর্ব্বগুণে বিভূষিত করিয়া সৃজন করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে এচিত্রে অন্যান্য গ্রন্থকারদিগের চিত্রের ছায়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তবুও কুন্তলার ছবি সুন্দর। এ সৌন্দর্য্যরাশির কালিমা, শশাঙ্কশেখর। যেরূপে, যেভাবে এই শশাঙ্ক-শেখরের প্রেম, উছলিয়া প্রণয়ে পরিণত হয়, তাহা স্বাভাবিক বটে, কিন্তু তাহা আদর্শ নয়। এই কারণে, গ্রন্থকার কুন্তলাকে প্রেমিক করিয়াও প্রণয়িনী করেন নাই। কুন্তলা সকলকেই ভাল বাসিয়াছে, কিন্তু কাহারও সহিত শরীর বিনিময় করে নাই। নিঃস্বার্থ জীবনব্রত, পরোপকারেই উদ্যাপিত হইয়াছে। কুন্তলার নিঃস্বার্থ জীবনে অনেক শিখিবার জিনিস আছে।

কিন্তু থাকিলে কি হয়, কুন্তলার চরিত্র স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক হইয়াছে। খাসিয়া পাহাড়ে এই কুন্তলার জীবনে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বড়ই অস্বাভাবিক। অতি অল্প সময়ে যুদ্ধের দিন তিনি যাহা করিলেন, তাহা মানুষে পারে বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, তারপর ঘটনাক্রমে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, জলে ভাসিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৫।৬দিনের পথ অতিক্রম করিয়া নদী সৈকতে আসিলেন। এ কিরূপ হইল, বুঝিলাম না। সেইখানেই আবার ভবানীশঙ্কর হাজির। এসকল ঘটনা ও অবস্থার সম্ভাবনা ছিল কি না, তাহা না ভাবিয়া এরূপ করাতে পুস্তকের

অত্যন্ত অনিষ্ট হইয়াছে। তারপর যেখানে সেখানে কুন্তলা খোলা চুলে বেড়াইতেন;—এটাও ভাল বোধ হইল না। যাহা হউক, মোটের উপর চিত্রটী ভাল।

এই কয়েকটীই প্রধান চিত্র। অবান্তরিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র অনেক আছে। কুন্তীর চিত্র তন্মধ্যে প্রধান। এ চিত্র বঙ্কিম বাবুর বিমলা এবং শান্তির উজ্জল ছায়ায় অঙ্কিত। বিলাসপুরের রাজার বর্ণনা, ব্রহ্মচারী, নন্দনগিরি, হেন্‌রি সাহেব প্রভৃতির চিত্র গুলিতে বৈচিত্র্য থাকিলেও তাহা অনুকরণ দোষে দূষিত বলিয়া বিশেষ চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না। দ্বিতীয় খণ্ডের ঘটনা গুলিতে পুস্তকের সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।

তারপর খাসিয়া পাহাড়ের দৃশ্যও মতিরাম প্রভৃতির কথা। এ সকলও পুস্তকের যথেষ্ট কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে নাই। কারণ, কুন্তলার জীবনের যে অংশ এই পাহাড়ের ছায়ায় প্রস্ফুটিত, তাতে নূতনত্ব নাই। কুন্তলার সে সকল গুণ আমরা পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। এক কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দশবার বলিলে লাভ কি?

আর একটী চিত্র ধরণীধরের। ধরণীধরের চিত্র স্থানে স্থানে পরিস্ফুট, স্থানে স্থানে অস্ফুট। মরিশস্ দ্বীপ হইতে ভাসিয়া সাগর পার হইয়া ইনি হরানন্দ ব্রহ্মচারী বেশে ডাকাতের সর্দ্দার হন। ইনি কুন্তলার মাতুল সম্পর্কিত। ইনিই কুন্তলাকে বন্দী করেন। তারপর, আবার দ্বিপান্তরিত হন। এ চিত্রটীতেও অস্বাভাবিক অনেক ঘটনা আছে।

এ পুস্তক খানি প্রকৃতির বর্ণনায় পরিপূর্ণ। গ্রন্থকার যাকে হাতের সম্মুখে পাইয়াছেন, তারই রূপের বা গুণের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকের ভাবের যথেষ্ট ব্যত্যয় হইয়াছে। কৃতী লেখকেরাও কোন কোন চিত্র অঙ্কিত করেন বটে, কিন্তু সে কেবল কোন বিশেষ ঘটনাকে বা কোন বিশেষ চিত্রকে পাঠকের মনে চির-অঙ্কিত করিবার জন্য। এ গ্রন্থে সকলেরই বর্ণনা আছে। এই রূপ অতিরিক্ত বর্ণনায়, এবং গ্রন্থকারের কল্পিত কথায় পুস্তক খানি আগাগোড়া গোলমেলে হইয়াছে। পড়িবার সময় খুব আকর্ষণ হয় না। বর্ণনা-শক্তি গ্রন্থকারের অতি আশ্চর্য্য, সন্দেহ নাই, স্থানে স্থানে পড়িতে পড়িতে মোহিত হইয়া যাইতে হয়, বটে, কিন্তু তাতে পুস্তকের ঘটনার সৌন্দর্য্য নষ্ট করে। পুস্তকের কোন ঘটনা, কোন চিত্রই হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিতে চায় না। এই এক দোষে পুস্তকখানি সাধারণের নিকট খুব নীরস লাগিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। বিশেষত, অনেক স্থলে গ্রন্থকার অগ্রে পরবর্ত্তী ঘটনা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়া তারপর পূর্ব্বের ঘটনা ব্যক্ত করিয়াছেন। দুই এক স্থলে এরূপ হইলে বিশেষ দোষ ঘটিত না বটে, কিন্তু যেখানে সেখানে এরূপ হওয়ায় পুস্তক খানিকে খাপ-ছাড়া বলিয়া বোধ হয়। স্থানে স্থানে, গ্রন্থের উল্লিখিত এক জন একটা প্রশ্ন করিয়াছে, সেই প্রশ্নের উত্তর ৭।৮ পৃষ্ঠা পরে রহিয়াছে। এই ৭।৮ পৃষ্ঠা, হয়, স্বভাবের বর্ণনায়, না হয়, লোক বিশেষের পূর্ব্ব পরিচয়ে পূর্ণ। এরূপ হওয়াতে পুস্তক খানি বড়ই কর্কশ হইয়াছে।

তৃতীয় কথা, এই পুস্তক খানিতে না পাওয়া যায়, এমন কথা নাই, এমন ঘটনা নাই। একখানি পুস্তকে জীবনের সকল

কথা লিপিবদ্ধ করা ভাল নয়। পাঠকের এত ধৈর্য্য থাকিবে কেন? জীবন-প্রদীপে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে তাতে সুন্দর ৩ খানি পুস্তক হইতে পারিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। কারণ, যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে।

এ সকল কথা ভিন্ন, কতকগুলি অস্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ আছে। সে গুলিকে ইচ্ছা করিলেই গ্রন্থকার রূপান্তরিত করিতে পারিতেন। না করায় বড়ই অনিষ্ট হইয়াছে। ১ম ঘটনা,—টাকা না পাইয়া খতদলিল রেজেষ্টারি করা। (২য়) গৌহাটী হইতে খাসিয়া পর্ব্বতে নৌকায় যাওয়া। (৩য়) ভবানীশঙ্করের হঠাৎ পরিবর্ত্তন। (৪র্থ) ভবানীশঙ্করের সহিত কুন্তলার মিলন। (৫ম) কুন্তলার সহিত ধরণীধরের মিলন। (৬ষ্ঠ) দস্যু গৃহে কুন্তলাকে আনিবার জন্য শশাঙ্কশেখরের গমন। (৭ম) শশাঙ্কশেখরের দগ্ধ শরীরে জীবনপ্রাপ্তি। (৮ম) শশাঙ্কশেখরের সহিত তাঁহার পিতার মৃত্যু সময়ে সাক্ষাৎ, এবং মৃত্যু সময়ের সুদীর্ঘ উপদেশ। (৯ কুন্তলার আরোগ্য। ১০) হরগোবিন্দের সহিত কুন্তলার শেষ মিলন। এই সকল ঘটনা গুলি কেমনে ঘটিল বুঝা কিছু কঠিন। যেরূপে গ্রন্থকার যাহা মিলাইয়াছেন, তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল।

আরো একটী কথা আছে। বিষ্ণু বাবুর কতকগুলি প্রিয় কথা আছে, এবং কতকগুলি প্রিয় চিত্র আছে। অনেক স্থানেই সেই কথা এবং সেই চিত্র গুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বার বার এক কথা কি ভাল লাগে? একথাটী মনে রাখা খুব উচিত ছিল।

এই সকল দোষ স্বত্তেও জীবনপ্রদীপ বাঙ্গালীর এক আদরের জিনিস। ইহাতে অনেক অমূল্য চিত্র, অমূল্য কথার সমাবেশ হইয়াছে। শশঙ্কশেখরের শেষ পত্র খানি এক আশ্চর্য্য জিনিস। খাসিয়া পর্ব্বতের মহিলাগণের বর্ণনা, নির্ম্মলচন্দ্রের রোগশয্যা, বিলাসপুরের ছিন্নমস্তার বাড়ী, লীলার মৃত্যু, হরগোবিন্দের বিচার গৃহ, এবং দস্যুর বাড়ী প্রভৃতির বর্ণনা অতি আশ্চর্য্য, অতি সুন্দর। ইহার সমতুল্য বর্ণনা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প আছে।

গ্রন্থকারের ভাষা কবিত্বময়, ভাবময়, তেজোময়। তাতে বীণার ঝঙ্কার আছে, কুসুমের সুবাস আছে, হৃদয়ের কমনীয়তা আছে, বীরের অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আছে। তবে ব্যাকরণ দোষ নাই, একথা বলিতে পারি না। দোষ ক্রটী স্বত্তেও একথা বলিতেই হইবে, বিষ্ণু বাবুর লেখনী উপন্যাসের বিশেষ উপযোগী।

বিষ্ণু বাবুর গ্রন্থের দোষ এবং গুণের কথা অনেক বলিলাম। এই পুস্তকের অবান্তরিক চিত্রের বর্ণনায় তাঁহার হৃদয়ের যে মহত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই মহত্ত্ব স্থায়ী হইয়া থাকিলে, কালে তাঁর হাতে আমরা আরো অনেক মহত্ত্বময় চিত্র পাইব। ভাবের বেগ সম্বরণ এবং ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে শিখিলে কালে তিনি এক জন কৃতী লেখক হইতে পারিবেন। বিষ্ণু বাবুর গ্রন্থের শত শত দোষ স্বত্তেও, যিনি এই গ্রন্থ একবার পড়িবেন, তিনিই তাঁর সাধুতা ও ধর্ম্মপিপাসার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইবেন। বিধাতা তাঁকে আরো শক্তি দিন, তিনি বাঙ্গালা ভাষার আরো উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হউন।

পাষাণী।

আমি কত দূর হইতে আসিলাম। দূরে দূরে গভীর গিরি গহ্বরে আমার জন্ম। কত বনভূম-আঁধারে আবরিত, ক্ষণস্থষ্ট ক্ষণ-বিধ্বংসী জলদজালে পরিবেষ্টিত, দ্বিপী ভল্লুক-নিনাদিত অন্ধকার বনভূমের মধ্য দিয়া তোমারই জন্য ছুটিয়া আসিলাম। অন্ধকারে ভীষণ জীব-জন্তু-দুরধিগম্য, কীট পতঙ্গ-নিবারিত-প্রবেশ-ভুবন, ভাস্বর ভাস্করের হিরণ কিরণে নিরালোকিত গিরি-গুহার ভিতর আছে স্থান অতি ভয়ঙ্কর, না চলে ভানুর ভাতি, তমোময় দিবা রাতি, সেই স্থান দিয়া অতি ধীরে অতি ধীরে, কেহ না জানিতে পারে, না চিনিতে পারে, তাই ভয়ে ভয়ে অতি ধীরে চুপে চুপে আসিয়াছি। পথে রাক্ষসের ন্যায় ভীষণ রাশি রাশি বিশাল প্রস্তরে বাধা দিয়াছিল, কুল কুল করিয়া কাতর স্বরে তাহাদের নিকট কতই কাঁদিয়াছি, নিরাশ্রয় কুমারী দেখিয়া রাক্ষসেরা দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করে নাই। অনাথিনীর কাতরতায় কয় জনের দর-বিগলিত-হৃদয় দেখিয়াছ? শেষে অনাথবন্ধুর শরণ লইয়া কোনও প্রকারে চলিয়া আসিয়াছি। হৃদয়ের গভীর গুহায় নিঃশব্দে পরিপোষিত ভালবাসার কত বল; লক্ষ২ বৎসরের জন্য পরিচয় দিবার নিদর্শন রাখিয়া আসিয়াছি। ইহাও বলিব, কোথায়ও কুসুম-কলিকায় ভ্রমরের অনুরাগ গুঞ্জনে, শ্যামল লতিকায় পাদপের সস্নেহ আলিঙ্গনে, তরু-শাখায় কলকণ্ঠ বিহঙ্গের প্রণয়-চুম্বনে উৎসাহ পাইয়াছি। শোকে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, রোগে স্বাস্থ্যে দূরে দূরে—অতি দূর হইতে তোমারই মুখখানি স্মরণ করিয়া, বুকে অপরিমিত প্রণয়-কুসুমের রাশি লইয়া, বালিকা নবপ্রণয়ের গাঢ় উচ্ছ্বাস লইয়া তোমার চরণতলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বঁধুহে, সখাহে, আমাকে চরণ তলেই ফেলিয়া রাখিলে! বুকে তুলিয়া লও না!

আমি বনমালতী, অটুট যৌবনভারে অবনত, শাখায় পাতায় প্রফুল্ল, বুকভরা মদ-গন্ধে দিগন্ত আমোদিত,—উড়ে উড়ে কত দূর হইতে মধুপগণ ছুটিয়া আসিতেছে; বাতাসে বেচারীদের উল্টে পাল্টে দিতেছে, কুয়াশা উঠে চক্ষু অন্ধ করে দেয়, পথভ্রম ঘটে, তবু আমার বুকপোরা গন্ধে সব ছুটে আসে, গুণ্ গুণ্ করে কাণের কাছে কতই প্রণয়সঙ্গীত গাহিয়া থাকে, কত কথাই বলে। দুর্ব্বল নব-বিকসিত কুমারী মল্লিকা যাতী যুথী তাদের মিষ্ট কথায় ভুলিয়া যায়; আমার তাদের ক্রন্দন কাতরতায় কাতরতা হয় না; ভালবাসার উচ্ছ্বাস দেখিয়া আনন্দ হয় না; আমি অচল অটল, ইচ্ছার দৃঢ়তায় পাষাণের সমান কঠোর। এক আশায়, এক উৎসাহে আমায় মনুষ্যের দুর্ব্বলতার অতীত করিয়াছে। লোকের দুর্ব্বলতার পরিমাণ আমি বুঝিতে পারি না। আমি অহৃদয় নহি; যখন দুঃখ বুঝিতে পারি, তখন চোখের জলে তাদের মন্তাপের শান্তি করি, কিন্তু আমি যা বুঝিনা, তার জন্য কাতর

হই না। লোকে আমাকে তজ্জন্য অহংকারী বলে, গরবী বলে, কত কি বলে। তাদের নিন্দায় আমার দুঃখ হয়, আমি কাঁদি যে কেন তারা আমায় বুঝে না। যাই হউক, আমায় সকল তেজ, সকল বল তোমার কাছে উঠিয়া যায়, আমি তখন ননীর পুতলীর মত গলিয়া পড়ি। তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আছি, ফুলের পরাগে তোমার বুকখানি ধূসরিত করিয়া দিতেছি, আতপতাপিত মস্তিষ্ক পল্লবে ঢাকিয়া রাখি, বায়ু-তাড়িত দেহ আপন দেহ দিয়া আচ্ছাদন করি। ফোয়ারার মত আমার ভালবাসা একটী উর্দ্ধ রেখায় তোমারি পানে ছুটিয়াছে। বঁধুহে! সখাহে! আমাকে বুকের বাহিরে রাখিয়াছ কেন? ভিতরে পুরিয়া লও, বুকের ভিতরে ভিতরে তোমার অন্তরের অন্তরে আমাকে লুকাইয়া ফেল; উন্মত্ত যুবকগণের বিড়ম্বনা হইতে আমাকে আশ্রয় দাও।

বিশাল বিশ্বব্যাপী মহাসাগর—জলে ভরা, প্রাণে ভরা, মুকুতারতনে ভরা! তবুও তার হৃদয়ের ভিতরে কি অব্যক্ত দুর্দ্দম বাসনা। কিসের জন্য সে বুক ফুলাইয়া ফুলাইয়া উঠিয়া থাকে, ছুটিয়া গিয়া ধরণীর পায়ে লুটাইয়া পড়ে, মনের কথা ফুটিতে না পারিয়া গুমরে গুমরে কাঁদে, আর লুটাইয়া পড়ে। প্রলয়ের সাক্ষী, অনন্তের আদর্শ, অতলস্পর্শ মহাসাগর;-তাহার এত চঞ্চলতা, তাহার অতলস্পর্শ বুক পূর্ণ করিয়া উছলাইয়া পড়ে এমন তার কিসের বাসনা? সে আর কোন দিকে যায় না কেন? তাহাকে লোভ করে জগতের কে না? রত্ন ত কাহাকে অন্বেষণ করে না, সবাইত রত্নকে অন্বেষণ করে। তবে সমুদ্র—প্রাণভরা যৌবনভরা সমুদ্র, কাহার জন্য পাগল? ধরণী—ফলপল্লব সুশোভিতা শ্যামাঙ্গিনী কোমলা কোথায় কেমনে তাহার প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছে তাহার পর আর তাহার সঙ্গে কথাটীও কয় নাই; বুঝি, তাহার কথা গুলি শুনিয়াও বুঝে না—তাহার প্রাণের গভীর আশা উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রণয়োচ্ছ্বাস তরঙ্গায়িত করিয়াছে, মর্ম্মস্থল তাড়িতচালিত করিয়াছে; তাই সে—

আছাড়ি চূর্ণিতে চাহে সমগ্র হৃদয়
কঠিন পাষাণময় ধরণীর তীরে।

বাহুলতায় ধরণীর সমগ্র দেহ আবেষ্টন করিয়া সমুদ্রের পিপাসা মিটে নাই, চুম্বনে চুম্বনে তুফান তুলিয়াছে, তবুও ধরণী কথা কয় নাই, তাই তার পিপাসা বাড়িয়াছে। সে ধরণীর সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে চায়, দুই এক হইতে চায়, দুই খানি তনু এক করিতে চায়—

বিজন বিশ্বের মাঝে মিলন শ্মশানে
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোক লুপ্ত চরাচর
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্নপ্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর!

যে যত বড় তার তত উচ্চ আশা। নির্ঝরিনী পর্ব্বতের পদতল হইতে বুকের উপরে উঠিতে চায়; মালতী বুকের বাহিরে থাকিতে চায় না, ভিতরে প্রবেশ করিতে চায়; মহাসমুদ্রের আশা আরো মহান—সে দুয়ে মিলিয়া এক হইতে চায়। এই খানে প্রেমের পরাকাষ্ঠা।

পাষাণি,—হৃদয়ের এ মর্ম্মব্যথা কি ঘুচিবেনা? কত কথা চরণে ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলাম, একটা কি তার শুনিলে না? অস্ফুট অনন্ত বাসনা ফুটিয়া আর কি হইবে, আর ফুটিব না। প্রাণের আশা

নিশ্বাসের সহিত বুকের ভিতর চাপিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া চলিলাম।

এখন আমার একটী প্রার্থনা—বুকটা পাতিয়া দিই, পা দুখানি বুকের উপর চাপিয়া দিয়া বুকটা দলিয়া দাও। এ চির দিনের হুহু হুহু বাতাসের শব্দ, অনন্ত ঝটিকা আর সহে না, প্রাণ তোলপাড় হইয়াছে, আর সামলাইতে পারি না। একবার শ্যামারূপে বুকের উপর দাঁড়াইয়া, বুকের আশা ভরসার সহিত জ্বালা যন্ত্রণা সব ঘুচাইয়া দাও—অনন্ত কাল মহাপুরুষ—যখন এতই সহিতে পারিলাম, বুকের উপরে পাইয়া ভিতরে পূরিতে চাহিলাম, সে আশা মিটাইলে না, তাহাও সহিতে পারিলাম তবে কি আমি মহাপুরুষ নহি? মহা-পুরুষ শান্ত সদাশিব হইয়া, চরণ তলে পড়িয়া পড়িয়া স্তিমিত নয়নে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকি, তুমি কালী কঠোর নির্ম্মম হৃদয়ে বুকের উপর চির দিন দাঁড়াইয়া থাক, যেন কালে কালে কখন কোন বাসনা পুরুষের হৃদয়কে বিচলিত না করিতে পারে। একাকিনী অনন্তকাল হৃদয়ে রাজত্ব কর—রাধা প্রেমের কোমল বন্ধনও যেন তোমাকে বদ্ধ করিতে না পারে—কালের, স্থানের, হৃদয়ের, স্বর্গের, মর্ত্ত্যের,পাতালের অধিশ্বরী হইয়া রাজত্ব কর, —কেবল আমার চোখের উপর চোখ দুটী রাখিও, আমি মুখ খানি দেখিতে দেখিতে যেন অনন্তে মিলাইতে পারি। পাষাণি, পাষাণি, আর কিছু বলিব না।

না না—ও মুখের দিকে আর চাহিব না। আকাশের পাখী—তোমার মুখখানি দেখিয়া বাগুরায় বন্দী হইয়া ছিলাম—তুমি কঠোর চরণে বুক দলিয়া দিলেও ওমুখখানি দেখিলে আবার বুক ফুলিয়া উঠিবে। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও,আমার বন্ধন ঘুচাইয়া দাও, আমি সন্ন্যাসী ছিলাম, সর্ব্বনাশি, আমাকে গৃহবাসী কেন করিয়াছ? ছেড়ে দাও, চলে যাই; এমোহ ভাঙ্গাইয়া দাও, এ মায়া কাটাইয়া দাও। যদি তোমাতেই মিশিতে না পাইলাম,অনন্তেও মিশিতে চাহি না। ছেড়ে দাও, চোক বুজিয়া ধরণীর শান্তিময় ক্রোড়ে প্রবেশ করি। এ তুফান সহেনা! বড় জ্বলিয়াছি। চলিলাম, চলিলাম। পাষাণি, পাষাণি, তুই একাকিনী সুখে থাক্। মরণেও তোর মঙ্গল কামনা করিব। চলিলাম,—

"জগতের মরুভূমে, দ্বিপ্রহরে রবিতাপে
শুষ্ক কণ্ঠে করিতে চীৎকার
সে পাষাণী কোথায় আমার?"

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী।

বঙ্গে সংস্কৃত-চর্চ্চা। (৫ম)

টোল ও চতুষ্পাঠী।

পরমানন্দ দাস (কবিকর্ণপুর) ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কাঞ্চন-পল্লী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বৈদ্য জাতীয় শিবানন্দ সেনের পুত্র। কাব্য রচনায় তাঁহার অসীম চাতুর্য্য ও কৌশল সন্দর্শনে চৈতন্যদেব তাঁহাকে কবিকর্ণপুর উপাধি প্রদান করেন। কবিকর্ণপুর অলঙ্কার কৌস্তুভ নামক অলঙ্কার,—চৈতন্য

চন্দ্রোদয় নামক নাটক,—শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা নামক চৈতন্যবিষয়ক খণ্ড-কাব্য,—বৃহৎগণোদ্দেশদীপিকা নামক কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক সংগ্রহ গ্রন্থ, আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ নামক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ্য-গদ্যময় কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের টীকাকারের নাম বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী।*

স্মার্ত্ত চূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে জন্মেন, কি স্থানান্তর হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। তাঁহার পূর্ব্বে মিথিলায় দায়ভাগ-প্রণেতা ও ধর্ম্মরত্ন নামক স্মৃতি গ্রন্থের সংগ্রাহক জীমূতবাহন, বাচস্পতি মিশ্র, শূলপাণি প্রভৃতি সুবিখ্যাত স্মৃতিসংগ্রহ-কারগণের ব্যবস্থানুসারে বঙ্গদেশে কর্ম্ম কাণ্ড প্রভৃতি নির্ব্বাহিত হইত। রঘুনন্দন স্বকৃত ব্যাখ্যাদ্বারা প্রাচীন স্মার্ত্তগণের মতের দোষ প্রদর্শন করিয়া, সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রকে শুদ্ধি প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে বিভক্ত ও সংগৃহীত করেন। বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র পূজা বিবাহাদি কর্ম্মকাণ্ড তাঁহার মত অনুসারে সম্পন্ন হইতেছে। অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের দুই খানি টীকা প্রচলিত আছে। একখান গোঁসাই ভট্টাচার্য্য প্রণীত, অপর খানি কাশীরামী টীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

নৈয়ায়িক-শিরোমণি রঘুনাথ (কাণা ভট্ট শিরোমণি) স্বীয় অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও তর্কপ্রভাবে ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ক মিথিলা প্রদেশের অবিসংবাদিত প্রাধান্য খর্ব্বীকৃত করিয়া নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে মিথিলাই ন্যায়শাস্ত্রচর্চ্চার প্রধানতম স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে ছাত্রগণ আসিয়া মিথিলার চতুষ্পাঠী সমূহে দর্শন ও স্মৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। অনেকানেক মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ততার্কিক, নৈয়ায়িক ও দার্শনিক মিথিলায় জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহার বিমল যশঃপ্রভাব দিগ্-দিগন্তে বিস্তারিত করিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণির অধ্যাপক বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় গমনপূর্ব্বক ন্যায়-শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করিয়া আসিয়াছিলেন। রঘুনাথ সার্ব্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব মানসে তথায় গমন করেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সেই সময়ে মিথিলাতে পক্ষধর মিশ্র নামে এক অলৌকিক প্রতিভাশালী অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বর্ত্তমান ছিলেন। রঘুনাথ প্রথমে তাঁহার সুপণ্ডিত শিষ্যগণকে, তদনন্তর সেই দিগন্তবিশ্রুত-কীর্ত্তি দিগ্‌বিজয়ী মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপককে বিচারে পরাভূত করিয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করেন। তৎপরে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রঘুনাথ চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ন্যায়শাস্ত্রের একমাত্র অধ্যয়ন-স্থান বলিয়া নবদ্বীপ গণ্য হইতে লাগিল। মিথিলার যশঃপ্রভা দিনে দিনে ম্লান ও হীনপ্রভ হইতে লাগিল। এই সময় হইতেই নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের সমধিক আলোচনা ও ন্যায়শাস্ত্রবিষয়ক নানা গ্রন্থ বির-

* শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত ঐতিহাসিক রহস্য, ১ম ভাগ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-বৃন্দের গ্রন্থাবলী, ১২৭—১৫৫ পৃষ্ঠা।

চিত হইতে আরম্ভ হয়। রঘুনাথ তত্ত্বচিন্তামণির প্রত্যক্ষ ও অনুমান খণ্ডের দীধিতি (চিন্তামণি-দীধিতি বা শিরোমণি) নামক টীকা, বৌদ্ধাধিকারের টীকা এবং অনেক বাদার্থ রচনা করেন।

রঘুনাথ শিরোমণির পর রামভদ্র সিদ্ধান্ত, উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলির রামভদ্রীয় নামে টীকা রচনা করেন। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ রঘুনাথ প্রণীত দীধিতি গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। শ্রীরাম তর্কালঙ্কার নামক জনৈক ছাত্র স্বীয় প্রতিভা ও বিদ্যাবলে রঘুনাথ শিরোমণির সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন। প্রবাদ আছে যে, কোন অপরিজ্ঞাত কারণ বশতঃ তিনি গুরুদেবের বিরাগ-ভাজন হন। অধ্যাপক রঘুনাথ প্রিয়তম শিষ্য শ্রীরামকে সম্পূর্ণ অনাদর করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা গণ্ডমূর্খ ছিলেন, তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ ও আদর করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম এই দারুণ অপমানের প্রতিশোধ নিজে কোনও রূপে না লইয়া, মরণ সময়ে স্বীয় ঊনবিংশ বর্ষ বয়স্ক পুত্রকে তাহার প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞা করাইলেন। শ্রীরামতনয় ন্যায়শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ থাকায়, পিত্রাদেশ প্রতিপালনার্থে পিতৃগুরু রঘুনাথ শিরোমণিরই শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। রঘুনাথের নিকট পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃবৎসল শ্রীরাম-তনয় দীধিতির টীকা প্রণয়ন করেন। তৎপরে তিনি সমগ্র তত্ত্বচিন্তামণির বিশদ টীকা প্রণয়ন পূর্ব্বক পিতৃদায় হইতে মুক্ত হন। রঘুনাথের দীধিতি চিন্তামণির প্রত্যক্ষ ও অনুমান খণ্ডের হেত্বাভাস প্রকরণ পর্য্যন্ত বিরচিত হইয়াছিল। এইজন্য তিনি স্থানে স্থানে 'জানন্তি কেচিৎ হেত্বাভাসত্বং' বলিয়া গুরু রঘুনাথের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার টীকা রঘুনাথের দীধিতি অপেক্ষা স্পষ্ট ও বিশদতর। শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের এই গুণধর পণ্ডিতাগ্রণী তনয়ের নাম মথুরানাথ তর্কবাগীশ। তাঁহার প্রণীত টীকা মাথুরানাথী টীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ। মাথুরানাথী দীধিতির ও তত্ত্বচিন্তামণির টীকা নৈয়ায়িক-শিরোমণি জগদীশ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের মণিদীধিতিপ্রকাশিকা ও গদাধর ভট্টাচার্য্য বিরচিত টীকা অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। জগদীশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি শব্দশক্তিপ্রকাশিকা নামক সুপ্রসিদ্ধ বাদার্থ গ্রন্থ প্রণেতা। গদাধর শক্তিবাদ, মুক্তিবাদ, ও ব্যুৎপত্তিবাদ রচনা করত রঘুনাথকৃত বৌদ্ধাধিকারের টীকা প্রভৃতি রচনা করেন। *

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও রঘুনাথ শিরোমণির প্রাদুর্ভাব-সময়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরে নবদ্বীপে কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য নামে একজন অসাধারণ তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত আবির্ভূত হন। তিনি বহুবিধ তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে তন্ত্রসার সঙ্কলন পূর্ব্বক আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপে বিবিধ গ্রন্থ রচিত ও সঙ্কলিত হইতে আরব্ধ হইল। চতুষ্পাঠীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চতুষ্পাঠীর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা অঞ্চল হইতে বিদ্যার্থীগণের সমাগম-স্রোতও বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ পাঠ সমাপন করিয়া,

* Dr. Mitra's Notices of Sanskrit Mss. vol. I. p. 286.

এই খানেই অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নবদ্বীপের বিদ্যোৎসাহী রাজারা অধ্যাপকগণের জীবিকা নির্ব্বাহার্থে যথেষ্ট নিষ্কর ভূমি দান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ছাত্রমণ্ডলীকেও ছাত্রবৃত্তি প্রদানাদি বিবিধ প্রকারে সংস্কৃতের উন্নতির প্রতি উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার একমাত্র অদ্বিতীয় স্থান হইয়া উঠিল। চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য ও প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নবদ্বীপ তীর্থমধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল।

নবদ্বীপের নরপতিগণ শাণ্ডিল্যগোত্রজ বেণীসংহার নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটক-প্রণেতা স্বনামখ্যাত ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহারা নানা অঞ্চল হইতে বিবিধ বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতগণকে আনাইয়া রাজধানীতে সমাদরে রাখিতেন, অথবা স্বীয় অধিকারমধ্যে সংস্থাপন করিতেন। তাঁহারা টোল ও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকগণকে তাঁহাদের ব্যয়নির্ব্বাহোপযোগী ভূমি প্রদান করিতেন, এবং পাঠার্থীগণের আবশ্যকীয় ব্যয়ের নিমিত্ত প্রত্যেক টোলে কিছু কিছু বার্ষিক বৃত্তি দিতেন। যখন কোন ছাত্র পাঠ সমাপন পূর্ব্বক অধ্যাপনা করিবার মানস করিতেন, তখন তিনি রাজসভায় সমাগত হইয়া আপন বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। অধ্যাপনক্ষম হইলে তিনি নিয়মিত বৃত্তি পাইতেন। পুরাণব্যবসায়ী পাঠকগণ অধ্যয়ন সমাপ্তি করিয়া, রাজসন্নিধানে পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক উপাধি গ্রহণ করিতেন। পুরাণেতর শাস্ত্রশিক্ষার্থীগণও সময়ে সময়ে রাজসমীপে আসিয়া স্ব স্ব বিদ্যার পরিচয় দিতেন। রাজাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন। সময় সময় রাজারা চতুষ্পাঠীতে যাইয়া অধ্যাপকদিগের সহিত শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহারা নানা উপায়ে পণ্ডিতগণকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। প্রত্যহ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহারা সভাস্থ ও অভ্যাগত পণ্ডিতগণের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রের আলাপ করিতেন। মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ রাজসদনে উপস্থিত হইতেন। রাজারা তাঁহাদিগকে গুণানুরূপ পারিতোষিক প্রদান করিয়া সসম্মানে বিদায় দিতেন। ইঁহারা যে স্বদেশীয় পণ্ডিতগণেরই আনুকূল্য করিতেন, এমন নহে। বিদেশীয় ও ভিন্ন অধিকারবাসী প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণেরও নানাপ্রকারে উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। বাক্‌লা, বিক্রমপুর প্রভৃতি দূরবর্ত্তী প্রদেশের পণ্ডিতগণ ইঁহাদের নিকট যে ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছেন, অধুনাও তাঁহাদের বংশীয়েরা তাহা ভোগ করিতেছেন।

রাজারা স্ব স্ব সন্তানগণকে সংস্কৃত সাহিত্যাদি শিখাইতে বিশেষ যত্নবান হইতেন। তাঁহারা সংস্কৃতে এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিতেন যে, অনায়াসে সুন্দর সুন্দর শ্লোক সংস্কৃতে রচনা করিতে পারিতেন। রাজবাটীতে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বদা এতদূর ব্যবহৃত হইত যে, রাজপরিচারকের মধ্যে অনেকে সংস্কৃতে কথোপকথন বেশ বুঝিতে পারিত। *

*শ্রীযুক্ত বাবু কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সংকলিত ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত ৭৮—১০।

ভট্টনারায়ণ হইতে একবিংশতিতম বংশধর ভবানন্দ মজুমদার রাজোপাধি সহ চতুর্দ্দশ পরগণার আধিপত্য দিল্লীশ্বর সম্রাট জাহাঙ্গীর হইতে প্রাপ্ত হন। তিনি অতি অল্প বয়সেই সংস্কৃতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ভবানন্দের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রামজীবন ও রামকৃষ্ণ উভয়েই বিদ্যোৎসাহী ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। রাজা রামকৃষ্ণ স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা এ প্রদেশে বিদ্যার উন্নতি সাধন বিষয়ে অধিকতর উৎসাহী ও যত্নবান ছিলেন। তিনি অধ্যাপকগণের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহার্থ তাঁহাদিগকে ভূরি ভূরি নিষ্কর ভূমি দান করেন। নবদ্বীপে বিদেশীয় ছাত্রদিগের ব্যয়ের নিমিত্ত তিনি অনেক টাকার সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত জমীদারী দশসালা বন্দোবস্ত হয়, তখন যে সম্পত্তির আয় হইতে রাজারা ঐ টাকা দিতেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা স্বহস্তে লইয়া অধ্যাপকগণকে সরকারী রাজকোষ হইতে মাসিক দুই শত টাকা দিবার বন্দোবস্ত করেন। অদ্যাপি অধ্যাপকেরা নদীয়া জেলার কলেক্টরী হইতে মাসিক এক শত টাকা প্রাপ্ত হইতেছেন।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা নানাবিধ বিদ্যা-বিশারদ বহু পণ্ডিত দ্বারা সমলঙ্কৃত ছিল। তাঁহার সময়ে (১৭১০-১৭৮২) নবদ্বীপে সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্ব্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন —সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত গোপাল ন্যায়লঙ্কার, রামানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন, —ষড়দর্শনবিৎ শিবরাম বাচস্পতি, রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ বর্ত্তমান ছিলেন। গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শান্তিপুরের রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিয়ত রাজসভায় অবস্থিতি করিতেন। অন্যান্য পণ্ডিতগণ রাজার আহ্বান অনুসারে উপস্থিত হইতেন। রাজা ইঁহাদিগকে ও বিদেশীয় অভ্যাগত পণ্ডিতবর্গকে বহু যত্ন ও সমাদর সহকারে রাখিয়া, তাঁহাদের সহিত নানা শাস্ত্রের আলাপ ও বিচার করিয়া সাতিশয় সন্তোষলাভ করিতেন।

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রায় নিরন্তর রাজসদনে থাকিয়া, প্রসঙ্গানুসারে বিবিধ ভাবের কবিতা রচনা পূর্ব্বক রাজা ও অপরাপর শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতেন। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভাঁড় ও হাস্যার্ণব, ইঁহারাও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে এদেশে যেরূপ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তৎকালীন হিন্দুসমাজের উপর তাঁহার যেরূপ

৩৬০—৬৮ পৃষ্ঠা। কার্ত্তিকেয় বাবু বহুবৎসর পর্য্যন্ত নবদ্বীপের রাজসংসারে দেওয়ানী করিতেন। তৎকৃত ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত নামক নদীয়া রাজবংশের উৎকৃষ্ট ইতিহাস হইতে নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চ্চা সম্বন্ধীয় অধিকাংশ বিষয় সংগৃহীত হইল।

অপ্রতিহত প্রভুত্ব ছিল—তাহাতে বোধ হয়, তিনি যত্নশীল হইলে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিগর্হিত রীতি নিরসন পূর্ব্বক অনেক সমাজের কল্যাণকর রীতি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সামাজিক কুরীতি সংশোধনে হস্তক্ষেপ করা কখনও স্বীয় কর্ত্তব্য মধ্যে গণনা করেন নাই। প্রথিত আছে, বিক্রমপুরের রাজা রাজবল্লভ স্বীয় তরুণবয়স্কা কন্যার বৈধব্য যন্ত্রণা দূরীকরণ মানসে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চাতুরীতে নবদ্বীপের পণ্ডিতবর্গ বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা দিতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থ হয়। রাজা শিবচন্দ্র সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার পিতা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে যে সকল পণ্ডিতগণ এতদ্দেশে বিদ্যাজ্যোতি বিকীরণ করিতেছিলেন, তাঁহার সময়েও তাঁহাদের অধিকাংশই বর্ত্তমান ছিলেন।

রাজা শিবচন্দ্রের ভ্রাতা ঈশান চন্দ্র তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র ঈশ্বর চন্দ্রের বিরুদ্ধে নবদ্বীপের জমীদারী সম্পর্কীয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দানপত্র শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে নালিশ উপস্থিত করেন। বিচারপতি এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ জ্ঞাত হইবার জন্য উভয় পক্ষকে কতিপয় প্রধান ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নাম লিখিয়া দিতে আদেশ করেন। তদনুসারে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র নবদ্বীপনিবাসী কৃপারাম তর্কভূষণ, ত্রিবেণীবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, কলিকাতা সভাবাজার নিবাসী হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম—এই তিনজন পণ্ডিতের নাম লিখিয়া দেন। তাঁহারা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকৃত দানপত্র শাস্ত্রসম্মত বলিয়া ঈশানচন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দেন। এই মোকদ্দমার সময় মুরসিদাবাদের গৌরহরি, দিনাজপুরের সদাশিব, শম্ভুনাথ, গোকুলচন্দ্র ও কালীশঙ্কর শর্ম্মা, ঢাকার রামজীবন বিদ্যালঙ্কার রামনাথ বিদ্যাভূষণ, মহাদেব পঞ্চানন, পার্ব্বতীচরণ বিদ্যাবাচস্পতি ও রঘুনাথ বাচস্পতিও —ঈশানচন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা প্রেরণ করেন।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সভাস্থ পণ্ডিতবৃন্দের মধ্যে বিনয় বাচস্পতি নামে একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা ছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সারদামঙ্গল নামে একখান সংঙ্গীতগ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচনা করেন। কৃষ্ণনগরের গোপ, তৈলকার ও আচার্য্য ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল গীত গাইয়া বিলক্ষণ ধন উপার্জ্জন করিত। রাজা ঈশ্বর চন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপে শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, কাশীনাথ চূড়ামণি, রামলোচন ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকগণ,—রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, রামদাস সিদ্ধান্ত, কালীকিঙ্কর বিদ্যাবাগীশ, কৃপারাম তর্কভূষণ প্রভৃতি সুবিখ্যাত স্মার্ত্তগণ বর্ত্তমান ছিলেন। ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও শান্তিপুরবাসী রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও তদানীং বিদ্যমান ছিলেন।

রাজা গিরীশচন্দ্র যদৃচ্ছা ব্যয় করিয়া প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও পারসী ভাষা অনর্গল কহিতে ও অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার সময়ে লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ ও রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতি স্মার্ত্তাচার্য্যগণ নবদ্বীপে বর্ত্তমান ছিলেন। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বাড়েবাঁকা গ্রামবাসী কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী (রসসাগর) নামক একজন অসা-

ধারণ সুরসিক, সদ্বক্তা ও দ্রুতকবি তাঁহার সভাসদ ছিলেন।

রাজা শ্রীশচন্দ্র বাল্যাবস্থায় সংস্কৃতশাস্ত্র ভালরূপে শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু যৌবনে স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন ও পণ্ডিতগণের সহিত তাহার আলোচনা করিয়া এতদূর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, প্রায় সকল প্রধান সংস্কৃত গ্রন্থেরই মর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার বহুল প্রচলন সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ও যত্ন ছিল। বার্ষিক বৃত্তি প্রভৃতি দিয়া তিনি টোলের অধ্যাপকগণের যথাসাধ্য আনুকূল্য করিতেন।

নবদ্বীপাধিকারে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বৈদ্য, ঘটক ও কুলজ্ঞদিগের সন্তানেরা প্রায় সকলেই বাল্যাবস্থায় সংস্কৃত শাস্ত্র ও ভাষা অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতেন। পূর্ব্বে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কামালপুর, কুমারহট্ট, শান্তিপুর উলা, বাহিরগাছি, বিল্বপুষ্করিণী, বিল্বগ্রাম প্রভৃতি কয়েক স্থানে অনেক চতুষ্পাঠী ছিল। বিদ্যার্থীগণ নানা প্রদেশ হইতে ঐ সকল স্থানে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। এতদ্ব্যতীত অনেক গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টোল ছিল। তন্নিকটবর্ত্তী শিক্ষার্থীরা ঐ সকল গ্রাম্য টোলেই অধ্যয়ন করিতেন। তন্মধ্যে যাঁহাদের অধিক বিদ্যালাভের অভিলাষ হইত, তাঁহারা ঐ সকল টোলে কিয়দ্দূর পাঠ সমাপন করিয়া, প্রাগুক্ত কোন এক স্থানের টোলে প্রবিষ্ট হইতেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ধর্ম্মালোচনা ও গ্রন্থরচনা—এই সকল অনুষ্ঠানেই জীবন যাপন করিতেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণের দান গ্রহণ করিতেন না। তাঁহাদের সংসারযাত্রা ও ছাত্রগণের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নবদ্বীপের রাজারা যে কিছু ভূমি দান বা বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিতেন, তাহাতেই তাঁহারা পরিতুষ্ট থাকিতেন।'

"পূর্ব্বোল্লিখিত স্থান সমূহে পূর্ব্বে সংস্কৃতের যেরূপ আলোচনা ছিল, ইদানীং আর সেরূপ নাই। কোন্ স্থানের টোল চতুষ্পাঠী এককালে উঠিয়া গিয়াছে, এবং কোন স্থানে উহা অতি সামান্যাবস্থায় রহিয়াছে। নবদ্বীপের রাজারা নিঃস্ব হওয়াতে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণ ইদানীং পূর্ব্ববৎ রাজদত্ত আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। এদিকে বিষয়ী লোকদিগের ন্যায় তাঁহাদের ভোগাভিলাষও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র অধ্যাপনা আরম্ভ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পাইয়া অর্থলাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়েই তাঁহাদের মন ধাবিত হইতেছে। এ কারণ অধুনা ছাত্রগণ ব্যাকরণ, অভিধান, ভট্টিকাব্য ও নৈষধ-চরিতের কিয়দংশ পাঠ করিয়া কেহ বা স্মৃতি শাস্ত্র, কেহ বা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। নব্য ও প্রাচীন স্মৃতির কিয়দংশ অথবা ন্যায়শাস্ত্রের দুই এক খণ্ডের মাথুরী ও জাগদীশী টীকা এবং গাদাধরী পাতড়া পাঠ করিয়াই অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। আর যাহাতে অধিক নিমন্ত্রণপত্র পান এবং সভায় বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা পূর্ব্বক জয়ী হইতে পারেন, তৎপ্রতি ঐকান্তিক যত্ন করিতে থাকেন; এদিগে অনেক মূলগ্রন্থ তাঁহাদের নয়ন-গোচরও হয় না।

অধুনা (১৯৩২ সংবৎ) কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ ব্যতীত এ অঞ্চলে নবদ্বীপ

ও ভাটপাড়ায় সংস্কৃত শাস্ত্রের অধিক আলোচনা আছে। যদিও ইদানীং নবদ্বীপে পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের তুল্য অধ্যাপকের অভাব হইয়াছে, তথাপি নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থীরা তথায় আসিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এক্ষণে নবদ্বীপে স্মৃতির ৯, ন্যায়শাস্ত্রের ৭, এবং বেদান্তাদি অপরাপর দর্শনের ১ খানি টোল আছে।' *

প্রস্তাব ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া উঠিল। টোল ও চতুষ্পাঠী সম্বন্ধে আমাদের আরও যাহা যাহা বক্তব্য আছে তাহা প্রস্তাবান্তরে সন্নিবেশ করিতে বাসনা রহিল।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র দাস।

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
আজ কাল করি কত, বছর হইল গত,
চাহিয়া রয়েছি পথ সতত আশায়!
কোথায় গিয়েছ ভাই, তত্ত্ব নাই—বার্ত্তা নাই,
এমন করিয়া নাকি কেহ কোথা যায় ?

১

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
তুমি ভিন্ন নাহি আর, শূন্য মম এ সংসার ;
জগতের বন্ধু হ'য়ে জগদ্বন্ধু! হায়,
দাদারে একাকী ফেলি, বল্ ভাই কোথা গেলি,
হলনা একটু দয়া পাষাণ হিয়ায় ?

২

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
আকুল উন্মত্ত প্রাণে, চেয়ে আছি পথপানে,
লইয়া শ্মশান বুকে, মুখে হায় হায়,
ঢালিয়া নয়নজল, নাহি নিবে এ অনল,
আয়রে প্রাণের ভাই আয় বুকে আয়!

৩

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
তোমারে হইয়ে হারা, পিসী মা পাগল পারা
দিবা নিশি অভাগিনী করি হায় হায়,
তোমারি উদ্দেশে গেছে, আর নাহি আসিয়াছে,
ভুলিয়া রয়েছে বুঝি পাইয়া তোমায়!

৪

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
ত্যজিয়া মরত ভূমি, কোথায় গিয়েছ তুমি,
কোথা সে স্বর্গের রাজ্য—কত দূর হায়,
শুধাই কাহার কাছে, কোথায় সে দেশ আছে,
সে দেশে এ দেশে লোক নাহি আসে যায় ?

৫

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
ফুটিলে কুসুম রাশি, পরিমলমাখা হাসি
স্বর্গের সুগন্ধ ভাবি মাথা তার গায়,
শুধাই তাহার কাছে, কোথায় সে দেশ আছে,
দেখেছে দেবের দেশে দেবতা তোমায় ?

৬

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
বসিয়া বকুলশাখে, কোকিল যখন ডাকে
উন্মত্ত করিয়া চিত্ত স্বর্গীয় ভাষায়,
শুধাই তাহার কাছে, কোথা হ'তে আসিয়াছে,
দেখেছে কি ভাই তোরে—হায় হায় হায়।

* ক্ষিতীশবংশাবলি চরিত, ৩৯-৪১ পৃষ্ঠা।

৭

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
উষায় উঠিলে রবি, সুন্দর সোণার ছবি,
ভাবিয়া স্বর্গের দূত শুধাই তাহায়,
"দেখেছ কি হে দিনেশ! কোথা সে ত্রিদিব দেশ
প্রাণের সোদরে মম দেখেছ তথায় ?

৮

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
বরষি অমৃত কর, আসে যবে সুধাকর,
ভাবিয়া ত্রিদিববাসী দেবতা তাহায়,
শুধাই তাহার কাছে, সেকি কভু দেখিয়াছে
দেব-বালকের সনে দেবের সভায় ?"

৮

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
শীতল মলয়ানিলে, ধীরে অঙ্গ ছুঁয়ে দিলে,
স্বর্গীয় পরশে উঠে শিহরিয়া কায়,
অমনি আকুল মনে, শুধাই সে সমীরণে
স্বর্গের সংবাদ দিতে এসেছ আমায় ?

১০

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
সায়াহ্নে সুনীলাকাশে, যখন তারকা হাসে
ব্যাপিয়া অসীম সীমা স্বর্গীয় শোভায়,
শুধাই তাদের কাছে, কে তোমারে দেখিয়াছে
কোথা সে ত্রিদিব দেশ হায় হায় হায় !

১১

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
যেখানে মায়ের কাছে, সারদা প্রমদা আছে
ভগিনী জনকদেব বিরাজে যথায়,
সেখানে গে'ছ কি তুমি, ত্যজিয়া মরত ভূমি
ফেলিয়া দাদারে তব একা—অসহায় ?

১২

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
বসিয়ে মায়ের কোলে, জনকের স্নেহবোলে
সারদার প্রমদার প্রীতি মমতায়,
ভুলে কি রহিলে ভাই.দাদা ব'লে মনে নাই,
অথবা আসিতে তারা দিল না তোমায় ?

১৩

ভাই গিয়েছ কোথায় ?
শুধাইও মার কাছে, আমারে কি মনে আছে
তোর মত করে কোলে করিতে আমায় !
শুধাইও সারদারে, এত ভালবাসি যারে,
ভুলিয়া করে কি মনে দেবের দয়ায় ?

১৪

ভাই গিয়াছ কোথায় ?
যদিও দেবের দেশ,নাহি দুঃখ—নাহি ক্লেশ,
চিরশান্তি চিরসুখে পূর্ণ সমুদায়,
জনক জননী আছে, কি ভয় তাদের কাছে,
আদরে সারদা সদা রেখেছে তোমায় !
এদেশে কেহই নাই, শুধু ছিনু দুটী ভাই,
আত্মীয় বান্ধবে পূর্ণ রয়েছ তথায় !
তথাপি আকুল মন, তবু চিন্তা অনুক্ষণ,
জানিতে কুশল তব প্রাণ সদা চায়,
ভাই গিয়াছ কোথায় ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

হিন্দুসমাজের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা। (৪র্থ)

(ধর্ম্ম)

হিন্দুধর্ম্মের বৈদিক, বৈদান্তিক অথবা ঔপনিষদিক এবং পৌরাণিক এই অবস্থাত্রয় অতিক্রম করিয়া এখন আমরা ইহার তান্ত্রিক যুগে পদার্পণ করিতেছি। বৈদিককালে হিন্দুধর্ম্মের কোমল কৈশোর দশায় অগ্নি, দ্যৌঃ, বরুণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থপুঞ্জের উপাসনাপূর্ণ সরল এবং সুললিত কবিতাময় ঋকমালার মধ্যেও আর্য্য ঋষিগণের অন্তরে অল্পে অল্পে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছি এবং এমন কি ইহাও দেখিতে পাইয়াছি যে,সেই সকল ঋষিগণ বিশ্বকারণ পরমেশ্বরের মূলতত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত না হইয়াও পূর্ব্বোক্ত আরাধ্য পদার্থ সকলের প্রতি বিশ্বকারণের স্বরূপাবলী আরোপিত করিতে নিরস্ত হয়েন নাই। বৈদান্তিক যুগে উপনিষদের রত্নময় কোষাগার সকলের মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞানের সুন্দর এবং সতেজ আলোক অতি পরিস্ফুট রূপে বিকীর্ণ করিয়াছেন এবং পুরাণে নানা দেব দেবী ও মত-বিসম্বাদের কোলাহলের ভিতরেও পরব্রহ্মের সিংহাসন সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের এই বিগত তিন অবস্থার মধ্যে কোন না কোন রূপে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মজ্ঞানেরই প্রাধান্য—ব্রহ্মোপাসনারই শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বতোভাবে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এখন আমরা দেখিব তন্ত্রকার ঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মকে কি অবস্থায় অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। তন্ত্রের ভাষা এবং বর্ণিত বিষয় সকলের প্রতি বিশেষ অবধানপুরঃসর দৃষ্টিপাত করিলে ইহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এত আধুনিক যে কোন কোন খানিকে মুসলমানরাজত্বকালে, কোন খানিকে বা ইংরাজ রাজত্বকালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। অমরকোষনামক বিখ্যাত অভিধানের স্বর্গবর্গে তন্ত্র শব্দের নামোল্লেখ নাই; ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে—অমরকোষের রচনাকালে তন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই। কোন কোন তন্ত্র যে মুসলমান এবং ইংরাজরাজত্বকালে রচিত হইয়াছে, পশ্চাল্লিখিত বাক্যে তাহা সুন্দররূপে প্রতীত হয়। যথা—

পশ্চিমাম্নায় মন্ত্রাস্তু প্রোক্তাঃ পারস্য ভাষয়া।
অষ্টোত্তরশতাশীতি যেষাং সংসাধনাৎ কলৌ।
পঞ্চ খানা সপ্তমীরা নবসাহা মহাবলাঃ।
হিন্দুধর্ম্মপ্রলোপ্তারো জায়ন্তে চক্রবর্ত্তিনঃ॥

অর্থাৎ—পশ্চিম বেদে একশত অষ্টাশীতি মন্ত্র পারস্য ভাষায় কথিত হইয়াছে, যাহার সাধন করিয়া কলিকালে খাঁ উপাধিধারী পাঁচজন, মীর উপাধিধারী সাত জন এবং সাহ উপাধিধারী নয়জন মহাবল ও হিন্দুধর্ম্মসংহারক সম্রাট হইবে।

পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরিঙ্গি ভাষয়া মন্ত্রা স্তেষাং সংসাধনাৎকলৌ
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট্ পঞ্চ লণ্ডজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥

অর্থাৎ—পূর্ব্ব বেদে নয় শত ছিয়াশীটি মন্ত্র ফিরিঙ্গি ভাষায় (ইংরাজিতে) কথিত,

হইয়াছে; তাহা সাধন করিয়া কলিকালে নয়, ছয় ও পঞ্চ জন যুদ্ধে অপরাজিত লণ্ড্-দেশোৎপন্ন (লণ্ডনজাত) ইংরাজ মণ্ডলেশ্বর হইবে।

এই সকল তন্ত্রোক্ত বচনে যখন মুসলমান সম্রাটদিগের খাঁ, মীর, সাহ প্রভৃতি উপাধি, তাহাদিগের সাম্রাজ্য এবং হিন্দু-ধর্ম্মবিনাশের কথা, ইংরাজ জাতি, তাহাদিগের ভারতআক্রমণ, লণ্ডন নগর এবং নিতান্ত আধুনিকতার পরিচয় স্বরূপ ফিরিঙ্গি শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ সকল তন্ত্র ইংরাজও মুসলমানরাজত্বের সময় বিরচিত। তৃতীয়তঃ তন্ত্র সকল যে নিতান্ত ইদানীন্তন কালের শাস্ত্র, তাহার কারণ এই যে তন্ত্র-বিশেষে অতি অল্পকালপ্রচারিত কোন কোন দেবীপূজার বিধি নিবদ্ধ আছে। বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে, বঙ্গদেশে বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত শ্যামা-পূজা ও জগদ্ধাত্রী-পূজা তন্ত্রানুমোদিত পূজা। এই উভয় পূজাই অতি অল্পকাল হইল বঙ্গভূমিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নবদ্বীপ-নিবাসী আগম বাগীশ নামক জনৈক অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের দ্বারা শ্যামা-পূজা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রীপূজা প্রচলিত করেন। ইঁহাদের পূর্ব্বে এই দুই পূজা বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এই দুই দেবী-পূজা ইদানীন্তন সময়ে বঙ্গসমাজে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। যাহা হউক এই দুই ব্যক্তি যে এই দেবীদ্বয়ের নবারাধনা প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার দৃঢ়তা ও চিরস্থিতি সাধনের নিমিত্তও তাহাদিগের মহিমা ও প্রাধান্য সংস্থাপন উদ্দেশে অনেক স্তুতিকর বচনাবলী রচনা করিয়া তন্ত্রের কলেবর পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চতুর্থতঃ আর একটী কারণের দ্বারা তন্ত্রশাস্ত্রের আধুনিকত্ব প্রমাণিত হয়। সেটী এই যে তন্ত্রের প্রভুত্ব এবং প্রাধান্য বঙ্গদেশে যে পরিমাণে প্রচলিত, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সে পরিমাণে প্রচলিত নয়; এমন কি কোন কোন স্থানে তন্ত্রের কিছুমাত্র প্রাধান্য নাই। আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি, যে সকল গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন, সে সকল গ্রন্থের প্রভুত্ব ভারতের সকল প্রদেশে সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা দেখাইতেছি যে নবদ্বীপের স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যসঙ্কলিত অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব নামক স্মৃতি গ্রন্থ, যাহার বিধি ব্যবস্থা অনুসারে বঙ্গীয় সমাজের শ্রাদ্ধ উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি সকল ক্রিয়া-কলাপ নির্ব্বাহিত হয়, সেই অষ্টাবিংশতি-তত্ত্বের মত ও অনুসাশন উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের নানা খণ্ডে অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে অপ্রচলিত রহিয়াছে। আজিও পূর্ব্বোক্ত প্রদেশবাসী লোকদিগের সামাজিক অনুষ্ঠান সকল প্রাচীন স্মৃতি মনুসংহিতানুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থা-বাণী সকল বঙ্গদেশের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ; হিন্দু সমাজের এক সামান্যাংশেই পরিগৃহীত; আজিও তাহা হিন্দুসমাজের বিশালতর খণ্ডে অধিকার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। নব্যতর কালের বিরচিত শাস্ত্র সকলকে ভারতের সকল খণ্ডের লোক গ্রহণ করেন নাই, সেই জন্য তন্ত্রের প্রভুত্বশক্তি বঙ্গসমাজমধ্যেই

পরিব্যাপ্ত। যাহা হউক এখন বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইল যে, তন্ত্র সকল অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন সময়ের গ্রন্থ। সমগ্র তন্ত্রই যে আধুনিক কালের সঙ্কলিত তাহা নয়। যাবতীয় তন্ত্রই যখন কোন এক বিশেষ নির্দ্দিষ্টকালে প্রবর্ত্তিত হয় নাই, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন সমগ্রাংশকেই কিরূপে অপ্রাচীন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে? তন্ত্রের কোন কোন খণ্ডকে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সময়ের সঙ্কলিত বলিয়া বোধ হয়। এখন বিচার্য্য এই যে তন্ত্রশাস্ত্রের রচয়িতা কে? বেদ সম্বন্ধে যেমন চিরপ্রবাদবাক্য আছে যে,সকল বেদই প্রজাপতি ব্রহ্মার মুখপ্রসূত, পুরাণের বিষয়েও যেমন চিরপ্রচলিত কিম্বদন্তী আছে যে সমগ্র পুরাণসংহিতাই মুনিপুঙ্গব ব্যাসের বিরচিত,তন্ত্র সম্বন্ধেও সেইরূপ এক পরম্পরাগত প্রবাদ আছে যে, সকল তন্ত্রই পার্ব্বতীপতি মহাদেবের সঙ্কলিত। তন্ত্রোক্তি সকল শিবোক্তি ভিন্ন কিছুই নহে, এ কথাতে বঙ্গদেশের দৃঢ় বিশ্বাস। তন্ত্রের মধ্যে অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিব পার্ব্বতীকে "হে দেবি! হে মহেশ্বরি!" ইত্যাদি কথা সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন; ইহাতে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, তন্ত্র সকল মহাদেব ও পার্ব্বতীর কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। লোকপতি ব্রহ্মার বিরচিত বলিয়া বেদচতুষ্টয় যেমন একেবারেই ভ্রমপ্রমাদশূন্য অভ্রান্ত, বেদের সকল কথাই ধ্রুব এবং সত্য, সেইরূপ তন্ত্রোল্লিখিত বিষয় সকলও শিববাক্য বলিয়া একেবারেই ভ্রমবিরহিত। বেদবাক্যের প্রতি অবমাননাতে যেরূপ ব্রহ্মার অবমাননা, তন্ত্রোক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবমাননাতে ও সেইরূপ মহাদেবের অবমাননা। তন্ত্রকে বেদের সহিত তুল্য পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তন্ত্রকারগণ যে অসামান্য চতুরতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তন্ত্র সকল যে শিবোক্তি নয়, তন্ত্রই তাহার মুখ্য প্রমাণ;—কারণ মনোনিবেশের সহিত পাঠ করিলে, বিষয় বিশেষের উপর তন্ত্রের বিভিন্ন স্থলে যেরূপ বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কখনই বোধহয় না যে,ঐ সকল এক ব্যক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত। ব্যক্তিবিশেষের মত কোন বিষয় বিশেষের উপর ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যক্ত করা যদ্যপি যুক্তি ও মানবপ্রকৃতির একান্ত বিরুদ্ধ ব্যাপার হয়, তবে তন্ত্রকেও ব্যক্তিবিশেষের বিরচিত বলিয়া ঘোষণা করাতে যে সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ করা হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মানবচিত্তের চিন্তা এবং বিচারশক্তির গতিই এই প্রকার যে, তাহা বিষয় বিশেষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও বিধি নিষেধের পক্ষে কখন ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত ও ব্যবস্থা ব্যক্ত করিতে পারে না। যাহা হউক এবিষয়ে আমরা আর সময়ক্ষেপ না করিয়া পাঠক মাত্রকেই অনুরোধ করি যে,তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে আয়াস ও শ্রমস্বীকার পূর্ব্বক মনোনিবেশের সহিত তন্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া দেখিবেন যে, আমাদের সহিত কখনই তাঁহাদের মতের বিরোধ উপস্থিত হইবে না। এই অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন গ্রন্থমালা যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রুচিও প্রকৃতিসম্পন্ন পণ্ডিত মণ্ডলীর ভাব, চিন্তা এবং কল্পনাপ্রসূত পদাবলীতে পূর্ণ

হইয়া অবশেষে তন্ত্র নামে অভিধেয় হইয়াছে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

তন্ত্রের প্রতি নেত্রপাত করিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তন্ত্রকার পণ্ডিতগণ যেন অনেক স্থলে বেদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন। বৈদিক সন্ধ্যা ও বেদবর্ণিত গায়ত্রীই আবহমান কাল হিন্দু সমাজে প্রচলিত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তন্ত্রকারগণ বেদোক্ত সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর পরিবর্ত্তে, আর এক প্রকার অভিনব সন্ধ্যা ও গায়ত্রীর সৃজন করিয়াছেন। বেদের সহিত প্রতিযোগিতা বা সমবায়িতা সাধনই যে এই অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তনের মূল তাহাতে আর সন্দেহ কি? অধিক কি, বেদশাস্ত্রের প্রাধান্য এবং প্রভুত্বশক্তিকে পর্য্যুদস্ত ও বিলুপ্ত করিবার জন্যই যে এক প্রকার তন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা বলিলেও আমাদিগকে অত্যুক্তিবাদজনিত দোষে দূষিত হইতে হয় না। তন্ত্রের সাধনপ্রণালী, ধর্ম্মপ্রণালী, নীতি ও ব্যবস্থা সকলের সহিত বৈদিক ধর্ম্মপ্রণালী ও ব্যবস্থার যে কিছু মাত্র সামঞ্জস্য আছে, তাহা বোধ হয় না। মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্ম্মসংস্করণব্রতে ব্যাপৃত হইয়া অনেক স্থলে বলিয়াছেন যে "বঙ্গদেশে বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ প্রায় বঙ্গসমাজে দেখা যায় না, সকলেই তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ লইয়া ব্যস্ত।" বাস্তবিক তৎকালে বঙ্গসমাজে বেদের প্রভুত্ব একেবারেই তিরোহিত হইয়াছিল। কেবল সে সময়ে কেন? তন্ত্রের প্রবর্ত্তনাবধিই এদেশে বেদাধ্যয়ন ও বেদানুশীলন ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। এরূপও বলা যায় যে, তন্ত্রকারগণ বেদের মহিমা ও প্রাধান্যকে খর্ব্ব করিয়া সেই আসনে তন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বেদের সহিত প্রতিযোগিতা সাধন করিয়া বেদপ্রভাব পরাহত করা যে তন্ত্র সৃষ্টির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং তন্ত্র সকলকে শিবোক্তি বলিয়া বর্ণনা ও ঘোষণা করা যে এই উদ্দেশ্য সাধনের একটি অন্যতর উপায় তাহাও আমরা এখন সহজেই বুঝিতে পারিতেছি।

বৈদিক ব্রাহ্মণ বিভাগের মধ্যে পৌরহিত্যপদের যেরূপ প্রবল প্রতাপ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্ত্রের মধ্যেও সেইরূপ গুরুপদবীর অযথোচিত প্রাধান্য লক্ষিত হয়। কুলার্ণব তন্ত্রের কয়েকস্থল উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠকবর্গের নিকট তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

দেবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।

অর্থাৎ—দেবতা রুষ্ট হইলে গুরু পরিত্রাণ করেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে আর কেহ পরিত্রাতা নাই।

গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্য দেবতাঃ।
প্রযাতি নরকং ঘোরং সা পূজা বিফলা ভবেৎ॥

অর্থাৎ—গুরু সন্নিকটে থাকিতে যে ব্যক্তি অন্য দেবতার পূজা করে, সে ঘোর নরকে গমন করে এবং সে পূজা বিফল হয়।

গুরৌ মনুষ্যবুদ্ধিন্তু কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ।

অর্থাৎ—যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য বলিয়া বোধ করে সে নরকে গমন করে। এই সকল উক্তিদ্বারা সুস্পষ্টরূপে বোধ হইতেছে যে,তান্ত্রিক সময়ে গুরুপদের

প্রভুত্ব সীমা ও পরিমাণ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ-সমাজে গুরুবাদ যে প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে, তাহার ফল এই সকল তন্ত্রোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্রাদি সকল জাতির মধ্যেই যে গুরুদীক্ষা-প্রথা প্রচলিত আছে, ইহা হিন্দু সমাজের চিরাগত প্রথা নয়। তন্ত্রোল্লিখিত গুরুবাদ অবলম্বনেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। তন্ত্রের মধ্যে কতক গুলি বীজ মন্ত্র আছে, গুরুগণ শিক্ষার্থিদিগের কর্ণে তাহার এক একটী প্রদান করিয়া দিয়া কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। সে সকল মন্ত্র কিছুই নহে, অনুস্বার বা চন্দ্রবিন্দুযুক্ত এক একটী অক্ষর মাত্র। সে সকল অক্ষর বিশেষের মধ্যে এমন কি বা শক্তি নিহিত আছে যে, মানুষ তাহার চিন্তনে মুক্তিরূপ পরমপদের অধিকারী হইতে পারে? দীক্ষা বিনা মানবের পশুত্ব বিমোচন হয় না, গুরু মনুষ্য নন, মনুষ্যদেহধারী হইয়াও তিনি দেবতা, গুরুপদপরিচারণাতেই মুক্তি, তিনি ইহপারলৌকিক সকল সদ্গতির এক মাত্র নেতা, ইত্যাকার মানবাত্মার মহত্ত্ববিনাশক এবং ধর্ম্মপথের ঘোর অন্তরায়স্বরূপ বাক্যাবলী তন্ত্র শাস্ত্রের প্রভুত্বেই বঙ্গভূমির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্ত্র সকল এক দিকে যেমন গুরু-পদের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে মানবাত্মাকে সংযত করিয়া তাহার উন্নতি ও বিকাশের পথ রোধ করিয়াছে, অপর দিকে সেই রূপ এক প্রকার কুসংস্কার ও ভ্রান্তিপ্রমাদপূর্ণ নিকৃষ্ট ধর্ম্ম প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া এদেশীয় লোকের আত্মার শ্রী ও সৌন্দর্য্যকে কলুষিত করিয়া দিয়াছে। মনুষ্যকে ধর্ম্মের নামে, নিষ্কলঙ্ক পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের নামে, বিবিধ প্রকার জুগুপ্সিত পাপমূর্ত্তির পরিচারণা করিতে, ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গস্বরূপ মৈত্রী ও প্রেমের পরিবর্ত্তে লোকহিংসা ও অচিন্তনীয় জিঘাংসাবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে, স্বর্গীয় পবিত্রতার নামে নানা প্রকার কদাচার ও পাপাচারের পোষণ করিতে, চিত্তশুদ্ধি ও অন্তরের সুনির্ম্মলা শান্তির নামে উন্মাদকর গরলরাশি পান করাইয়া বিভ্রান্ত, উচ্ছৃঙ্খল এবং উন্মত্তবৎ হইতে একমাত্র তন্ত্রই শিক্ষা দান করে। এরূপ লোকানর্থকর শাস্ত্রের প্রভুত্ব লোকসমাজ হইতে যতই অন্তর্হিত হইয়া যায়, ততই মঙ্গল। যাহা হউক ধর্ম্মপথের এবম্বিধ বিঘ্নকর মত সকলের সমর্থন করিয়াও তন্ত্রকারগণ হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্যকে অঙ্কিত করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। যে ব্রহ্মজ্ঞানের আভা বৈদিক কালের ছন্দোবিভাগ হইতে অল্পে অল্পে উন্মেষিত হওত উপনিষদের মধ্যে অধিক উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এবং যাহার তেজ পুরাণপ্রতিষ্ঠিত দেবাড়ম্বরের মধ্যেও চতুর্দ্দিকে প্রতিভাসিত হইয়া পড়িয়াছে, সেই ব্রহ্মোজ্ঞানের আলোক তন্ত্রের মধ্যে ও স্থানে স্থানে বিকীর্ণ হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা মহানির্ব্বাণকর্ত্তা ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মোপাসনাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ভূরি ভূরি স্থলে ব্রহ্মজ্ঞানকেই মুক্তির অদ্বিতীয় কারণ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা সে সকল স্থল উদ্ধৃত করিয়া আর প্রস্তাববাহুল্য করিতে চাহি না; ইচ্ছা করিলে পাঠকগণ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিতে পারেন। তবে এ স্থলে আমরা একটী শ্লোক

মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি। মহানির্ব্বাণে উক্ত হইয়াছে—

বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপ নামাদি কল্পনাং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠ যঃ স মুক্তোনাত্র সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ—রূপনামাদি কল্পনাকে বালকের ক্রীড়াবৎ জানিয়া মনুষ্য সৎ স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা মুক্ত হয়েন, তাহাতে আর সংশয় নাই। এখন আমরা দেখিলাম, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, এবং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপ্রয়োজক স্মৃতি শাস্ত্রের মধ্যে অবিসম্বাদিত রূপে ব্রহ্মজ্ঞানের মহিমা এবং শ্রেষ্ঠত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শাক্যসিংহের পুর-নিষ্ক্রম।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, ভগবান্ শাক্যসিংহের তাদৃশ দৃঢ় নিশ্চয় দেখিয়া বিমানবাসী দেবগণ হর্ষে পুষ্পবৃষ্টি ও আনন্দ-নিনাদ করিয়াছিলেন এবং নিম্ন লিখিত গাঁথা গান করিয়াছিলেন।

"নরজ্যতে পুরুষবরস্য মানসং
নভো যথা তম রজ ধূমকেতুভিঃ।
ন লিপ্যতে বিষয় সুখেষু নির্ম্মল
জলে যথা নবনলিনং সমুদ্ভবম॥"

[এই শ্রেষ্ট পুরুষের মন কিছুতেই অনুরক্ত নহে, সংসক্ত নহে। তমঃ বা অন্ধকার, রজঃ বা ধূলি, এবং ধূমকেতু প্রভৃতি আকাশে দৃশ্য হয়, অথচ আকাশে সংসক্ত হয় না। ভগবান্ শাক্যসিংহের চিত্তও তদ্রূপ। যেহেতু ইনি বিষয়সুখে লিপ্ত হন না, পূর্ণ নির্ম্মল, সেই হেতু জলে যেমন নবনলিন উদ্গত হয়, অথচ তাহা জলে অলিপ্ত, আমাদের এই ভগবানেরও চিত্ত সেইরূপ বিষয়ে সঞ্চারিত হয়, অথচ তাহাতে অলিপ্ত]

সেই ভীষণ অর্দ্ধরাত্র সময়ে কপিলবস্তু মহানগর মহা প্রস্বাপনে অভিভূত। জীব মাত্রেই নিদ্রিত ও হতচেতন, কেবল মাত্র ভগবান্ শাক্যসিংহ ও ছন্দক জাগরিত। ছন্দক অনেক রোদন করিলেন, অনুনয় বিনয় করিলেন, কিছুতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভগবানের মনঃ প্রতিনিবৃত্ত হইল না। ছন্দক একান্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন, ভগবানও পুনঃ পুনঃ "অশ্ব দাও" বলিয়া উত্তেজনা করিতেছেন। সমস্ত নগর সুপ্ত, মহা প্রস্বাপনে অভিভূত। অর্দ্ধ রাত্র পরিপূর্ণ হইল, চন্দ্র নির্ম্মল আকাশে পুষ্যানক্ষত্রের সহিত উদিত হইলেন, পুরনিষ্ক্রমের শুভক্ষণ বা শুভ সময় আগত হইল, তাহা দেখিয়া ভগবান শাক্যসিংহ রোরুয়মান ছন্দককে পুনরপি বলিতে লাগিলেন;—

"ছন্দক! আর কেন দুঃখ দাও? আর কেন বিলম্ব কর? শীঘ্র আমায় একটী সজ্জিত অশ্ব দাও—বিলম্ব করিও না।" শুনিয়া ছন্দক পুনর্ব্বার বলিলেন,—

আর্য্যপুত্র! আপনি কালজ্ঞ—কোন্ কালে কি করিতে হয় তাহা উত্তমরূপ জানেন,—আপনি সময়জ্ঞ—কোন্ সময়ে

কি কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষরূপ জানেন,—আপনি সর্ব্বজ্ঞ—কোন্ সময়ে কি নিয়মে কি করিতে হয়, তাহাও জানেন। আমিও দেখিতেছি, এই কাল আপনার গমনের উপযুক্ত নহে; তবে কেন আপনি বার বার আমাকে আদেশ করিতেছেন? বোধিসত্ব বলিলেন, "ছন্দক! ইহাই আমার সেই কাল—সেই শুভক্ষণ—অকাল বা অসময় নহে।"

ছন্দক বলিলেন, দেব! ইহা কোন্ বিষয়ের কাল? বুদ্ধদেব বলিলেন" ছন্দক!

"যন্ময়া প্রার্থিতু দীর্ঘ রাত্রং সত্ত্বত্রাণার্থং
পরিমার্গ তাহি।
অবাপ্য বোধিমজরামরং পদং মোচেক্ষ-
গত্তসা ক্ষণা উপস্থিতঃ॥

আমি যাহা জীব পরিত্রাণের জন্য বহু কাল অন্বেষণ করিতেছি, প্রার্থনা করিতেছি, হে ছন্দক! সেই অজর অমর বুদ্ধ পদ লাভ করিয়া জগৎ ত্রাণ করিবার উপযুক্ত শুভক্ষণ এত দিন পরে অদ্য উপস্থিত হইয়াছে। আর বিলম্ব করিও না, খেদ করিও না, বাধা দিও না; শীঘ্র আমায় একটী সজ্জিত অশ্ব দাও।

"শ্রুত্বা ছন্দক অশ্রুপূর্ণ নয়ন ত্বং স্বামিন-
মব্রবীৎ,
ক ত্বং যাস্যসি সত্ত্ব সারথিবর! কি মশ্ব
কার্য্যঞ্চতে?
দ্বারাস্তে পিহিতা দৃঢ়ার্গল কৃতাঃ কো
দাস্যতে আনৃতব?"

শুনিয়া ছন্দক রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আপনি কোথায় যাইবেন? অশ্ব লইয়া কি করিবেন? সমস্ত দ্বার পিহিত—আবদ্ধ—কে আপনাকে তাহা খুলিয়া দিবে? এই কথা বলিবা মাত্র—

"শক্রেণ মনসাথ চেতনবশাৎ তে দ্বার মুক্তাঃ
কৃতাঃ।"

ইন্দ্র কর্ত্তৃক সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত হইল, ছন্দক দেখিলেন, সমস্ত-দ্বার উন্মুক্ত।

"দৃষ্ট্বা ছন্দক হর্ষিতঃ পুন দুখী অশ্রূণি
সোহবর্ত্তয়া।"

দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া ছন্দক হৃষ্ট হইলেন, পরক্ষণেই আবার দুঃখিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে অজস্র অশ্রু নির্গলিত হইল।

"দেবাঃ কোটি সহস্র হৃষ্ট মনসঃ স্তং ছন্দকম-
ব্রুবন্।
সাধু ছন্দক! দেহি কণ্টকবরং মা খেদয়ো
নায়কম্।"

ঐ সময়ে আকাশবাণী হইল, অন্তরীক্ষচর দেবগণ হৃষ্ট চিত্তে ছন্দককে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, ছন্দক! শীঘ্র অশ্ব দাও—প্রভুকে দুঃখ দিও না।

বোধিসত্ব বলিলেন, ছন্দক! ঐ দেখ, আকাশে স্বর্গীয় জ্যোতির শোভা দেখ। ঐ দেখ, শচিপতি ইন্দ্র তোমার দ্বারদেশে উপস্থিত।

ছন্দক তখন অদৃশ্যময় দেবগণের তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, সুজাত নামক একটী সজ্জিত অশ্ব আনিয়া দিলেন। রোদন করিতে করিতে বলিলেন, প্রভো! এই অশ্ব, গ্রহণ করুন, আপনার অভীষ্ট নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধ হউক।

আরূঢ়ঃ শশিপূর্ণমণ্ডলনিভং তমশ্বরাজো-
ত্তমম্,
মালা পাণি বিশুদ্ধ পদ্ম বিমলা নাসাঞ্চ
অশ্বোত্তমে,

* * * * *

খেদ, দৈন্য, ভয়, শঙ্কা, মায়া, মমতা, কিছু মাত্র পরিলক্ষিত হইল না, কিছুতেই

তিনি ব্যথিত বা কাতর হইলেন না, অনায়াসেই প্রফুল্ল চিত্তে অশ্বোপরি আরোহণ করিলেন। সেই পূর্ণচন্দ্রপ্রভু অশ্বরাজের পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিলেন।

কথিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহের গমনকালে ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাঁহার পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার গন্তব্য পথে পুষ্পবর্ষণ হইয়াছিল, দিব্য বাদিত্র বাদিত হইয়াছিল, দেবগণ ও অসুরগণ তাঁহার স্তুতি পাঠ করিয়াছিল। এই ভয়াবহ ব্যাপার সেই অর্দ্ধ রাত্র সময়ে সংঘটিত হইল, ছন্দক ভিন্ন অন্য কেহ জানিল না। শাক্যপুরের পুর দেবতা (রাজলক্ষ্মী) মূর্ত্তিমতী হইয়া এই মহাপুরুষের নেত্রপথে উদিত হইয়াছিলেন, তিনিও রোরুদ্যমানা হইয়া করুণ বিলাপ করিয়াছিলেন,* কিছুতেই এই মহাপুরুষের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিথিল হয় নাই। রোরুদ্যমান ছন্দক পশ্চাতে তিনি অগ্রে। ছন্দক পাদচারে, তিনি অশ্ব-পৃষ্ঠে। সমস্ত নগর মহা প্রস্বাপনে অচেতন, সুতরাং তিনি নির্ব্বিঘ্নে ও বিনা বাধায় স্বভবন হইতে ঐরূপ বিধানে বহির্গত হইয়াছিলেন। বহির্গত হইয়া একবার তিনি রাজভবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এবং নিম্ন লিখিত প্রকার প্রতিজ্ঞা ও সম্ভাষণ করিয়াছিলেন।

"ব্যবলোক্য চৈব ভবনং মতিমান্
মধুরস্বরোগির মুদীরিতবান্।
নাহং প্রবেক্ষি কপিলস্য পুরং
অপ্রাপ্য জাতি মরণান্তকরম্॥
স্থানাসনং শয়ন চংক্রমনং
ন করিষ্যেহং কপিলবস্তু মুখং
যাবন্ন লব্ধং বরবোধি ময়া
অজরামরং পদবরং হ্যমৃতম্॥"

রাজ্যসুখের প্রলোভন, স্ত্রী পুত্রাদির স্নেহ, ইন্দ্রিয় সেবার সুখ, এ সমস্তই তিনি মনোবলে পরাভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্ব দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে চলিল, ছন্দক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতপদসঞ্চারে চলিলেন। ক্রমে রাজধানীর সীমা অতিক্রান্ত হইল, ক্রমে নগরসীমা ও রাজ্যসীমা পশ্চাৎ পাতিত হইল, তথাপি রাত্রের শেষ হইল না। অশ্বও অবিশ্রান্ত পদচালনা করিতেছে, ছন্দকও তৎসমবেগে পদচালনা করিতেছেন। ক্রমে তাঁহারা স্বরাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া কোড্য দেশে পদার্পণ করিলেন; ক্রমে কোড্যদেশ অতিক্রান্ত হইল; সম্মুখে মল্লদেশ। অচিরাৎ তাহাও অতিক্রম করিলেন। যখন তাঁহারা মল্লদেশ অতিক্রম করিয়া মৈনেয় দেশের বেণুবনসমীপে আগমন করিলেন, তখন তাঁহাদের রাত্রি প্রভাত হইল। ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, এই স্থান কপিলবস্তু নগর হইতে ৬ যোজন দূর।*

রাত্রি প্রভাত হইল, ভগবান বুদ্ধ এই সময়ে অশ্বপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া মৃত্তিকোপরি উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ছন্দককে বলিলেন, ছন্দক! তুমি এই অশ্ব ও

* এ সকল কথার ললিতবিস্তর গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে, অনাবশ্যকবোধে পরিত্যক্ত হইল।

* ৪ ক্রোশে এক যোজন; ৬ যোজনে ২৪ ক্রোশ। কোন লেখক লিখিয়াছেন, ৪৫ ক্রোশ দূরে অনোমা নদীর তীরে তাঁহাদের রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল। আন্দাজী বা অমূলক কথা কতদূর আদরনীয়, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

আভরণ গ্রহণ কর এবং গৃহে গমন কর। এই বলিয়া একে একে সমুদায় আভরণ উন্মোচন করিলেন এবং ছন্দকের হস্তে অর্পণ করিলেন। ছন্দক অনেক রোদন করিল, অনুনয় করিল, অনুরোধ করিল, প্রার্থনা করিল, বিনয় বচন বলিল, কিন্তু প্রভু বুদ্ধ সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন—

ছন্দো গৃহীত্ব কপিলপুরং প্রয়াহি
মাতাপিতৃনাং মম বচনেন পৃচ্ছেঃ
গতঃ কুমারো নচ পুনঃ শোচিথাঃ
বুদ্ধিত্ব বোধি পুনরহ মাগমিষ্যে
ধর্ম্মং শুনিত্ব ভবিষ্যথ শান্তচিত্তাঃ।

ছন্দক! তুমি এই অশ্ব ও এই আভরণ লইয়া কপিলপুরে যাও, আমার পিতা মাতা যাহাতে শোকসন্তপ্ত না হন, তাহা করিও, বলিও। কুমার গিয়াছে বলিয়া আপনারা শোক করিবেন না, কুমার বোধি অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান জাত হইয়া পুনর্ব্বার আসিবেন এবং ধর্ম্ম শুনিয়া তখন আপনারা শান্তচিত্ত হইবেন, সুখী হইবেন।

ছন্দক আবার কাঁদিল, আবার বলিল,—

"নমেহস্তি শক্তি বলপরাক্রমো বা
হনেয়ু মহ্য নরবর জ্ঞাতি সংঘাঃ
ছন্দা=ক নীতো গুণধর বোধিসত্বঃ?

* * * *

ছন্দক কাঁদিয়া বলিল, প্রভো! আমার শক্তি নাই, নিঃশক্তি হইয়াছি, বল নাই—দুর্ব্বল হইয়াছি, পরাক্রম নাই—নিস্তেজ হইয়াছি। হে প্রভো! রাজপরিবারগণ, রাজার জ্ঞাতিগণ, শাক্যগণ, আমাকে প্রহার করিবে আর বলিবে, "তুই গুণধরকে কোথায় লইয়া গিয়াছিলি? এবং কোথায় রাখিয়া আইলি?"

বোধিসত্ব বলিলেন, ভয় কি? ভীত হইও না, আমি বলিতেছি, তোমাকে কেহ মারিবে না।

"তুষ্টা ভবিত্ব অপি মম জ্ঞাতি সংঘাঃ।"
"প্রেমেণ মহ্যং ত্বয়ি নো বিবর্ত্তিষ্টন্তে।"

আমার জ্ঞাতিগণ—রাজা ও রাজপুরুষগণ—কেহ তোমাকে মারিবে না, কটু বলিবে না—কোপ করিবে না, সকলেই তুষ্ট হইবে। আমার প্রেমে তাহারা সকলেই তোমাকে আদর করিবে।

ছন্দক আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল। বার বার প্রভু-আজ্ঞা অবহেলা অসঙ্গত ভাবিয়া ছন্দক অগত্যা রোদনসহকারে প্রদত্ত আভরণাদি গ্রহণ করিল, অতি কষ্টে শাক্যপুর গমনে সম্মত হইল।

ললিত বিস্তর নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, ছন্দক যে স্থান হইতে ফিরিয়াছিল, সেই স্থানে এক চৈত্য (স্মারক স্তম্ভ বা বৃক্ষ) স্থাপিত হইয়াছিল। সেই চৈত্য অদ্যাপি বিদ্যমান আছে * এবং লোকে তাহাকে ছন্দক নিবর্ত্তন নামে খ্যাত করিয়াছে।

ছন্দক কিয়দ্দূর গমন করিলে পর সিদ্ধার্থ মনে মনে বিচার করিলেন, সন্ন্যাসী হইলাম অথচ চূড়া (সুদীর্ঘ কেশ পাশ) থাকিল, ইহা কি প্রকার হইবে? ভাবিয়া তিনি এক খড়্গের (১) দ্বারা ভ্রমরকৃষ্ণ সুদীর্ঘ কেশ ছেদন করিয়া অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ করিলেন।

বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ বুদ্ধদেব কেশ পাশ ছেদন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে, দেবগণ তাহা পূজার নিমিত্ত গ্রহণ

*ললিতবিস্তর লেখকের সময় পর্য্যন্ত ছিল, কিন্তু এখন আছে কিনা তাহা আমরা জানিনা।

(১) খড়্গ কোথায় ছিল, তাহা লিখিত নাই।

করিয়াছিলেন এবং সেই চূড়াচ্ছেদস্থানে চৈত্য স্থাপিত হইবায়, সে চৈত্য চূড়াপ্রতিগ্রহণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শরীর নিরলঙ্কার ও মস্তক কেশবিহীন হইল, তথাপি সিদ্ধার্থের মন পরিতুষ্ট হইল না। তিনি স্বপরিধেয় কৌষিক বা কাশিক বস্ত্রের (১) প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এবস্ত্র সন্ন্যাসীদের বস্ত্র নহে। যদি বনবাসের উপযুক্ত কাষায় বস্ত্র পাই, তাহা হইলেই ভাল হয়। এই সময়ে এক ব্যাধ তাঁহার সম্মুখে কাষায় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সমাগত হইল। তাহা দেখিয়া ভগবান্ বোধিসত্ব হৃষ্ট চিত্তে ব্যাধকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, মহাশয়! আপনি যদি আমাকে আপনার পরিহিত বস্ত্র দেন, তাহা হইলে আমি এই কৌষিক বস্ত্র আপনাকে দেই (২)। ব্যাধ বলিল, হাঁ—এই বস্ত্রই আপনার শোভনীয় এবং ঐ বস্ত্রই আমার শোভনীয়। বুদ্ধদেব বলিলেন, সেই জন্যই উহা আমি যাচ্ঞা করিতেছি।

ব্যাধ তন্মুহূর্ত্তে আপনার পরিহিত কাষায় বস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক বুদ্ধদেবকে প্রদান করিল, বুদ্ধদেবও আপনার কৌষিক বস্ত্র ব্যাধকে প্রদান করিলেন।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, এই ব্যাধ প্রকৃত ব্যাধ নহে, ইনি এক দেবপুত্র। ব্যাধরূপী দেবপুত্র ভগবানের প্রদত্ত বস্ত্র মস্তকে ধারণপূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিল, ছন্দক ইহা নাকি দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিল। এই বস্ত্রপরিবর্ত্তনের স্থানেও এক উচ্চতর চৈত্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই চৈত্য অদ্যাপি কাষায়গ্রহণ নামে খ্যাত আছে।

এইরূপে ভগবান্ বুদ্ধদেব রাজ্য, রাজভোগ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, দাস, দাসী, সকল পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া অশোক ও অমৃতপদ অন্বেষণার্থ সন্ন্যাসবেশ ধারণ করিলেন। তাঁহার অনুচর ছন্দক দূর হইতে প্রভুর তাদৃশ বেশ সন্দর্শন করিয়া যারপর নাই ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া অবিরল ধারে রোদন করিতে করিতে কপিলবস্তু নগরে গমন করিল। কণ্টকনামা তাঁহার অশ্ব প্রভুবিরহে কাতর হইয়া স্খলিতপদে রোদন করিতে করিতে অতি কষ্টে ছন্দকের অনুগামী হইল।

শ্রীরামদাস সেন।

(১) কাশিক=কাশি দেশজাত। কৌষিক=রেশমী কাপড়।

(২) বৌদ্ধেরা বলে, এই ব্যাধ প্রকৃত ব্যাধ নহে, কোন দেবতা ঐরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া ব্যাধ বেশে দেখা দিয়াছিল।

পালরাজগণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মহারাজ নয় পালের * শাসনকালে সোম নামক জনৈক সামান্য ভূম্যধিকারী গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দিরের অনতিদূরে হরিহর মূর্ত্তি স্থাপনার্থে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দির-গাত্রে সংযোজিত খোদিত

* জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ নয়পাল "ন্যায়পাল" নামে পরিচিত হইয়াছেন।

লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজ নয়পাল দেবের রাজ্যাভিষেকের ১৫শ বৎসরে এই লিপি খোদিত হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত আছেঃ—

সমস্তভূমণ্ডল রাজ্য ভারমাবিভ্রতি শ্রীনর—
পালদেবে।
বিলিখ্যমানা দশপঞ্চসংখ্য সংবৎসরে সিদ্ধি
মত সাদুকীর্ত্তিঃ॥

নারায়ণ দত্ত নামে এক ব্যক্তি মহারাজ নয়পালদেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। এই নারায়ণের পুত্র চক্রপাণি দত্ত একজন বিখ্যাত বৈদ্য গ্রন্থকার। চক্রপাণি স্বয়ং তাহার গ্রন্থে এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। †

বিহার উপবিভাগ হইতে মহাত্মা ব্রোডলি সাহেব বিগ্রহ পালের নামসংযুক্ত আর একটী প্রস্তরলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা বুদ্ধমূর্ত্তির প্রস্তরসিংহাসনে খোদিত হইয়াছে। যথাঃ

শ্রীমদ্বিগ্রহ পাল দেবস্য রাজ্য সম্বত ১২ মার্গ দিনে ১৫ দে (য় ধর্ম্মা) যং সুবর্ণকার দেহে।*

গৌড়েশ্বর মহীপালের শাসনকালে তাঁহার সভাসদ পণ্ডিত ক্ষেমীশ্বর রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের পৌরাণিক উপন্যাস অবলম্বন করিয়া "চণ্ডকৌশীক" নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

ডাক্তার বারনেল চোলরাজ কুলতুঙ্গার যে তামিল শাসনপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, "এই নরপতি, তাঁহার ২৯ সম্বতে বাঙ্গালা ও সেই দেশাধিপতি মহীপালকে জয় করিয়াছিলেন।" রাজসাহির প্রস্তরফলকে লিখিত আছে, সেন বংশের স্থাপয়িতা বিজয় সেন গৌড় জয় করিয়াছিলেন। এইরূপ কতকগুলি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া "সেনরাজগণ" পুস্তকে দেখান হইয়াছে যে, চোলরাজ কুলতুঙ্গা মহীপালকে জয় করিয়া তাঁহার সেনাপতি বিজয় সেনকে গৌড়ের রাজাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং গৌড়েশ্বর মহীপাল বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হইয়া বিহার প্রদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এই সময় পালদিগের রাজ্য সীমা পশ্চিম দিকে কাশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান কাশীর দুই ক্রোশ উত্তর দিকে বৌদ্ধদিগের যে বারাণসী ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি শরনাথ নামে পরিচিত। এই শরনাথ নগরে গৌড়েশ্বর মহীপাল ও বসন্তপাল এবং তাঁহার ভ্রাতা স্থিরপালের নামাঙ্কিত একখণ্ড প্রস্তরলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহা এইরূপঃ—

মনোবৃদ্ধায়। বারাণসী
সরস্যাং গুরোঃ শ্রীধামরাশি পাদাজং।
আরাধ্য নমিত নৃপতি
শিরোরুহৈঃ শৈবালাকীর্ণং। ১
ভূপাল চিহ্নে ষষ্ঠাদি
কীর্ত্তি রত্ন ধারা নিচয়
গৌড়াধিপ, মহীপালঃ
কাশ্যাং শ্রীমান কারয়ৎ। ২
সহজী কৃত পণ্ডিতৈঃ
বোদ্ধাবার নিবর্ত্তিনৌ

---

† চক্রপাণি লিখিয়াছেন—
গৌড়াধিনাথ রসত্যাধিকারি পাত্র
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়ো দত্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনু প্রথিত লোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্ত্তৃ পদাধিকারী।

টীকাকার শিবদাস সেন বলেন—"গৌড়াধিনাথ—নয়পালদেবঃ তস্য রসবতী মহানাসং তস্যাধিকারী তথা পাত্রমন্তি-মন্ত্রী—ঈদৃশো যো নারায়ণঃ তস্য তনয়ঃ—"

যো ধর্ম্মরক্ষিকান্
সঞ্জান্ ধর্ম্মচক্র পুনর্ব্বযং। ৩
কৃতবন্তৌ চ নবীন
যেষু মহাস্থানে শৈলরাজ কুট্টমং
এনাং শ্রীস্থিরপালো
বসন্তপালানুজ সমানৈঃ। ৪
সম্বৎ ১০৮৩ পৌষ দিনে।

আমগাছির তাম্রশাসনের ষোড়শ পংক্তিতে ও নালন্দার বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারস্থ প্রস্তর লিপিতে মহীপালের নাম খোদিত রহিয়াছে, রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় শরনাথ প্রস্তরলিপিতে অঙ্কিত গৌড়েশ্বর মহীপালকে পূর্ব্বোক্ত মহীপাল হইতে অভিন্ন অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মিত্র মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ আমগাছির শাসানোক্ত মহীপালের পর যে নরপাল ও (তৃতীয়) বিগ্রহপালদেব বাঙ্গলা শাসন করিয়া গিয়াছেন, আমগাছির তাম্রশাসনই তাহার উজ্জ্বল ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আমাদের এইবাক্যকে অপ্রামাণ্য অবধারণ করিবার জন্য কোন প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। আমাদের মতে তৃতীয় বিগ্রহ পালের পর দ্বিতীয় মহীপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহাকে জয় করিয়া চোলরাজ কুলতুঙ্গার সেনাপতি বিজয় সেন বাঙ্গলার রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। নালন্দার বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারস্থ প্রস্তরলিপিতে যে মহীপালের নাম খোদিত রহিয়াছে, ইনি প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় মহীপাল, এবিষয় পশ্চাৎ যথাস্থানে আলোচনা করা যাইবে।

দ্বিতীয় মহীপাল দেবের পর পাল বংশীয় আর ১৮ জন নরপতি ধারাবাহিক রূপে বিহার প্রদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রকাশ করা গেল।* মুসলমানদিগের বিহারবিজয়ের পরেও প্রায় আড়াই শত বৎসর ইঁহারা বিহারের কোন কোন অংশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া ছিলেন। ১৩৬২ শকাব্দের (১৪৪০ খৃঃ অঃ) পর আমরা আর বিহার প্রদেশে পালবংশের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না।

যে সময় বিজয়সেন দেব বাঙ্গলা শাসন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় চন্দ্রদেব নামক এক ব্যক্তি কনোজ নগরে নূতন রাজপাঠ স্থাপন করেন। এই চন্দ্র দেব ও তদ্বংশীয় রাজন্য বর্গ রাজস্থানের ইতিহাসে "রাটোর" বংশ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রাজস্থানের ভট্ট কবিগণ যদিচ ইঁহাদিগকে "রাটোর" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদিগের শাসনপত্রে "রাটোর" শব্দের কোন উল্লেখ নাই। চন্দ্রদেবের বংশধরদিগের প্রদত্ত অনেকগুলি শাসন পত্র আমরা দর্শন করিয়াছি। †

* বারাণসী ও বিহার প্রদেশে পালবংশীয় যে সকল নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের তালিকা।

১। বসন্ত পাল।	১০। নয়ন পাল।
২। স্থির পাল।	১১। সিন্ধু পাল।
৩। মদন পাল।	১২। অভয় দেব।
৪। রাম পাল।	১৩। মল্লদেব।
৫। গোবিন্দ পাল।	১৪। কাশী রাজ।
৬। ভূমি পাল।	১৫। সিংহ দেব।
৭। কুমার পাল।	১৬। ভানু দেব।
৮। লক্ষণ পাল।	১৭। সোমেশ্বর।
৯। চন্দ্র পাল।	১৮। ভৈরবচন্দ্র। (১৩৬২ শকাব্দ)

† শাসনপত্র হইতে এই বংশাবলাটী প্রস্তুত করা হইল।

১। —বিগ্রহ।	৫। গোবিন্দ চন্দ্র
২। মহী—।	৬। বিজয় চন্দ্র।
৩। চন্দ্র দেব।	৭। জয়চন্দ্র।
৪। মদন পাল।	

সেই সকল শাসনপত্রে ইঁহারা "গাহড়বাল" বংশজ বলিয়া লিখিত হইয়াছেন। পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন যে, "ঘরওয়ার" রাজপুতদিগের মৌলিক আখ্যা "গাহড়বাল"। সে যাহাই হউক, এই গাহড়বাল বা ঘরওয়ার বংশজ চন্দ্র দেবের পৌত্র, প্রপৌত্র, প্রভৃতি ভূপতিগণের শাসনপত্রে চন্দ্রদেবের পিতা ও পিতামহের নাম কিরূপ লিখিত হইয়াছে, পাঠকগণ শ্রবণ করুন।

গোবিন্দ চন্দ্রের ১১৬৩ সম্বতের শাসনপত্রে লিখিত আছে

"অভূন্নৃপো গাহড়বালবংশে মহীতলো
নাম জিতারিচক্রঃ।

১১৬৩ সম্বতের গোবিন্দ চন্দ্রের দ্বিতীয় শাসনপত্রে চন্দ্রদেবের পিতা ও বংশের এই রূপ উল্লেখ আছেঃ—

"বংশে গাহড়বালাখ্যে বভূব বিজয়ী নৃপঃ।
মহিআলস্থতঃ শ্রীমান্ নলনাভাগসন্নিভঃ।

গোবিন্দ চন্দ্রের ১১৭৪ সম্বতের শাসনপত্রে তাঁহার পিতা, পিতামহ ও বংশের নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়ঃ—

* * * * *

সাক্ষা) দিবস্বা (নিব ভূরি ধাম্না) নাম্না
(যশোবিগ্র)হ ইত্যুদারঃ॥
তৎসুতোঽভূন্মহীচন্দ্রশ্চন্দ্রধামনিভং নিজম্।

একমাত্র মহারাজ গোবিন্দ চন্দ্রের তিন খানা শাসন পত্র হইতে দুই একটী পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল। পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, চন্দ্রদেবের পিতার নাম কোন্ টীতে "মহীতলো" কোনটীতে "মহীআল" ও কোনটীতে "মহীচন্দ্র" লিখিত হইয়াছে। এবং তাঁহার পিতামহের নামের প্রথমাংশ নষ্ট হওয়ায় পণ্ডিত প্রবর রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় "হ" অঙ্কের সহিত "যশোবিগ্র"যোগ করিয়াছেন। এমত স্থলে আমরা অতর্কিত ভাবে চন্দ্রদেবের পিতামহের নাম "বিগ্রহ" ও তাঁহার পিতার নাম "মহী—" গ্রহণ করিতে পারি। যদি আমরা তৃতীয় বিগ্রহপালদেব হইতে পালবংশের বংশাবলী কনজ রাজবংশাবলীর সহিত যোগ করি, তাহা হইলে নিম্নলিখিতরূপ বংশাবলী প্রস্তুত হইতে পারে।

বিগ্রহপাল।
মহীপাল।
চন্দ্রদেব।
মদন পাল।
গোবিন্দ্র চন্দ্র।
বিজয়চন্দ্র।
জয়চন্দ্র।

ডাক্তার হরেন্‌লি সাহেবও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন।

চন্দ্রদেবের পিতাকে মহীপালের পরিবর্ত্তে যে সকল তাম্রশাসনে মহীতাল বা মহীআল বলিয়া লিখা হইয়াছে, তাহা অবশ্যই ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। শাসনপত্রের লিখক কিম্বা শাসনপত্রের পাঠকর্ত্তাদিগের দ্বারা এই ভ্রম সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। আমাদের মতে পাল গৌড়েশ্বর বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হইলে পাল বংশ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। একশাখা পৈতৃক ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক বিহার প্রদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। (উত্তর কালে তাঁহারাও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।) অন্য শাখা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করত কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করিলেন। সুতরাং বাঙ্গালা হইতে তাড়িত মহারাজ মহীপাল কনোজ ও বিহার রাজ বংশের জনক হইতেছেন।

এই পর্য্যন্ত গৌড়েশ্বর পাল রাজন্য-বর্গের যে সমস্ত তাম্র শাসনপত্র ও প্রস্তরলিপি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সমস্তের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমরা তাহাদের নিম্নলিখিত বংশাবলী প্রস্তুত করিলাম।

বংশাবলী।

১। গোপাল দেব রাজ্ঞী বাগীশ্বরী দেবী।(১)

২। ধর্ম্মপাল— রাজ্ঞীকগ্নাদেবী * — বাক্‌পাল।

৩। দেবপাল দেব। (ধর্ম্মপালের পুত্র) — জয়পাল (বাক্‌পালের পুত্র)

যুবরাজ রাজ্যপাল। (দেবপালের পুত্র) — ৪। বিগ্রহ (সুর) পাল। রাজ্ঞী লজ্জাদেবী। † (জয়পালের পুত্র)

৫। নারায়ণ পাল।

৬। রাজ্যপাল। রাজ্ঞীভাগ্যদেবী। ‡

৭। শ্রীমান—পাল।

৮। বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়)

৯। মহীপাল।

১০। নয়পাল।

১১। বিগ্রহপাল।(তৃতীয়)

১১। মহীপাল। (দ্বিতীয়)

মোগল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল-ফাজেল তাঁহার আইন আকবরী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে গৌড়েশ্বর পাল রাজাগণের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১।	ভূপাল।	রাজ্যকাল	৯৫	বৎসর
২।	বীরপাল।	”	৫৫	”
৩।	দেবপাল।	”	৮৩	”
৪।	ভূপতি পাল।	”	৭০	”
৫	ধনপতি পাল।	”	৪৫	”
৬।	বিজ্ঞান পাল।	”	৭৫	”
৭।	জয়পাল।	”	৯৮	”
৮।	রাজপাল।	”	৯৮	”
৯।	ভোজপাল।	”	৫	”
১০।	জগৎপাল।	”	৭৪	”

তিব্বত দেশীয় গ্রন্থকার তারানাথ প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে পালবংশের যে বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১।	গোপাল।	১০।	সৃষ্টিপাল।
২।	দেবপাল।	১১।	মহাপাল।
৩।	রাসপাল।	১২।	বীরপাল।
৪।	ধর্ম্মপাল।	১৩।	ন্যয়পাল।
৫।	মসুরক্ষিত।	১৪।	অমরপাল।
৬।	বেনপাল।	১৫।	হস্তীপাল।
৭।	মহীপাল।	১৬।	ক্ষান্তিপাল।
৮।	মহাপাল।	১৭।	রামপাল।
৯।	সোমপাল।	১৮।	যক্ষপাল।

আবুল ফাজেল এবং তারানাথ প্রায় সমসাময়িক, বোধ হয় ইহাঁরা দেশ প্রচলিত প্রবাদ কিম্বা অপ্রমাণ্য কোন গ্রন্থ হইতে এই সকল নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল তালিকা সমসাময়িক প্রমাণ তাম্রশাসন ও প্রস্তর লিপির বিরোধী বলিয়া অপ্রামাণ্য বোধে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

(১) বল্লভী অর্থাৎ গুজরাঠের রাজকন্যা।

* রাষ্ট্রকুটাপতি প্রবলের দুহিতা।

† চেদী অর্থাৎ ত্রিপুরার রাজকন্যা।

‡ রাষ্ট্রকুটার রাজকন্যা।

নব্যবঙ্গ।

উপসংহার।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবগুলিতে নব্য বঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের মত ও মনের ভাবগুলি নিতান্ত এ'লো মে'লো ভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, নব্যবঙ্গ নানা বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহারের সংঘর্ষণে, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক বিবিধ বিপ্লবে একটী নূতন এবং জটিল মিশ্র পদার্থ, হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজে, মানব-চরিত্রে, ভাষায়, রুচিতে সর্ব্বত্রই বিমিশ্র ভাব। এই জটিল মিশ্রণ হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া কোন চিত্রই পৃথক্ এবং সুস্পষ্টরূপে আঁকা সহজ নয়। আর এক কথা, নব্যবঙ্গ বলিয়া যে একটা জিনিষ আমরা নির্দ্দেশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি, তাহা এখনও বীজ-গর্ভস্থিত অঙ্কুরের মত অস্ফুট। এই অঙ্কুর দেখিয়া, কেহ বলিতে পারেন, ইহা কালে একটী ছায়াপ্রদ বটবৃক্ষে পরিণত হইবে। কেহ বলিতে পারেন, ইহা হইতে কোন ভাল গাছ হইবে না। কেহ বলিবেন, ইহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে। পৌত্তলিক, অপৌত্তলিক, নিরীশ্বর নানা প্রকার মতই অবাধে দেশে প্রচারিত ও প্রচলিত হইতেছে। ব্রাহ্ম ভাবিতেছেন, বঙ্গ দেশে কালে ব্রাহ্ম ধর্ম্মই দাঁড়াইবে। আবার দলে দলে হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজ-সংস্কারকগন দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাদের কেহ স্বমতানুযায়ী বেদবিহিত ধর্ম্মে, কেহবা স্বকীয় অভিরুচি-সম্মত বৈদান্তিক ধর্ম্মে, কেহবা নূতন ধরণের কৃষ্ণ-প্রেম-পূর্ণ ভাগবত ধর্ম্মে, এইরূপে সকলে যুটিয়া কত কি নূতন নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেশকে আহ্বান করিতেছেন। "থিয়োসফিষ্ট্" সাত সমুদ্র পার হইয়া বঙ্গ-ভূমিতে স্বমতাধিকার বিস্তার-জন্য ব্যগ্র ও আগ্রহান্বিত হইয়া ছুটিয়াছেন। "মুক্তি-সেন" আপনার রণ-ভেরীর শব্দে সর্ব্ব স্থান নিনাদিত করিতে কতই আশার স্বপ্ন দেখিতেছেন। বিবিধ পুরাতন ও নূতন খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আশ্বস্ত চিত্তে বঙ্গের জেলায় জেলায় পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিতেছেন। কত মিল্ এবং কোমত্-শিষ্যগণও বঙ্গদেশকেই অনুশিষ্য করিতে ব্যস্ত। সকলেরই বুক-ভরা আশা, প্রাণ-যোড়া উৎসাহ, উদ্যম। কেন? ইহার উত্তর এই যে, এই জটিল মিশ্রণ হইতে প্রকৃত তত্ত্ব বিশ্লেষ করা সহজ নয়।

ফল কথা এই, আমাদের সমাজটা সম্মুখে রাখিয়া চিন্তা করিতে বসিলে, যেমন অজস্র ধারায় রাশি রাশি অভাব ও নিরাশা উপস্থিত হইয়া মনে অন্ধকার ঢালিয়া দেয়, তেমনই অন্ধকারের মধ্যদিয়া নানা দিক্ হইতে নানা ভাঙ্গা ভাঙ্গা নূতন নূতন আশার এক আধটী কিরণও চক্ষে ভাসিতে থাকে। বস্তুত, সেন এসকল ভাবিতে গেলে, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসি পায়, হাসিতে গেলে, গভীরতর আবেগে বুক ভাঙ্গিয়া কান্না পায়। কি করিলে এই নব অঙ্কুর ফলবান গাছে পরিণত হইবে, কোন্ দিকে ইহার গতি হইবে, কিরূপ বৃক্ষে ইহার পরিণতি দাঁড়াইবে, এসকলই সাতিশয় জটিল মীমাং-

সার কুক্ষিগত সমস্যা। সুতরাং যে যেদিকটার চিন্তা করে, সে সেইদিকেই ইহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এক রকম করিতে চায়। নদী-তীরের কাদা মাটীর মত ইহা ছেলের পুতুল এবং প্রবীণের প্রতিমা গড়াইবার সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছে। আমরা এতক্ষণ এই কাদা লইয়া পুতুল বা প্রতিমা কিছুই গড়াইতে চেষ্টা করি নাই। ইহার প্রকৃতি বর্ণনা করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য আশা নিরাশার সকল কথাই সমভাবে বলিয়াছি। কিন্তু এই কর্দ্দম তুল্য নরমভাব ঘুচিয়া গিয়া যত দিন না ইহার একটা প্রকৃত এবং নির্দ্দিষ্ট আকার হইবে, তত দিন এ জাতিতে অকৃত্রিম বা স্বাভাবিক জাতীয় ভাব ফিরিবে না এবং তৎপূর্ব্বে পৃথিবী ও স্বর্গের চক্ষে আমরা কথনও যথার্থ মানুষ নামের উপযুক্ত হইতে পারিব না।

এখন একটী কথা আপনা হইতেই উপস্থিত হইতেছে। কথাটী এই,একটা নির্দ্দিষ্ট আকার চাওত, আকারের কল্পনা কর। আমরা পূর্ব্বপ্রস্তাবে জন সমাজের আদর্শ ভাব লইয়া অনেক দীর্ঘ বাগ্ বিতণ্ডা করিতে সাধ্য মত্বে বড় ত্রুটী করি নাই। স্থূল কথা এই, মানুষের মন আদর্শ ভুলিতে না পারিলেও, একজন আর একজনের আদর্শ ঠিক করিয়া দিতে পারে না। যথন আমি আমাছাড়া আর একটী মাত্র ব্যক্তিরও আদর্শ ঠিক করিতে অধিকারী নই, তথন একটা বিস্তীর্ণ মানব-সমাজের আদর্শ কি করিয়া ঠিক করিব? সত্য কথা বলিতে গেলে, আমিও আমার সমস্ত জীবনের আদর্শ কোন এক সময়ে ঠিক করিয়া রাখিতে পারি না। স্থল-বিশেষে পলে পলে মনের আদর্শ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মিশিয়া যায়। আবার কথনও কথনও মানুষ কোন কোন বিষয়ে একটীমাত্র আদর্শ অবলম্বন করিয়াই জীবন কাটাইয়া দেয়। মানব-মনের সমস্ত আদর্শই এইরূপ আপেক্ষিক। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতানুসারে মনের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হয়। এই জন্য ব্যক্তি-বিশেষ বা বহু ব্যক্তির কল্পিত আদর্শানুযায়ী সমাজ-গঠন প্রণালীর পক্ষপাতী হইতে পারি না। আমরা জানি, নিয়ম-তন্ত্র প্রণালীর অনুসারে দশজনে যুক্তি পরামর্শ করিয়া একটা সমাজকে নিয়মসূত্রে গাঁথিয়া গড়াইতে পারে না। ভূত এবং বর্ত্তমানের সমস্ত সমাজই একথার প্রমাণ। ভাষা যেমন স্বভাবের মূল নিয়মেই প্রতি মানব-কণ্ঠে ফুটিয়া এক একটা জাতীয় ভাষার সৃষ্টি করে,সামাজিকতাও তেমনই প্রকৃতির অনুগ্রহে প্রতি মানব-হৃদয়ে ফুটিয়া এক একটা জাতির সমাজ গঠন করে। ব্যাকরণ ও বিজ্ঞান যেমন ভাষার পরবর্ত্তী এবং অনুযায়ী,সমাজের বিজ্ঞান এবং স্মৃতি বা আইন কানুনও তদ্রূপই সমাজের পরবর্ত্তী ও অনুযায়ী। আবার প্রতি মানবের প্রকৃতি যেমন উন্নতিশীল অর্থাৎ সামান্য শোনিত শুক্র বিন্দু বা গ্যাষ্ট্রুলা প্রভৃতির অবস্থা হইতে অনন্তকাল-ব্যাপী একটা ক্রম-বিকাশ-শীলতা যেমন মানবমাত্রেরই প্রকৃতিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তেমনই সমাজ উন্নতিশীল এবং সমাজ-প্রকৃতিতেও তেমনই একটা অনন্ত উন্নতির বিকাশ-ভাব রহিয়াছে। সুতরাং যত বড় একটা সমাজই হউক্ না কেন, এবং যত বড় একজন মানুষই তাহার নিয়ম বা ব্যবহার-শাস্ত্রাদি লিখুক্ না কেন, সেই শাস্ত্র কথনই চিরদিনের অবলম্বন হইতে পারে না। তাহা অভ্রান্ত হইলেও, তথন

কার সেই সমাজের জন্যই। কিন্তু চিরকালের এবং সকল অবস্থার জন্য নয়। পরন্তু মানুষ যত বড়ই হউক্, ভ্রান্তিশূন্য হয় না। "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।"

সমাজোন্নতির সাধনা কি? এই কথা-টীই এখন বিচার্য্য। এসম্বন্ধে কতক গুলি উদার এবং সর্ব্বজনীন বিশেষ মূল সূত্র অবলম্বন করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তুসেই সূত্র সকলের উল্লেখের পূর্ব্বে সাধারণত সমাজ যে সকল মূল মন্ত্রকে ভিত্তির স্বরূপ করিয়া তদুপরি দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পুনরালোচনা করা উচিত। সেই মন্ত্র গুলি এই,

১। আমি যে সমাজে রহিয়াছি, তাহা, আমার ধন, মান, ধর্ম্ম এবং জীবন-রক্ষা সম্বন্ধে নিরাপদ স্থান, এই বিশ্বাস।

২। ইহাতে থাকিয়া আমি আমার পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক সর্ব্ব প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারি, এই বিশ্বাস।

৩। সর্ব্ব প্রকার বিপদে, জীবিকা-নির্ব্বাহে ও বিবাহাদি সাংসারিক বিষয়ে এবং সদনুষ্ঠানাদি সাধনে এখানে আমি সাহায্য পাইতে পারি, এই বিশ্বাস।

এই তিনটী এবং আরও একটী মূল মন্ত্র সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। এই চতুর্থ মন্ত্র-টীর কথা আমরা ইহার পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি। কিন্তু সেইটীই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক এবং প্রকৃত মূল-বীজ-মন্ত্র। সে কথা এই, অন্তর্নিহিত একটী আসঙ্গ-লিপ্সা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই মানুষ মানুষের সঙ্গে প্রথম মিশিয়াছে। বাহিক ঘটনাবলী এবং প্রয়োজন মানুষকে, মানুষের সঙ্গে স্থায়ীরূপে একত্র করিয়া রাখিবার একটী উপকরণ হইলেও, প্রধান সাধন নয়। কিন্তু সেই বীজের আকারবিশিষ্ট অস্ফুট আসঙ্গ-লিপ্সা যখন পাত্রের গুণাদিদর্শনে এবং তদতিরিক্তও কোন অবোধ্য, অজ্ঞাত, প্রাকৃতিক, মিলনকারী বিমোহন মন্ত্রে পূর্ণ বিকশিত হইয়া অনুরাগরূপ ধারণ করে, তখন শত হিমাদ্রি বা শত প্রশান্ত সমুদ্র ব্যবধান স্বরূপ হইয়া বাধা দিলেও, মানুষের প্রতি মানুষের প্রাণের টান বিনাশ করিতে পারে না। এই অনুরাগই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন চিরস্থায়ী করিবার প্রধান সাধন। যেমন বিশেষ ব্যক্তিতে বিশেষ ব্যক্তির অনুরাগ সঞ্চার হয়, তেমনই বহু ব্যক্তির সমষ্টিস্বরূপ সমাজেও মানুষের অনুরাগ আকৃষ্ট হয়।

পৃথিবীর সকল মানুষই এক। নীতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রও এক ভাবিতেই উপদেশ দেয়। তবুও যে আমার সমাজ, আমার দেশ বলিয়া,আমরা উন্মত্ত ও মোহিত হই, তাহার কারণ শুধুই অনুরাগ। এই অনুরাগে মানুষ সমাজ বা স্বদেশের জন্য প্রাণ দেয়, কত কি স্বার্থ ত্যাগ করে। কিন্তুএসকল কথাই পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি। যাহা হউক্, সমাজের চতুর্থ ভিত্তিমূল বা মূলবীজমন্ত্র এই সমাজানুরাগ। অতএব এই চারিটী মূলমন্ত্র সমাজ মাত্রেরই ভিত্তি।

এখন সমাজোন্নতির প্রকৃতসাধন পথের কথা বিবেচনা করিবার প্রণালী আরও পরিষ্কৃত হইল। অতঃপর এতৎ-সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত সূত্র কয়টীর কথা উল্লেখ করিতে পারি। তাহা এই,

১। প্রতি মানুষই লোকত এবং ধর্ম্মত আপনার জন্য আপনি দায়ী। অর্থাৎ আপনি ভাল হইলেই, লোকত এবং ধর্ম্মত পরোপকার বল, পৃথিবীর বা সমাজের

উন্নতি সাধন বল, বা আর যাহাই বল, সকলইতাহার পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ হয়। "আপ্ ভালাত জগৎ ভালা"—এই বোধ।

২। এই বোধের মূলে বিশুদ্ধ জ্ঞান, পবিত্রতার প্রতি অগাধ নিষ্ঠা, ভগবানে অটল বিশ্বাস এবং প্রগাঢ় ভক্তি থাকা চাই। এই বোধ।

৩। আমি মানুষ ও ঈশ্বরের নিকটে পুরস্কৃত হইব, এইজন্য পুণ্য করি না। আর দণ্ডভয়েও পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকি না। আমার কার্য্যের নিয়ামক ভগবানে বিশ্বাস ভক্তিজনিত ভিতরের উচ্ছ্বাস। অর্থাৎ আমি তাঁহাকে ভালবাসি, আমি তাঁহার ছায়া, আমার কার্য্যও তাঁহার কার্য্যের বা ইচ্ছার ছায়া, ভগবানে ভক্তি ও প্রীতিজনিত প্রাণের এই উচ্ছ্বাস আমার কার্য্যের নিয়ামক। ইহার ব্যতিক্রমেই আমার আন্তরিক অরুচি এবং অনুক্রমেই প্রাণের রুচি থাকা উচিত। এই বোধ।

৪। ভগবান আমাদের সকলের পিতা মাতা, গুরু এবং রাজা। আমরা তাঁহার একই রূপ ভালবাসার অধিকারী সন্তান, শিষ্য ও প্রজা। অতএব চিত্তকে আকাশের মত বাধা শূন্য ও উদার করিতে হইবে। যেন ব্যক্তি বিশেষের মতের ভিন্নতায়, রুচির পার্থক্যে সংর্ষণ উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে আত্মদ্রোহী করে না। এই বোধ।

সংক্ষেপ করিবার জন্য মূল সূত্রাকারে যে চারিটী বোধের কথা উল্লেখ করিলাম, সমাজের প্রতি ব্যক্তির হৃদয়ে যাহাতে ইহার ক্রম বিকাশ হইতে পারে, তদ্রূপ শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে। ইহা দ্বারা মানুষের মন হইতে পাপের বীজ পর্য্যন্ত দূরীকৃত হইবে। পাপের মূলের উৎপাটনের চেষ্টা না করিয়া দণ্ডবিধি অবলম্বন করা বর্ব্বরতা মাত্র। এক দিন এই বর্ব্বরতা পৃথিবী হইতে দূরীভূত হইবে। কিন্তু ভাবী শুভ দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে, রাজনীতির কয়েকটা কঠোর নিয়ম মুখস্থ করিলে হইবে না। উদার এবং উচ্চ শিক্ষা চাই—মহা সাধনা চাই। এইরূপ উচ্চ শিক্ষা বিস্তার ব্যতীত প্রকৃত সমাজোন্নতি সাধনের উপায়ান্তর আমাদের স্থূল চক্ষে পতিত হয় না। যখন কোন সমাজাকাশ অবনতির ঘোর ঘন ঘটায় আচ্ছন্ন হয়, চতুর্দ্দিক হইতে প্রবাহিত ঝটিকায় আন্দোলিত হইতে থাকে,ঘন ঘন আত্মদ্রোহিতারূপ বাজ পড়িয়া দেশ ছারখার হইতে থাকে, তখনই দেখা যায়, শত মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তেজ বিকীর্ণ করিয়া এক এক জন মহাপুরুষ উত্থিত হন এবং তিনিই স্বর্গীয় গম্ভীর স্বরে সামাজিকগণকে এই শিক্ষাবিধান করিয়া অন্তর্হিত হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে বহুকালব্যাপী ঘোর অন্ধকারে যখন ভারতবক্ষ নিবিড় রূপে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখনই পতিত আর্য্য সন্তানগণকে এই স্বর্গীয় শিক্ষাদান করিতে শিক্ষকরূপে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মহর্ষি মুসা পতিত ইহুদী জাতিকে এই শিক্ষা দিতেই ইহুদীদের সেই বিপদের দিনে জন্ম গ্রহন করিয়া ছিলেন। যখন ইয়ুরোপাদি দেশ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তখন ঈশা তাহাদের এইরূপ শিক্ষকরূপে প্রাদুর্ভূত হন।

আমরা অনেক সময়ে প্রাচীন ও আধুনিক উন্নত সমাজ সকলের বাহিরের লেখা পড়ার চর্চ্চা, জ্ঞান. বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্যাদির উন্নতি এবং সামরিক বলাদি

দেখিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হই। তদ্ভিন্ন এই সকল কাজের ভিত্তি-মূলস্বরূপ জাতীয় একতা, অধ্যবসায় ও সাহসাদি দেখিয়াও গম্ভীর এবং স্তম্ভিত হইয়া যাই। এইরূপে যখন আধুনিক বা প্রাচীন কোন এক জাতির প্রতি প্রাণ আকৃষ্ট হয়, তখন সেই জাতীয় লোকের আচার, ব্যবহার, আহার, পরিচ্ছদ ও বাসাদির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস জানিতে ব্যগ্র হই এবং তাহার অনুরূপে নিজেদের নিকৃষ্টতর সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। তখন কেবল তাঁহারা কি ভাবে জীবনের প্রাত্যহিক ব্যাপারে চলিতেছেন বা চলিতেন, কি ভাবে কি করিতেছেন বা করিতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি রূপ নানা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং মনে কেবলই অনুকরণ-পিপাসা উদ্রিক্ত হইতে থাকে। এইরূপে কেহ অমুকের হ্যাটটী, কেহ অমুকের টিকিটী, কেহ চামচ খানি, কেহ বা কোশা কুশি লইয়া টানাটানি আরম্ভ করেন। এই রকম ছোট ছোট অনুকরণ লইয়াই মতামত, যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকে। কেবল ধর্ম্মের বহিরাবরণের প্রতি চক্ষু পড়ে। কেহ বলে কৃষ্ণ ভজ, কেহ বলে খ্রীষ্ট ভজ, কেহ বলে মন্দির গড়াও, কেহ বলে গির্জ্জা সাজাও, কেহ বলে দোল, দুর্গোৎসব, রাসে মাত, কেহ বলে বড় দিন বা ইষ্টার পর্ব্বে মাতিয়া যাও, কেহ বলে ব্রহ্ম পূজাই সার, আর এক জন বলে, যাগ যজ্ঞ কর্ম্ম কাণ্ড-পূর্ণ-পৌত্তলিকতাই ভাল। এইরূপে ব্যবসায় বাণিজ্য শিল্প, কল, কৌশল, লিখা, পড়া সকল বিষয়েই অনুকরণপ্রিয়তা বশত নানা বাহিরের মতামত ভেদাভেদ উপস্থিত হয়। আমরা অনেক সময়েই বাহিরের দিক্ দিয়া সমাজাদির বিষয়ে বিচার ও আলোচনা করিয়া থাকি।

আমরা যে সকল মূলমন্ত্র বা মূল সূত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইচ্ছা হইলে তাহা কেহ সংশোধন করিয়া পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত কিম্বা সংক্ষিপ্ত করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের মনের ভাব এই যে, মানুষের মধ্যে পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম জ্ঞানের বিকাশ ব্যতীত জন-সমাজের উত্থানের উপায়ান্তর নাই। সাহস বল, উদ্যম বল, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প-নিপুণতা বল, সকলই ধর্ম্মের ফল। ধর্ম্ম—ভয়ের ধর্ম্ম নয়, লাভের ধর্ম্ম নয়—ঈশ্বরে গভীর প্রীতি ও ভক্তির ধর্ম্ম চাই। দেখাযায়, লোক-ভয় বা ধর্ম্ম-ভয়ে মানুষের মন হইতে প্রকৃত পাপের অঙ্কুর নির্ম্মূল হয় না। কিন্তু পবিত্রস্বরূপ ভগবানকে ভালবাসিতে পারিলে, পাপাদি করা মানুষের পক্ষে অসম্ভবপর হয়। এই রূপ ধর্ম্মবল না পাইলে, কি করিয়া সমাজের মূল মন্ত্র সকল—মূল সূত্র সকল প্রতিপালিত হইবে? কি করিয়া মানুষ ধন, মান, স্ত্রী, পুত্র ও জীবনের ভার সমাজের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত মনে উন্নতি সাধন করিবে? যখন নিতান্ত রক্তমাংসের সম্বন্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তির হস্তেও ধনরাশিপূর্ণ সিন্দুকের কুঁজির বা রূপ রাশিময়ী স্ত্রী কন্যার ভার ন্যস্ত করিয়া অনেক সময় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, তখন এমন অবিশ্বাসীর মুল্লুকে কি করিয়া কোটি কোটি প্রলোভন লইয়া জীবনের মহাব্রত সকল উদ্যাপন করিতে ঘর বাঁধিব?

কেহ বলিতে পারেন, কোটি কোটি লোকপূর্ণ সমস্ত সমাজটাকে এই রূপ ধর্ম্ম—

ভাবে গঠিত করা কখনই সম্ভবপর নয়। আমরা স্বীকার করি, এক দিনে সম্ভবপর নয়, দুই দিনেও নয়, কিন্তু বহুকালে সম্ভবপর। এমন কোন্ উপায়ই বা আছে, যদ্দ্বারা এক দিনে বা দুই দিনে একটা সমাজ ঠিক হইতে পারে? কত যুগ যুগান্ত হইতে ত রাজ-শাসন, সমাজ-শাসন, ধর্ম্ম-শাসন চলিয়া আসিতেছে? কৈ কোন সমাজইত উহার উপরে দাঁড়াইয়া উন্নতির পথে অটল থাকিতে পারিতেছেনা? রোম বল, গ্রীশ বল, মিসর বল, ভারত বল, এ সকলের পতনের মূল কি ঐ সকলের অভাব? কেন আজওত ভারতে ঐ তিনেরই বিদ্যমানতা আছে—বরং কঠোরতর ভাবে আছে? তবুও আমরা পতন পতন বলিয়া দিন রাত চীৎকার করি কেন? শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞানের বা সৈনিক বলের অভাবই কি এই পতনের কারণ? তবে যে সকল সভ্য জনপদ বর্ত্তমান যুগে ঐ সকলের ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া মদগর্ব্বে ধরা কাঁপাইতেছে, তৎ সমুদয়েরও ভাবী পতন বড়ই শীঘ্রগামী বোধ হইতেছে কেন? বস্তুত, জন-সমাজের পতনের মূল কি প্রকৃত ধর্ম্মভাবেরই অভাব নয়? যাহা হউক্, সকল উপায়ই যখন বহুকাল ব্যাপী শিক্ষা বা সাধনা সাপেক্ষ, তখন যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃত উপায়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া পথান্তরে যাইব কেন? আজ না হউক্, কাল না হউক্, এক যুগে না হউক্, দশ যুগে না হউক্, শত শত যুগের সাধনাতেও যদি কৃতকার্য্য হইতে হয়, তবুও বলি, প্রকৃত ধর্ম্ম-ভাব বা ধর্ম্ম-বোধ জন-সাধারণের প্রাণে জাগ্রত করিতেই দেশময়—সংসারময় শিক্ষা ও সাধনার উদ্যোগ কর। যুগে যুগে ঈশা, মূশা, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবির, রাম মোহন শিক্ষক রূপে আসিয়া কত শিক্ষা, কত উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণ কত শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহাদেরই শিক্ষাবলে পৃথিবী আজও মহাপ্রলয়ের কবলে পতিত হয় নাই। এস, আমরা তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশ ও শিক্ষার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হই। সকল জ্ঞান, সকল পবিত্রতা, সকল নীতির আলোকময় মহাপ্রস্রবণ হইতে দিন রাত্রি শিক্ষা ও উপদেশ, অনন্ত অপার সাগরের ন্যায় স্রোত বহিয়া আসিতেছে। সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, পলে পলে, তিলে তিলে অনন্ত অজস্র ধারায় তাহা হইতে নব নব শিক্ষা ও উপদেশ আমাদের হৃদয়-মধ্যে অবশ্যই উদিত হইতে থাকিবে। এভাবের কথা নয়, দোকানদারি বা আসর জমকানের কথা নয়। হয়ত, অধ্যবসায়, সাহস, উদ্যম, একতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প-নৈপুণ্য, সৈন্য-বল, ইত্যাদির কথা না বলিয়া, শুধুই ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিলাম বলিয়া, ইহা কাহারও নিকট ভাল লাগিবে না। কিন্তু লাগুক্ বা না লাগুক্, বিশ্বাস করি, ইহাই সত্য কথা। আশার বিষয়, এই বঙ্গ দেশে দুই এক দল শিক্ষিত লোক দেশকে ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ভারত চন্দ্র ও বিদ্যাসুন্দর। (৩য়)

ভারতচন্দ্র মালিনীর যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে মালিনীকে বড়ই স্বার্থপর করা হইয়াছে। স্বার্থপর করাতে চিত্রটী স্বাভাবিক হইয়াছে। ফলতঃ মালিনীর মত লোক স্বার্থপর হইয়া থাকে। মালিনী টাকা কড়ি পাইলে যত খুসি হয়, আর কিছুতেই তত নহে। মালিনী সুন্দরের জন্য বাজার করিতে গিয়াছে—তখন তাহার কি প্রকার ব্যবহার, একটুকু মনোযোগ পূর্ব্বক সে অংশ টুকু পাঠ করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। তখন আর তাহার সে রূপ যৌবন নাই, সুতরাং সে আর দোকানী পসারীকে ভুলাইতে পারে না, এখন সে শুধু কথা দ্বারা সকলকে ভুলাইয়া বাজার করিতে পারে। সে কি প্রকারে মন্দ টাকা দিয়া আসল টাকার পয়সা হিসাব করিয়া নেয়, কি প্রকারে একগুণ দ্রব্য কিনিয়া তৎ পরিবর্ত্তে দশগুণ নেয়,কি প্রকারে কোটালকে কহিয়া বেনিয়াকে ফেরে ফেলে, কি প্রকারে যে দোকানী বড় আঁটা আঁটি করে, তাহাকে নাস্তা নাবুদ করে, একটু পাঠ করিলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। তারপর মালিনী বাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুন্দরকে বাজারের যে হিসাব দিয়াছিল, তাহা অতি চমৎকার। ইহাতে তাহার চরিত্র উত্তমরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রের লিপিকৌশল আরও চমৎকার। এমন সুন্দর মাজা ঘসা লেখা আর কাহারও গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। দৃষ্টান্তের পক্ষে মালিনীর বাজারের হিসাব হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি। মালিনী সুন্দরকে কহিতেছে,—

আটপণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
দুর্ল্ভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায় ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥

ইহাতেই এই বিষয়ের বেশ আভাস পাওয়া যায়। অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

তারপর আহারান্তে সুন্দর যখন রাজবাটীর কথা ও বিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন মালিনী সবিস্তারে সকল কথা কহিল, এ পর্য্যন্ত সে বিদ্যা সম্বন্ধে কিছুই বলে নাই। ইহাতে মালিনী যে খুব চতুরা, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। মালিনী যতদূর পারিল, ততদূর বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিল। এ রূপ বর্ণনাতে ভারতচন্দ্রের লিপি-কৌশল কত মধুর, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। তারপর সুন্দরের মনোগত অভিপ্রায় বলিয়া, রাজা রাণীকে কহিয়া, ঘটকালী করিতে হীরা সুন্দরকে কহিল। সুন্দর তাহাতে নারাজ। কেন যে নারাজ, তাহারও যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। অন্যপক্ষে সুন্দর বিদ্যার মন বুঝিতে চাহিলে, হীরা সেই দৌত্যে স্বীকৃতা হইল। ইহা মালিনীরই কাজ। সুন্দর ফুলের মালা গাঁথিলেন। হীরা তাহা লইয়া বিদ্যার কাছে গেল। মালা গাঁথিতে সুন্দর বড় দেরী করিয়াছেন, অধিক বেলা হওয়াতে বিদ্যা কুপিতা হইয়া মালিনীকে বড় শাসাইল। তাহাতে হীরা কিছু ভীতা হইয়া, বিলম্বের কারণ বিনয়ের সহিত বলিল। এবং চিকণ মালা দিল। মালা দিয়াই হীরা ফিরিয়া আসিল না। কারণ সে জানিত, মালাতে

সুন্দর কি কল করিয়াছেন, সুতরাং শেষ ফল কি হয়, তাহা দেখিবার জন্য হীরা অপেক্ষা করিল। হীরা যে শ্রেণীর স্ত্রীলোক, তাহার পক্ষে এই প্রকার-ব্যবহারই খুব স্বাভাবিক হইয়াছে। তারপর বিদ্যা কল দেখিয়া খুব চমৎকৃতা হইল। এবং সবিশেষ জানিবার জন্য হীরাকে বড়ই অনুনয় করিতে লাগিল। হীরাও সময় পাইয়া আপন পসার বাড়াইয়া লইল। এবং সে যাহা যাহা জানিত, সমস্ত সবিস্তারে অবগত করাইল। বিদ্যাকেও সে এই পরামর্শ দিল যে, বাপ মাকে কহিয়া এ বিবাহ সংঘটন কর। এই প্রকার পরামর্শ দিবার কারণ এই যে, হীরা জানিত, এ রাজার বাড়ীর ঘটনা, সুতরাং কিছু গোলমাল হইলে আগে তাহাকেই তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। অন্য কাহারও বাড়ীর ঘটনা হইলে সে এই রূপ করিত কিনা, জানি না। বিদ্যা যখন ইহাতে রাজি হইল না, তখন মালিনী কিছু বিপদে পড়িল, কিন্তু উভয়ের দর্শনব্যাপার সংঘটন করিতে আপত্তি করিল না। লুকাইয়া বিবাহ দিতে তাহার ঘোরতর আপত্তি। তাই বিদ্যাসুন্দর-ঘটিত কাণ্ড মালিনীর নিকট লুকান রহিল।

সুতরাং হীরা এসমস্ত ঘটনা তখন কিছুই জানিল না। কিন্তু এক দিন হীরা এ সমস্তই জানিয়াছিল। যখন সুন্দর ধরা পড়িয়াছেন, তখন সুড়ঙ্গের অনুসন্ধান করিতে করিতে কোটালেরা মালিনীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। এবং হীরাকেই ইহার মূল জানিয়া তাহাকে বড় নিগ্রহ করিল। তখন হীরা এ ঘটনা সমস্তই বুঝিয়াছিল। কিন্তু যখন কোটালেরা তাহাকে কুটনী বলিয়া তিরস্কার করিতেছে, তখন হীরা কেমন রোষভাব দেখাইতেছে এবং কবি সেই সকল কেমন স্বাভাবিক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তারপ সুন্দরকে দেখিয়া হীরার যে রাগ হইয়াছিল তাহাও খুব স্বাভাবিক। রাজদরবারে হীরা যাহা বলিয়াছিল, তাহা হীরারই অনুরূপ বটে। হীরা এখন বড় দুঃখে পড়িয়াছে। কোটালেরা তাহার বড় অপমান করিয়াছে। রাজার সাক্ষাতে সে যাহা জানিত, তাহা অকপটে বলিল। এবং আপনার এই প্রকার অভাবিত বিপদে বড়ই হতাশ হইল। তাই সে মনোদুঃখে বলিয়াছিল ;—

"নাজানি কুটিনীপোনা দুঃখিনী মালিনী।
চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী।
নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন।
রাবণের দোষে হেন সিন্ধুর বন্ধন॥
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয়।
বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয়॥"

রাজা হীরার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে অন্য কোন দণ্ড না দিয়া শুধু মাথা মুড়াইয়া, গালে চুন কালী দিয়া নগর হইতে তাড়াইয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন। ফলতঃ হীরার মত যাহাদের কুটিনীপোনা ব্যবসা, তাহাদের এই প্রকার দণ্ড হওয়াই উচিত। ভারতচন্দ্র এই প্রকারে মালিনীকে নিগ্রহ করিয়া সমাজশাসনের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র যে অতি সুন্দর কৌশলে মালিনীর চিত্র আঁকিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না। ফলতঃ মালিনীর যে প্রকার হওয়া উচিত, ভারতচন্দ্র তাহাকে সেই প্রকারেই গঠন করিয়াছেন। বাস্তবিক হীরা হীরাই বটে—কাজেও বটে কথায়ও বটে। যেখানে যাউক না কেন, কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক না কেন, মালিনী সমস্তই ঠিক মত করিয়া আসিবে। তাহার অসাধারণ

কোন কার্য্যই নাই। ইহা যথার্থ মালিনীর চিত্র। এমন মালিনী যাহার আছে, তাহার কোন বিষয়ের অপ্রতুল হয় না। কিন্তু এমন মালিনী না থাকাই ভাল, কারণ তাহা হইতে অনেক সময়ে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। ইহারা বড়ই স্বার্থপর, টাকার লোভে সে না করিতে পারে, এমন কার্য্যই নাই।

ভারতচন্দ্রের রচনা যে উত্তম, সে বিষয়ে মতভেদ নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে অনেকে তাঁহার গ্রন্থ না পড়িয়া অযথা অনেক কথা বলিয়া থাকেন, সেই জন্য আমরা তাঁহার গ্রন্থ বিস্তৃত ভাবে সমালোচনা করিয়াছি। আমরা এই সমালোচনায় ভারতের যাহা ভাল, তাহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, তবে তাঁহার গ্রন্থে অনেক কথা এমন আছে, যাহা খুব অশ্লীল এবং সুরুচিসঙ্গত নহে, এবং যাহা তাঁহার গ্রন্থে না থাকাই উচিত ছিল। আমরা এইক্ষণ তৎসম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিব।

ভারতচন্দ্র সুন্দর ও বিদ্যার চরিত্র আঁকিতে যাইয়া সুন্দরকে বড়ই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ করিয়া ফেলিয়াছেন এবং সেই ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা এত উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, অন্যান্য সমস্ত তাহাতে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে এবং সেই জন্য তাঁহার গ্রন্থ বড় রুচিবিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যদি ভারতচন্দ্র সুন্দরের ইন্দ্রিয়-পরায়ণতাকে বিদ্যার প্রেমবর্ণনা দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিয়া, বিদ্যার প্রেমকে আরও উজ্জ্বল রূপে বর্ণনা করিয়া তৎপ্রাধান্য সংস্থাপন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কাব্য উত্তম হইত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। সুতরাং বার বার উজ্জলরূপে সুন্দরের ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বর্ণন করিয়া তিনি তাঁহার কাব্য কলঙ্কিত করিয়াছেন। এই প্রকার বর্ণনাতে তাঁহার কাব্য বড় অশ্লীল হইয়া পড়িয়াছে। ইহা না হওয়াই ভাল ছিল। আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতচন্দ্র যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎসময়ে লোকে আদিরসঘটিত সমস্ত কাব্যই ভাল বাসিত এবং আদর করিত। যাহার রচনায় আদিরস বর্ণনা নাই, লোকে তাহাকে বড় সমাদর করিত না। এমন কি, ভারতচন্দ্র যখন অন্নদামঙ্গল রচনা করিয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে তাহা উপহার প্রদান করিলেন, তখন মহারাজ তাহাতে আদিরসঘটিত বর্ণনা নাই দেখিয়া বড় খুসী হইলেন না। ভারতকে আদিরসঘটিত বর্ণনাযুক্ত বিদ্যাসুন্দর রচনা করিতে আদেশ করিলেন। তাই ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরে এইরূপ বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রকার অশ্লীল হইবার চারিটী কারণ আমরা দেখিতে পাই। প্রথমত, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ রচনা করিতে আদেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত ভারতচন্দ্র তাঁহার সময়ের রুচি অনুসারে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্রের সময়ে বাঙ্গালী বড় বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। আজিও বাঙ্গালী বিলাসপ্রিয়, তবে আগের মত নহে। এখন বাঙ্গালী কিছু কার্য্যক্ষম হইতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। তৃতীয়ত, তিনি যে বররুচির বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও এই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্থত, বর্দ্ধমানের রাজকর্মচারী ও রাজা কর্ত্তৃক ভারতচন্দ্র বার বার বড় উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাই

তিনি সুবিধা পাইয়া পূর্ব্ব আক্রোশ মিটাইবার জন্য তাঁহার গ্রন্থ এই ভাবে লিখিয়াছেন। যদিও ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানের সমস্ত কর্ম্মচারী ও স্ত্রীলোকদিগকে নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আপন নায়িকা বিদ্যার চরিত্র খারাপ করিয়া চিত্রিত করেন নাই।

ভারতচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যা ও সুন্দরের এই প্রকার গোপনীয় বিবাহ, সমাজের শাসন অতিক্রম করিয়াছে এবং ইহা যদি সমাজে প্রচলিত হয়, তাহা হইলে সমাজ বড়ই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। তাই তিনি বিদ্যাকে রাণীর মুখে তিরস্কার করাইয়াছেন, তাই তিনি সুন্দরকে চোররূপে রাজ সভায় আনয়ন করিয়া পরে মশানে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু যখন বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, বিদ্যাসুন্দরের এই প্রকার ঘটনাতে নীতির মূলে কোন দোষ ঘটে নাই, তখন তিনি রাজার মুখ হইতে "কাটিতে বাসনা নাই ঠেকেছি মায়ায়" —এই বাক্য বহির্গত করাইয়াছিলেন। সমাজশাসন উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল বলিয়া মালিনী দেশান্তরিত হইল। বাস্তবিক ভারতচন্দ্র সর্ব্বদাই সমাজিক প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পাইয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বঙ্গীয় কবিই ভারতের মত এত দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদের গ্রন্থে চরিত্রের উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা পান নাই। সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যে কবিরা বরাবর চরিত্রের সমতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোন বঙ্গকবিই সেরূপ করেন নাই। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থে আমরা প্রথমে চরিত্রের সমতা রক্ষার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। ভারতচন্দ্রের উচ্চ শ্রেণীর মানবের প্রকৃতি বিলক্ষণ জানা ছিল, তাই তাঁহার রচনা এত উৎকর্ষতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এবং তাঁহার রচিত চরিত্র গঠন হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতচন্দ্র প্রত্যেক চিত্রই বিশেষ যত্নের সহিত লিখিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের আরও একটী গুণ ছিল। তিনি উপাখ্যানকে মধুর করিতে জানিতেন। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা অতি সরল, মধুর এবং স্বাভাবিক। যখন যেস্থানে পাঠ করা যায়, তখনই সেই সমস্ত ভাব আমাদের মনে প্রতিভাত হয়। ফলতঃ ভাবের উদ্দীপনা এবং সেই উদ্দীপনা দ্বারা মানবহৃদয়কে মোহিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। ভারতচন্দ্র তাহাতে অদ্বিতীয়।

তবে আজিও অনেকে ভারতচন্দ্রকে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন বলিয়া গালি দিয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় সে সমস্ত গালির কিছুই মূল্য নাই। যাঁহারা ভারতচন্দ্রকে মন্দ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা সংসার সম্বন্ধে বড়ই অনভিজ্ঞ। তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান অথবা নীতিজ্ঞান পুস্তকলিখিত মতামত হইতে সংগৃহীত; তাঁহারা সামাজিক রীতি নীতি নিজ বুদ্ধিতে মীমাংসা করিতে অক্ষম। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের যে দোষ নাই, তাহা বলা আমার ইচ্ছা নহে, কিন্তু সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ সামান্য দোষের জন্য ভারতচন্দ্র নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে গুণ ভাগ এত অধিক যে, যাঁহারা উদারপ্রকৃতি, তাঁহারা ভারতকে কখনই অবহেলা করিতে পারিবেন না। বরং ভারতের কবিত্বে ও লিপিকৌশলে

সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর দেশমধ্যে এত প্রচার হইয়াছে যে, বঙ্গে এমন কেহ নাই, যে ইহার বিষয় অবগত নহে। সামান্য লোক হইতে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত সকলেই ইহা পাঠ করিয়া থাকেন। ভারতের বিদ্যাসুন্দর দ্বারা কত গান, কত যাত্রা—বঙ্গে গীত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ইহার এই প্রকার বহুল প্রচার দেখিয়াই আমরা ইহার এত বিস্তৃত সমালোচনা করিলাম।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা বাস্তবিক বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল কিনা? বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় উপাখ্যান লোকসমাজে যে ঘটিতে পারে না, তাহা আজি কালির লোকদিগকে বলিয়া দিবার আবশ্যক নাই। ইহা কবির কল্পনা মাত্র। বররুচি তাঁহার সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরে উজ্জয়িনীকেই এই ঘটনার স্থল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা অনুবাদক গুণাকরের পূর্ব্বে কেহ ইহা বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক বীরসিংহ বলিয়া বর্দ্ধমান রাজবংশে কোন রাজা কোন কালে বর্দ্ধমানে রাজত্ব করেন নাই। ইহা কবির কল্পনা মাত্র। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ প্রচারিত হওয়ার পর সকলে ইহার বিষয় অবগত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্র যে শুধু বর্দ্ধমান রাজপরিবার ও রাজ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন বলিয়াই এ ঘটনা বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ প্রচার হওয়ার পরে লোকের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাই তাহারা আজিও বর্দ্ধমানে ২টী স্থান নির্দ্দেশ করিয়া একটীকে মালিনী পোঁতা ও অন্যটিকে বিদ্যা পোঁতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান উপলক্ষ করিয়া কেহ কেহ বর্দ্ধমান রাজপরিবারের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ কটাক্ষপাতের যে কোন মূল নাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। একেত এ ঘটনা কবি কল্পনা মাত্র। যদি কবি কল্পনা না হইয়া সত্য সত্যই এ ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহাতেই বা দোষ কি? ভারতচন্দ্র বিদ্যা ও সুন্দরকে কালীর কিঙ্করী ও কিঙ্কর রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দুর মতে, যে কুলে কালীর কিঙ্করী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে কুলে কালীর কিঙ্কর বিবাহ করেন, সে কুল খুব সম্মানিত হইয়া থাকে। অনেকে কহিয়া থাকেন যে, কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বর্দ্ধমানের রাজাদিগের প্রতি রোষপরবশ হইয়া গুণাকরদ্বারা বর্দ্ধমানের রাজবংশে কলঙ্ক নিক্ষেপ অভিপ্রায়ে বিদ্যাসুন্দর রচনা করাইয়াছিলেন। এ কথা কতদূর সত্য,তাহ আমরা জানিনা। বোধ হয়, ইহা লোকের কল্পনা মাত্র। কারণ তাহা হইলে বর্দ্ধমানের রাণী মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ভূমি ইজারা লইতেন না। অথবা কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁহাকে ইজারা দিতেন না। তবে গুণাকর যে কারণে এ ঘটনা বর্দ্ধমানে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা উপরে বলা হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীরজনীকান্ত রায়।

ওরেরে সোণার শশি তোরে আমি ভাল বাসি।

ওরেরে সোণার শশি,
তোরে আমি ভালবাসি;
তাই তোরে মনে হলে প্রাণ উঠে কাঁদিয়া;
শরীর কেমন করে,
থাকিতে পারিনা ঘরে,
দেখিতে বদন তোর আসি হেথা ধাইয়া।

মোহন মূরতি তোর,
প্রেম রসে ভোর ভোর,
প্রেমিকের প্রাণে দেয় প্রেম-উৎস খুলিয়া;
ও তোর মধুর আলো
প্রাণে বড় লাগে ভালো,
তাই কবি যায় ভাবে আপনাকে ভুলিয়া।

সুন্দর নয়নে তব
ফোটে হাসি নব নব,
সুন্দর রূপেতে ভাসে সুবিমল অমিয়া;
ইচ্ছা হয় ধেয়ে যাই,
অবিরত মধু খাই,
ও সুরস মুখ খানি ধীরে ধীরে চুমিয়া!

মধুর ফুটন্ত হাসি
আমি বড় ভাল বাসি,
তাই তোর রূপে থাকি একবারে মজিয়া;
দেখিতে দেখিতে রঙ্গে
ভাবের তরঙ্গসঙ্গে
প্রাণের মোহন-বাঁশী ধীরে উঠে বাজিয়া।

বল বল ভাই মোর
কেন এত হলি চোর?
কেন এত চুপ করে কুটীরেতে ঢুকিলি?
মোহন মায়ার বলে
প্রাণটীকে ধরি ছলে,
অনন্ত স্বপন-জালে একেবারে বান্ধিলি?

পিঞ্জর ছাড়িয়া হায়
প্রাণটী উড়িয়া যায়,
"আয় আয় আয়" বলি তবু ফিরে চায় না,—
চাঁদনির ইশারায়
পাগলের মত ধায়,
কোথায় চলিয়া যায় কাহাকে জানায় না!

অই অই মরি মরি
বিরহীর বেশ ধরি,
পাখিটী ছুটিয়া যায় মুহু মুহু ডাকিয়া;
অই তোর গায়, শশি,
গেলরে গেলরে মিশি,
পাছেতে রহিল মাত্র ক্ষীণ স্বর পড়িয়া!

কেন চাঁদ, বলো বলো
প্রাণটী এমন হলো?
শরীর ভেদিয়া তোর কোথা সে লুকায় রে?
কেন যায়, কোথা যায়?
কাঁহাকে দেখিতে চায়?
তোর মধু খেতে যেয়ে কার মধু খায় রে?

জানি নাই বুঝি নাই,
কেবল দেখিতে পাই,
সোণার একটী ছায়া ভাসে তোর বদনে,
দলের ভিতরে দল
প্রেম-রসে চল চল,
মধুর ভিতরে মধু উথলয় নয়নে!

ওরেরে সোণার শশি,
তোরে আমি ভাল বাসি,
চেয়ে তোর মুখ পানে কারে মনে হয় গো?
ও তোর মূরতি হেরি,
কার ছবি মরি মরি
হৃদয়-আকাশে আসি ধীরে দেখা দেয় গো?

নির্ম্মল মুকুর-দেশে
যেন প্রতিবিম্ব ভাসে,
ও মোহন রূপ খানি কাঁর রূপ ধরে লো?
ও হাসি ভিতর দিয়া
কার হাসি উথলিয়া
বিমলা চপলা সম উকি ঝুকি মারে লো?
বুঝেছি সোণার শশি,
কাহার ছায়াটি আসি
ফুটন্ত নয়নে তোর খল খল হাসিছে;—
বিমল অমৃতময়
কাহার মাধুরি চয়
চঞ্চল জোছনা সঙ্গে ধীরে ধীরে ভাসিছে।
ওরেরে সোণার শশি
তোরে আমি ভাল বাসি,
তুমি মোরে কৃপা ক'রে হারাধন দিয়েছ,
নিয়ত যাঁহার তরে
কাঁদিতাম হা হা ক'রে
তাঁকে দিয়ে তুমি মোর প্রাণে সুধা ঢেলেছ।
তোমারি মূরতি হেরে
চিনিতে পেরেছি তাঁরে,
যাঁহার শোকেতে আমি দিবা নিশি জলিছি,
সেই মোর কোলাকুলি
হৃদয়ের গলাগলি
আবার তোমারি কাছে ভাল ক'রে শিখেছি।
হাস হাস বিধু মোর
প্রেম-রসে হয়ে ভোর,
আমিও তোমার সঙ্গে মৃদু মৃদু হাসিব;
তুমি আমি এক হয়ে,
সুরে সুর মিলাইয়ে,
চিরকাল প্রেম ভরে তাঁর গুণ গাহিব;
আমার দুফোঁটা জল
প্রেম রসে ঢল ঢল
তাঁর সঞ্জীবনী কোলে গড়াইতে থাকিব;—
গড়াইয়ে গড়াইয়ে
দুটি প্রাণ এক হয়ে
অনন্ত কালের তরে অনন্তেতে ডুবিব!

শ্রীমতি লাল দাস।

বোম্বে ও পুনা ভ্রমণ। (২য়)

পর দিন প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর একটী ইয়ুরোপ হইতে প্রত্যাগত মহারাষ্ট্রীয় ভদ্র লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ইহার নাম মেঃ ওপ্টে, ইনি সরকারি ব্যয়ে বিলাতের প্রদর্শনীতে বোম্বাই মিউজিয়মের কিউরেটার স্বরূপে গমন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই আহারাদির আয়োজন করিতে বলিলাম, কারণ সেই দিনই এলিফান্টা দ্বীপ দেখিব বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইলাম। আহারাদি করিয়া প্রায় ১টার সময় এপলো বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের সঙ্গে ছাত্রনিবাসের ৬।৭ জন ছাত্র ছিল। সেখানে একখানি সুন্দর নৌকা ভাড়া করিলাম। এ নৌকাগুলির অনুরূপ নৌকা কলিকাতা ভাগিরথীর ঘাটে দেখা যায় বটে, কিন্তু নৌকা গুলির চলাফেরাও গঠন কিঞ্চিৎ বিভিন্ন, এবং পাল ইত্যাদির বন্দোবস্ত ভাল। কিছু জলযোগের সামগ্রী লইয়া, নৌকায় উঠিলাম। মাঝিরা পাল তুলিয়া দিয়া গান ধরিল। সমুদ্র হইতে বোম্বাইর শোভা বেশ দেখিতে লাগিলাম। শুনি-

য়াছিলাম, সমুদ্রের জল অতি লবণাক্ত ও বিস্বাদ, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য একটু জল তুলিয়া মুখে দিলাম, তাহার এত বিকৃত স্বাদ পাওয়া গেল যে, কখনও তাহা মনেও করি নাই। তখনই মনে হইতে লাগিল যে, নাবিকেরা এই অপার জল-রাশির মধ্যে থাকিয়াও এক বিন্দু জলও পান করিতে পারে না। বায়ুর অনুগ্রহে আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এলিফাণ্টায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই দ্বীপটী বোম্বাই হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত, ইহাকে দ্বীপ না বলিয়া, সমুদ্রস্থিত পাহাড়-পুঞ্জ বলিলেও চলে। ইহাতে লোকের বাস-স্থান আছে কিনা, জানি না। আমরা যে স্থানে অবতরণ করিলাম, তথা হইতে ক্রমোচ্চ সোপানমালা গিরিগহ্বরস্থ মন্দির পর্য্যন্ত চলিয়াছে। এত বড় সহরের নিকট-বর্ত্তী দর্শনীয় স্থান বলিয়াই সর্ব্বদা ইহা দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ থাকে। আমরা ক্রমে ক্রমে পাহাড়ে উঠিলাম। দ্বারে একটী বৃদ্ধ সাহেব টিকেট বিক্রয় করে, টিকেট লইয়া আমরা গহ্বরে প্রবেশ করিলাম। একটী রাজকীয় ভৃত্য আমাদিগকে সমস্ত বস্তু দেখাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পাহাড় কাটিয়া এ মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে, স্তম্ভ-গুলিও অতি পরিষ্কার ও সুন্দর, আর চারিদিকে হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি-মূর্ত্তি খোদিত। এত বড় দেবমূর্ত্তি আর জন্মে দেখি নাই, ১৩।১৪ হাত দীর্ঘে ও ১৫।১৬ হাত প্রস্থে কয়েকটী দেবমূর্ত্তি আছে। পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল এ সমস্ত বৌদ্ধ মন্দির হইবে, কিন্তু এখানে আসিয়া সে ভ্রম দূর হইল। ত্রিমূর্ত্তি, গণপতি, পার্ব্বতী এ কয়েকটী দেবমূর্ত্তিই অতি প্রকাণ্ড। এক অতি বৃহৎ শিবলিঙ্গও দেখিতে পাইলাম। কেহ কেহ ইহাকে জৈনমন্দিরও বলে। আমাদের হিন্দু মন্দির বলিয়াই প্রতীতি জন্মিল। সূক্ষ্ম-দর্শী প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের গবেষণায় কি নির্দ্ধা-রিত হইয়াছে, জানিনা। মন্দিরটী দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম, কি উপায়ে এই প্রকাণ্ড পর্ব্বত-গহ্বর খোদিত হইয়াছে, কি অস্ত্র দ্বারাই বা এই অমানুষিক কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, আর যাহারা এই অভেদ্য শিলাখণ্ড খুদিয়া এত বৃহৎ ও মনোরম দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেই শিল্পীদিগের শিল্পনৈপুণ্যই বা কত ছিল; কত শ্রমজীবী লোকই বা এই বৃহৎব্যাপার সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়াছিল; এবং কতকাল ধরিয়া এই সমস্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে;— কল্পনার সাহায্যে এসকল ভাবিয়া স্থির করা কঠিন। এই সমস্ত কাণ্ডকারখানা ভৌতিক বলিয়া মনে হয়। দেবমূর্ত্তির অনেক গুলিই ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাইলাম। ইংরাজ মহোদয়েরা নিজ দেশীয় মিউজিয়ম শোভিত করিবার জন্য অনেক দেব দেবীর মস্তক ও নাসা ছেদন করিয়াছেন। আজ কাল যাহা আছে, তাহা রক্ষার জন্য বেশ বন্দোবস্ত হইয়াছে। যে হস্তীর প্রতিমূর্ত্তির জন্য এই দ্বীপটী এলি-ফাণ্টা নামে অভিহিত হইয়াছে, সেটী কিন্তু আমরা দেখিতে পাইলাম না। মন্দির দেখা শেষ হইয়া গেলে, পাহাড়ের শীর্ষ স্থানে উঠিবার জন্য আমাদের বড় সাধ হইল। পথ একবারেই নাই, তাই গাছ পালা ধরিয়া কত দূর উঠিলাম; তাহাতেই অনেক বিপদের সম্ভাবনা ছিল। নামিবার সময়ে হামাগুড়ি দিয়া নামিতে হইল।

সন্ধ্যার সময়ে নৌকাযোগে আসিয়া বোম্বাই যাত্রা করিলাম। সমুদ্রের মধ্যে সন্ধ্যা-বাতাস সেবন করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিলাম। ইচ্ছা ছিল, প্রার্থনা সমাজে গিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সংস্কৃত উপাসনাপ্রণালী দেখিব, কিন্তু সেখানে যাইয়া দেখি, তাহাদের পূজা অর্চ্চনা শেষ হইয়া গিয়াছে, উপাসকেরা গৃহে গমনোন্মুখ। উপাসকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আমাদের ছাত্র বন্ধুটী উপাসকদিগের মধ্য হইতে দুই তিনটী প্রধান লোককে দেখাইয়া দিলেন। স্বনামখ্যাত পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরাংকে দেখিতে পাইলাম, বয়সে ও জ্ঞানে প্রবীণ ডাক্তার আত্মারামকে দেখিতে পাইলাম। তিনি আমাদিগকে বিদেশীয় দেখিয়া আমাদিগের সহিত আসিয়া করমর্দ্দন করিয়া কিছুকাল সুমিষ্ট আলাপ করিলেন। তাঁহার সৌজন্যে আমরা অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়াছিলাম।

তার পরদিন প্রত্যুষে আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত বিলাতপ্রত্যাগত বন্ধু গুপ্তের সহিত অত্রত্য হাইস্কুলের হেড্ মাষ্টার মেঃ বামন আবাজি মোড়কের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ইনি বোম্বাই সহরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে জ্ঞান, প্রতিভা ও শিষ্টাচারে একজন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি। ইনি সংস্কারকদিগের এক জন নেতা, এবং প্রার্থনা সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য। আমরা জানিতে পাইলাম যে, ইনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব প্রথম গ্রাডুয়েট। ইহার গৃহে আমাদিগকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, কারণ আমাদিগের যাওয়ার পূর্ব্বেই তিনি বাহিরে গিয়াছিলেন। আমরা ইতিমধ্যে ঘরের টেবলস্থিত সংবাদ পত্র ও গ্রন্থাদি পড়িতে লাগিলাম। ইহার পুস্তকাদি দেখিয়াই বোধ হইল, ইনি এক জন মার্জ্জিতরুচি ও ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক অনেক গ্রন্থাদি দেখিতে পাইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই ইনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহার বিনয়ে, জ্ঞানগর্ভ আলাপে ও শিষ্টাচারে আমরা যথেষ্ট প্রীত হইলাম। ইহার শিক্ষা অতি উচ্চ শ্রেণীর। দর্শন, ইতিহাস ও সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। যদি ও প্রাচীন দলের লোক, তবু আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলনে ইঁহার বিশেষ উৎসাহ দেখিতে পাইলাম। ইনি অনেকক্ষণ যাবৎ খ্যাতনামা প্রাতঃস্মরণীয় দাদা ভাই নরৌজির গুণগান করিলেন, এবং বলিলেন, ইনি বাস্তবিকই স্বাভিলাষশূন্য (Self-less) মনুষ্য; দাদা ভাইর ন্যায় আর কয়েকটী লোক জন্ম গ্রহণ করিলে ভারতের দুঃখদারিদ্রের কথঞ্চিত অবসান হইবে। বিখ্যাত অনারেবল টেলাং ও মেঃ মেটার বিষয়ে অনেক কথা হইল। মেঃ টেলাং অসুস্থতা নিবন্ধন জাতীয় সম্মিলনীতে যাইতে পারেন নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সাম্প্রদায়িক ভাবের প্রতি ইঁহার বিশেষ বিদ্বেষ দেখা গেল। ইঁহার সকল সমাজের সহিতই সহানুভূতি আছে। ইনি বঙ্গদেশীয় যুবকদিগের ধর্ম্মানুরাগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা বলিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকেরা মিল স্পেন্সার কমটি প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের গ্রন্থাদি পড়িয়া ঐ সমস্ত বিষয়ে ক্রমেই উদাসীন হইয়া পড়িতেছে; ধর্ম্মে তাহাদিগের বিশেষ আস্থা নাই। তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তরলমতি বালকেরা ঐ সমস্ত দর্শনের নিগূঢ় ভাব ও একদেশদর্শিতা

হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াই অবিশ্বাসের রাজ্যে উপস্থিত হয়। ইঁহার সহিত কথোপকথনে ইঁহাকে সমস্ত বিষয়েই সংস্কার-পক্ষপাতী বলিয়া বোধ হইল। ইহার গৃহে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম,ইহাতে বাঙ্গালী বলিয়া মনে একটু গৌরবের উদয় হইল যে,ভারতের সর্ব্বত্র পূজিত ও সম্মানিত হইবার যোগ্য পাত্র আমাদের দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সময়াভাবে চা ও ধূমপানের বন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বিদায় দিলেন। আহারাদির পর মেঃ ওপ্টের সহিত বোম্বাই জিজাভাইশিল্পবিদ্যালয় (Bombay School of Arts)দেখিতে গেলাম। বোম্বাই আসিয়া বুঝিতে পাইলাম—এদেশীয় ধনীদিগের দানশীলতা কত উচ্চ দরের। পারসী ও ভাটিয়াদিগের প্রতি কমলা অতি প্রসন্না, এবং ইহারাই বাস্তবিক কমলার অনুগ্রহের সদ্ব্যবহার করিতে জানে। মূক, খঞ্জ, বধির, অন্ধ, ও সর্ব্ববিধ প্রকার রুগ্ন ব্যক্তিদিগের ক্লেশাপনোদনের জন্য ইহাদের দানশীলতা কি না করিয়াছে? সংবাদপত্রপাঠকেরা ইঁহাদের দানশীলতার কথা অনেক পড়িয়া থাকিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসংরক্ষণার্থে বোধ হয় যেন বোম্বেবাসীরা অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছে। বলিতে হইবে না যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রতি বৎসর প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ বৃত্তি দেওয়া হয়, সেই প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ বোম্বেনিবাসী। এস্থলে তাহাদের দানশীলতার দুএকটী উদাহরণ উল্লেখ করিব। মেঃ ওপ্টে (Curator) বলিয়াই ছুটীর দিনে এই দর্শনীয় স্থানটী দেখিতে পাইলাম, অন্যথা দেখিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এ গৃহটী পারসী মহাত্মা জিজাভাইর অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছে। শিল্পবিদ্যালয়ের গৃহটীর শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।

অধ্যাপকেরা পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা দিয়া থাকেন;—কোথাও চিত্রবিদ্যা, কোথাও স্থপতিবিদ্যা ইত্যাদি।

ইটালীর জগদ্বিখ্যাত শিল্পীদিগের শিল্পচাতুর্য্যের নিদর্শন অনেক দেখিতে পাইলাম। মৃণ্ময়ী ও প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তিগুলি অতি আশ্চর্য্যজনক। একটী বালক কণ্টকবিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত অভিনিবেশসহকারে কণ্টকটী উদ্ধার করিতেছে, একটী প্রতিমূর্ত্তি ইহা প্রকাশ করিতেছে; সেই বালকটীর মুখে যেন যন্ত্রণা ও একাগ্রতা জীবন্তভাবে প্রতিফলিত। ধন্য শিল্পচাতুর্য্য! ইটালীয়ান ফ্রেস্কো (Italian Fresco) অনেক দেখিতে পাইলাম। চিত্রফলকে অনেক মনোমদ স্বভাবের ছবি, ও সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির অঙ্কিত দেখিতে পাইলাম। ইলোরা প্রভৃতি গহ্বরমন্দিরের চিত্রাবলীও অঙ্কিত রহিয়াছে। একটী স্থানে দেখিতে পাইলাম, একটী ছাত্র দর্পণে স্বীয় প্রতিকৃতি দেখিয়া একটী মৃণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছে। শুনিলাম, সে কলেজের একটী সর্ব্বপ্রধান ছাত্র; এবং কালে একজন বিখ্যাত শিল্পী হইবে। ঐ বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট এই কয়েকটী কারখানা আছেঃ—(১) মৃণ্ময় পাত্রাদি নির্ম্মাণের, (২) লৌহ ঢালাইর, (৩) ফটোগ্রাফ তুলিবার, (৪) রং করিবার। এই কারখানা গুলি এক একটী বিখ্যাত ছাত্রের তত্ত্বাবধানে আছে। শুনিলাম—তাহারা উহা হইতে মাসিক ৩০০।৪০০ শত টাকা

লাভ করিয়া থাকে। এদেশে যে সমস্ত ইংরেজ আসিয়া থাকেন, তাঁহাদের জ্ঞান-গরিমাও আমরা বেশ্ জানি ; যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন ইঁহারা প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী। দেশে যাইয়া ইঁহারা শিল্প সম্বন্ধে পরিমার্জ্জিত রুচির বিশেষ পরিচয় দিতে চান্, কাজেই দেশে যাইবার সময় ভারতীয় শিল্পের নমুনা লইয়া যান্। প্রায় ইংরেজই বোম্বের পথে ইংলণ্ডে গমন করেন, সুতরাং ঐ সমস্ত কারখানাজাত দ্রব্যের বিশেষ সমাদর। কলিকাতায় একটী চিত্রশালিকা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ নয়নানন্দকর কি আছে, জানিনা। বোম্বেতে জিজাভাইর অর্থে নির্ম্মিত ভারতেশ্বরীর একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। কলিকাতায় গড়ের মাঠে ও মিউজিয়মে পাঠকবর্গ অনেক বড় লোকের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়াছেন ; কিন্তু ইহার সহিত তুলনা হইতে পারে, কলিকাতায় এমন কিছু নাই। প্রস্তরে বস্ত্রাদির সূক্ষ্মতম ভাজ্ এমন নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শিত হইতে পারে, ইহা কখনও মনে করি নাই। টাউন-হল্ প্রভৃতি অনেক বড় বড় অট্টালিকা দেখিলাম, সে সমস্ত বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

বোরীবন্দরষ্টেসন নামক একটী প্রকাণ্ড ষ্টেসন বোম্বাইতে নির্ম্মিত হইতেছে শুনিয়া থাকিবেন। শুনিতে পাই, পৃথিবীর মধ্যে যত ষ্টেসন আছে, তাহাদের মধ্যে এটী একটী প্রধান ষ্টেসন হইবে। ষ্টেসনটী এখনও সম্যক্-রূপে নির্ম্মিত হয় নাই। অল্প দিনের মধ্যেই উহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবে। আমরা উহার অনেক স্থান ঘুরিয়া দেখিলাম। গৃহনির্ম্মাণে নিয়োজিত একটী ভদ্রলোক আমাদিগকে সমস্ত বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইলেন। ঐ গৃহের সর্ব্বোচ্চ স্থানে উঠিয়াছিলাম। চূড়াটী এখনও সম্পূর্ণ নির্ম্মিত হয় নাই। সেখানে গেলে মাথা ঘুরিতে লাগিল, তাই অল্পেতেই নামিয়া আসিলাম।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাস।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

পুরাতন।

নূতনের এতই আদর !
পুরাতন কেহই কি নয় ?
পুরাতনে নাহি রম্য কিছু—
শুধু সে কি বিভীষিকাময় ?
সে কি জানে কাঁদিতে কেবল,
আনিতে প্রাণের দীর্ঘশ্বাস ?
সাগরে সে আনে শুধু ঝড়—
দেয় না কি উষার বাতাস ?
গাহে সে কি বিলাপের গান,—
কেবল সে বিলাপে মাতায় ?
দেয় না কি কণামাত্র সুখ
বিন্দুজ্ঞান নবীন ধরায় ?

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র ঘোষ

কাল।

(Shelly.)

গভীর অতল সিন্ধু বরষ তরঙ্গ তব
কাল, মহা পারাবার মনস্তাপ তব বারি।
মানব-নয়ন-নীরে হয়েছে বিস্বাদ ঘোর ;
সীমা হারা অম্বুরাশি, প্লাবিতেছে উঠি পড়ি,

বিশাল বিস্তৃত এই অনন্ত মরণদেশ।
গ্রাসি গ্রাসি পরিশ্রান্ত,গরজিয়া আর চাও,
উগারিয়া ফেল পুনঃ মরুময় তব তীরে;
শান্তিতে বিশ্রাম নাই, ঝটিকায় ভয়ঙ্কর,
সীমাহারা পারাবার,কে ভাসিবে তব নীরে?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়।

স্মৃতি।

(Shelly)

সঙ্গীত, বিলীন হোলে মৃদুল সুস্বর,
অভিঘাত করে স্মৃতি মাঝে;
সুগন্ধ, শুকায়ে গেলে ভায়োলা সুন্দর,
গন্ধদীপ্ত ইন্দ্রিয়ে বিরাজে।
গোলাপের পাতা গুলি, গোলাপ মরিলে,
রহে প্রণয়ীর শয্যা তরে;
তেমতি তোমার চিন্তা, আছে,তুমি গেলে
ঘুমাইবে প্রেম তার' পরে।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

সাঁজের বেলায়।

(Tennyson.)

সাঁজের বেলায় দুজনাতে মিলি,
ফোটা ফোটা ফুল বেছে বেছে তুলি—
গোলাপ, টগর, শেফালিকা বেলি,
সাধের বাগানে পূরিয়া সাধ;
প্রিয়াতে আমাতে সেখানে দুজনে,
কুসুম তুলিতে, কি জানি কেমনে,
কি জানি কেমনে বলিতে পারিনে,
কেমন করিয়া হ'ল বিবাদ;
আবার তখনি সব ভুলে গেনু,
ধীরে ধীরে তার বদন চুমিনু,
দুজনের পানে দুজনে চাহিনু,
দুজনেরই চোখ্ ভাসিল জলে;
কত বার মনে হইল বাসনা,—
এ বিবাদ কেন সদাই হয় না,
এই অশ্রুজল কেনই ঝরে না,
কেনই কাঁদিনা পরাণ খুলে?
কত মধুময় হয়রে জীবন,
কত দৃঢ় হয় প্রেমের বাঁধন,
অশ্রুজলে ভাসি করিবে চুম্বন
যখনি তাহারে প্রাণের সখী।
আবার যখন—দুজনে যখন,
অতীতের ব্যথা করিনু স্মরণ,
আবার কাঁদিয়া করিনু চুম্বন
দুজনের পানে দুজনে দেখি।

শ্রীপ্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায়।

উচ্ছ্বাস-সঙ্গীত।

১

বসন্তপ্রভাত লাগি
ঘুমন্ত হৃদয় জাগি
উঠিয়াছে আজ,
নাহি তথা অন্ধকার
নিরাশ-হিমানী যার
বাষ্পময় করি।

২

আশার অরুণ-করে
কুহেলিকা গেছে সরে;
হৃদয় কাননে
চারুপুষ্প দলে দলে
ফুটিয়াছে পরিমলে
সুরভি ঢালিয়া।

৩

ভাবের ভ্রমরগণে
মানস-নিকুঞ্জ-বনে
করিছে গুঞ্জন,
প্রজাপতি কল্পনার
রঞ্জিয়াছে চারিধার
সৌন্দর্য্যে উড়িয়া।

৪

চিন্তার বিহঙ্গকুলে
উষার লাবণ্যে ভুলে

গাহিছে কেবল
ললিত বন্দনা-স্বরে
বসুধা চেতন করে
উল্লাস-ঝঙ্কার।

৫

খুলিয়া গিয়াছে মোর
প্রাণের কপাট, ভোর
বিষাদ-শর্ব্বরী,
উথলিছে অবিরল
ভালবাসা সুবিমল
জাহ্নবী-প্রপাতে।

৬

মর্ম্মতল ভাসাইয়া,
উচ্ছ্বাস-সঙ্গীত নিয়া,
বহে স্নেহ-ধার;
বিলাইব আজি ভবে
হিয়ার মমতা সবে
নূতন জীবন।

৭

সঙ্কীর্ণতা নাহি আর,
এক স্রোত,—শত ধার
প্রবাহে হিল্লোলে,
সেই প্রেম এক স্থানে
উপজিল পূর্ণ প্রাণে
ধরেনা এখন।

৮

প্রেমমন্দাকিনী দানে,
মহাসিন্ধু প্রতিদানে
লভিয়া হৃদয়,
আনন্দে শতধা হয়ে
পড়িতেছে উথলিয়ে
জগতের দ্বারে।

৯

স্নেহের সাগর-জলে
কে ভাসিবি কুতুহলে
আয়রে ছুটিয়া,
সুকুমার শিশুগণ
জীবন দুর্ল্লভ-ধন
আয়রে সকলে।

১০

উত্তাল তরঙ্গহীন
এজলধি, রাত দিন
মৃদুল লহরে,
বহিছে লহনা তুলি,
প্রাণের বাছনী গুলি
হেলে দুলে আয়।

১১

হাসিভরা ফুল্ল মুখে,
পবিত্রতাপূর্ণ বুকে,
শত দল সম
এ স্নেহ অম্বুধি নীরে
আয় তোরা ফুটিবিরে
ত্রিদিব-কুসুম।

১২

প্রেম-সিন্ধু আলো করে
ফুটে থাক থরে থরে
মাধুরী ছটায়;—
অন্তর-বাসনা যত
সুখদ ভাস্কর মত
রশ্মি বরষিবে।

১৩

হৃদয়ের কোমলতা
পিয়াইবে মধুরতা
শীতল করিয়া;
নিশ্বাস-পবন-সনে
খেলিবিরে জনে জনে
আহ্লাদে ভাসিয়া।

১৪

সমীরণ-দূতবরে,
প্রচারিতে ঘরে, ঘরে,
উৎসব-বারতা,—
পাঠায়েছি, বিশ্বময়
নিমন্ত্রিবে সমুদয়
উচ্ছ্বাস-সঙ্গীতে।

১৫

প্রেমাম্বু ছুটিয়া যায়,
শত স্রোতে গান গায়,
বাধা নাহি মানি;
ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণী গণ
এস, প্রীতি বিতরণ
করিব সবারে।

১৬

ভগবত-ভক্তি-নীরে
বহে চিত্ত-পারাবারে
প্রীতির উচ্ছ্বাস,
তাই, ভাই, আর কেন
দূরতা রহিবে হেন
এ জীবজগতে?

১৭

সে চরণে সবাকার
গতি, মুক্তি, চিরাধার
সেপদ আশ্রয়ে;
এক হয়ে যাই সবে,
দ্বিধা কভু না রহিবে
প্রেমের ধরায়।

১৮

মুক্ত প্রাণে দাঁড়াইয়া
এস বন্ধু, প্রীতি দিয়া,
জীবের দুর্গতি
আজি করি বিমোচন,
উদ্ধারি শোকার্ত্ত জন
বিশ্বপ্রেম ধারে!

১৯

প্রাণীর মঙ্গল তরে
এস, প্রীতি অকাতরে
দেইগে আমরা,
অভিন্ন আত্মার যোগে
পূর্ণানন্দসহ ভোগে
জীবদুঃখ হরি।

শ্রীমতী নীহারিকা-রচয়িত্রী।

চৈতন্য-চরিত ও চৈতন্য-ধর্ম্ম। (১৪শ)

নূতন মানুষ।

গৌরচন্দ্র গয়া হইতে নবজীবন লাভ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সে মানুষ নাই, সে ভাব নাই, সে চেহারা নাই। স্বর্গের নূতন আলোকের জ্যোতিঃ পড়িয়া সকলই নূতন হইয়া গিয়াছে। পাণ্ডিত্য গর্ব্ব ও চঞ্চলতার স্থান ব্যাকুলতাও বিনয় অধিকার করিয়াছে; অনুরাগে ডগমগ ও প্রেমাবেগে গরগর হইয়া যখন নদীয়ার রাজপথ দিয়া তিনি স্বভবন অভিমুখে যাইতে লাগিলেন, তখনকার ভাব দেখিয়া নবদ্বীপবাসী অবাক্ হইয়া গেল। আত্মীয়গণ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া আসিলে, তিনি, জননীর পদধূলি লইয়া সকলের সঙ্গে শিষ্টালাপ করিলেন। পুত্রের পুনর্ম্মিলনে শচীর মনে আনন্দ-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল; নববধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার নিভৃত

হৃদয়-কন্দরে প্রেমোল্লাস উচ্ছ্বসিত হইল, তাহা আর কেহ জানিতে পারিল না। গৌরের শ্বশুরগৃহেও উৎসব হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও কেহ বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের ভালবাসার পাত্র আর ক্ষুদ্র পরিবারে আবদ্ধ থাকিতে চাহিতেছে না, অনন্ত-বিশ্ব রাজ্যপানে ছুটিতেছে। যাহা হউক, গৌরচন্দ্র কোন মতে আপনাকে সম্বরণ করিয়া স্বীয় অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পণ্ডিতজী বলিলেন, "নিমাই, তোমার অনুপস্থিতিকালে তোমার পড়ুয়াবর্গ আর কাহারও নিকট পাঠ লইতে চাহে নাই; অন্যের নিকট পড়িয়া তাহাদের তৃপ্তি হয় না; তোমার আগমনপ্রতীক্ষায় তাহারা সতৃষ্ণ হইয়াছে; কল্য হইতে তুমি আবার অধ্যাপনা আরম্ভ কর।" গৌরচন্দ্র গুরুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অধ্যাপনার স্থান মুকুন্দ সঞ্জয়ের গৃহে আসিলেন। সেখানে তাঁহার শিষ্যবর্গ ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; এবং পুনরায় টোলে অধ্যয়ন অধ্যাপনা আরম্ভ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন ২।৪টী বিষ্ণুভক্ত বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া, গোপনে তাঁহাদের নিকট গয়ায় যে ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা দেখিয়াছেন, তাহা বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে নয়নযুগল দিয়া অজস্র অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, অলৌকিক ভাবাবেশে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ও বাহ্য জ্ঞান শূন্য হওয়ায় তিনি আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। কতক্ষণ পর প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি এই মাত্র বলিলেন

"প্রভু কহে বন্ধু সব আজি ঘরে যাহ;
কালি যথা বলি তথা আসিবারে চাহ।
তোমা সবাসনে নিভৃত এক স্থানে;
মোর দুঃখ সকল করিব নিবেদনে।
কালি সবে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ঘরে;
তুমি আর সদা শিব আসিবা সত্বরে।"

এই অলৌকিক ভাবোচ্ছ্বাস দেখিয়া বন্ধুগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, ইঁহার তো এরূপ ভাব আর কখন দেখি নাই, তবে কি কৃষ্ণ ইঁহাকে কৃপা করিয়াছেন? অথবা গয়াপথে ইনি বা ঈশ্বরের কি ঐশ্বর্য্য দেখিয়া থাকিবেন;—

"মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার;
এমন ইঁহার কভু না দেখি যে আর।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে;
কি বিভাব পথে বা হইল দরশনে।"

সরলমতি শচী দেবী পুত্রের ঈদৃশ ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া কত কি আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। যখন উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া পুত্র কাঁদিয়া উঠিতেন, তখন মায়ের প্রাণে ভয় ও আতঙ্কের সীমা থাকিত না। কখন তিনি গোবিন্দের নিকট পুত্রের কামনায় প্রার্থনা করিতেন কখনও বা স্বস্ত্যয়নাদি করাইতে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং পাড়াপ্রতিবাসী ও আত্মীয় স্বজনকে উপদেশ জিজ্ঞাসা করিতেন।

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি প্রভু করয়ে ক্রন্দন;
আই দেখে অশ্রুজলে ভরিল অঙ্গন।
কিছু নাহি বুঝে আই কোন্ বা কারণ;
কর যোড়ে গেলা আই গোবিন্দ শরণ।"

তখনকার বৈষ্ণবমণ্ডলী পুষ্পচয়ন উপলক্ষে প্রতিদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে সম্মিলিত হইতেন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায়

এক ঝাড় বৃহৎ কুন্দফুলের গাছ ছিল; তাহার চারিদিক্ বেড়িয়া বৈষ্ণবগণ সাজি হাতে ফুল তুলিতেন ও নানা প্রকার ধর্ম্মালাপে আনন্দানুভব করিতেন। মধ্যে মধ্যে স্থানীয় সংবাদ ও অন্যান্য নানা রূপ কথা বার্ত্তারও আলোচনা চলিত এবং ভক্তিশূন্য দেশ দেখিয়া কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশও করিতেন। যে দিন নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে বাটীতে পৌছিলেন, তার পর দিনে বৈষ্ণবেরা ফুল তুলিতেছেন, এমন সময় শ্রীমান পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। পূর্ব্ব দিন যে যে লোকের সমক্ষে গৌর চন্দ্র শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাটীতে আপন দুঃখের কথা বলিবেন বলিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীমান পণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ণবমণ্ডলীতে এই শুভ সংবাদ বলিবার জন্য আজ তাঁর হাস্যমুখ। সকলে তাঁহার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীমান কথাটী একটু গুমর থাড়াইয়া বলিলেন, "অবশ্য কারণ আছে।"

বৈষ্ণবগণ ব্যাকুলতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি কারণ ?'

শ্রীমান বলিতে লাগিলেন "বড় অদ্ভুত ও অসম্ভব কথা। নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে পরম বৈষ্ণব হইয়া আসিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি পূর্ব্বদিনের ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া বলিলেন;—

"পরম মঙ্গল এই কহিলাম কথা,
অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্ব্বথা।"

শ্রীমানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন এবং উদারমতি শ্রীবাস পণ্ডিত এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে "কৃষ্ণ আমাদের দলপুষ্টি করুন"।

"শ্রীমান বচন শুনি সর্ব্ব ভক্তগণ,
হরি বলি মহাধ্বনি করিল তখন।
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার,
"গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা সবাকার।"
চৈঃ ভাঃ

তখন সকলে আনন্দোচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণ-কথা ও কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন;—

"আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ সংকথন;
উঠিল মধুর ধ্বনি কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
তথাস্তু, তথাস্তু! বলে ভাগবত গণ;
সবেই ভজুক কৃষ্ণ চন্দ্রের চরণ।"

এদিকে নির্দ্ধারিত সময়ে শ্রীমান্ পণ্ডিত, সদাশিব পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগণ পূর্ব্বদিনের কথানুসারে একে একে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর কুটীরে আসিয়া একত্রিত হইলেন। গদাধর পণ্ডিতকে আসিতে না বলিলেও তিনি নিমাই পণ্ডিতের মনোদুঃখের কাহিনী শুনিবার জন্য অতীব ব্যাকুল চিত্তে ব্রহ্মচারীর গৃহের প্রকোষ্ঠান্তরে লুকাইয়া থাকিলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী একজন উদাসীন বৈষ্ণব; ভিক্ষাবৃত্তি-দ্বারা জীবন যাপন করেন। নানা তীর্থ পর্য্যটন করত নবদ্বীপে আসিয়া তিনি জাহ্নবীতীরে এক নিভৃত স্থানে কুটীর রচনা করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। নবদ্বীপের ক্ষুদ্র বৈষ্ণবদলের তিনি একজন সভ্য এবং বিশ্বম্ভরের সুপরিচিত। তাঁহারই গৃহে গৌরাঙ্গের এই প্রথম সঙ্গত হইল। বন্ধুগণ সকলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় শচীনন্দন ভক্তিউদ্দীপক শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আসিয়া দেখা দিলেন এবং 'ঈশ্বরকে পাইয়া হারাইলাম', বলিয়া পাগলের ন্যায় ঘরের

স্তম্ভ ধরিয়া আলুলায়িত কেশে কাঁদিতে কাঁদিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন।

"দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ;
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভক্তির লক্ষণ।
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা;
এত বলি স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা।
"ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে;
'কৃষ্ণ কোথা' বলিয়া পড়িলা মুক্তকেশে।"
চৈঃ ভাঃ

এইরূপ গভীর ব্যাকুলতাসহকারে যখন শচীনন্দন কাঁদিতে ছিলেন ও পুনঃ পুনঃ অনুতাপ প্রকাশ করিতে ছিলেন, তখন শুক্লাম্বরের গৃহ প্রেমময় হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে কিছু সুস্থ হইয়া তিনি শুক্লাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘরের ভিতর কেরে?' শুক্লাম্বর বলিল, গদাধর। গদাধরের নাম শ্রবণে বিশ্বম্ভরের অনুতাপানল আরও জ্বলিয়া উঠিল এবং প্রাণে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। পাঠক মহাশয় জানেন যে, গদাধর পণ্ডিত নবদ্বীপের মাধব মিশ্রের পুত্র ও গৌরাঙ্গের একজন বাল্যসখা। ইনি আকুমার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শুদ্ধশান্তরূপে ভগবদারাধনা করিতেছিলেন। কুঠরী হইতে গদাধর বাহিরে আসিলে বিশ্বম্ভর কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—

"প্রভু বলে গদাধর! তুমি সে সুকৃতি;
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলে দৃঢ়মতি।
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে;
পাইনু অমূল্য নিধি গেল মোর দোষে।"

এই বলিয়া তিনি প্রত্যেক বন্ধুর গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং ব্যাকুলভাবে সকলকে বলিতে লাগিলেন—'তোমরা আমাকে কৃষ্ণ দিয়া আমার দুঃখ খণ্ডন কর,' তাঁহার তৎকালের ভাব দেখিলে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়। সমবেত বন্ধুগণ সকলেই কাঁদিয়া অস্থির হইলেন এবং সেই স্বর্গীয়ভাব দেখিয়া কতই বিতর্ক করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিবাবসান হইলে সভাভঙ্গ হইল। গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ বৈষ্ণবসমাজে যাইয়া সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে নানা জনে নানা রূপ অনুমান করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, "ভগবান বা অবতীর্ণ হইলেন?" কোন উদ্ধত ভক্ত মনের উৎসাহে বলিয়া ফেলিলেন "নিমাই পণ্ডিত ভাল হইলে আগে পাষণ্ডী বেটাদের মুণ্ড ছিড়িব।" একজন সুবোধ ভক্ত উত্তর করিলেন, "আরে ভাই! এত ব্যস্ত কেন? ধীর চিত্তে অপেক্ষা কর; প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন কি না দুদিন পরে অবশ্যই জানা যাইবে?"

তাঁহাদের মধ্যে একজন সুচতুর ছিলেন, তিনি বলিলেন, "সাধু সঙ্গের কি মহিমা! ঈশ্বর পুরীর সঙ্গ হইতেই নিমাইয়ের ধর্ম্মজীবনে এই মহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।" এই রূপে আনন্দকোলাহলে ভক্তগণ বিতর্ক করিতে করিতে নৃত্যগীত প্রভৃতি নানাবিধ মঙ্গলসূচক ধ্বনি করিলেন, আর সকলে সমস্বরে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেনঃ—

"সবে মিলি লাগিলা করিতে আশীর্ব্বাদ,
হউক! হউক! সত্য কৃষ্ণের প্রকাশ।"

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া শচী দেবীর দিন দিন উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সরলমতি শচী এসকল ব্যাপারের কিছুই বুঝেন না। স্নেহময়ী জননীর প্রাণ কেবল পুত্রস্নেহই জানে। তিনি মনে করিলেন যে, নিমাইয়ের কোন উৎকট ব্যাধি হইয়াছে। শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়াও যখন কিছুতে কিছু

হইল না, তখন নানা রূপ খেদ করিতে লাগিলেন ;—

"পুত্রের চরিত্র আই কিছুই না বুঝে ;
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা বিষ্ণু পূজে।
স্বামী নিল, ধন নিল, পুত্র কন্যাগণ ;
অবশিষ্ট সবে মাত্র আছে একজন।
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ দেহ এই বর ;
সুস্থ হঞা ঘরে মোর রহু বিশ্বম্ভর।"

বধূর মুখ দেখিলে পুত্রের মন ভাল হইবে, বিবেচনায় শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন। অবোধ মায়ের প্রাণ ইহা বুঝিল না যে, বধূতে এ প্রেম চরিতার্থ হইবার নয়। এ যে বিশ্বজনীন প্রেমের তৃষ্ণা! বিন্দুতে এ তৃষ্ণা যাইবে কেন? প্রেম-সিন্ধুর তৃষ্ণা কি বিন্দুতে যায়? যে প্রেমের জন্য নারদ শুক পাগল, এ যে সেই প্রেমের আকাঙ্ক্ষা, শচী তাহা বুঝিলেন না। যাঁহাকে কত জাঁকজমক করিয়া দুই বৎসর আগে বিবাহ করিয়াছেন, গৌরাঙ্গ তাহাকে একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না। ছি! ইন্দ্রিয় সুখ, না তাহা হইবে না। এই ভাবিয়া বিশ্বম্ভর বধূর পানে না তাকাইয়া, যেরূপ ভক্তি-শ্লোক পড়িতেছিলেন, পড়িতে লাগিলেন, এবং কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একবার তিনি এমন ভাবে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন যে, তাহা শুনিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ভীতা হইয়া পালাইয়া গেলেন ; শচীও স্থির থাকিতে পারিলেন না। ফলে এই সময়ে তাঁহার অনুতাপের চরম দশা উপস্থিত. রাত্রিতে নিদ্রা নাই, প্রাণে সর্ব্বদাই হুতাশ ও "কিসে পাব,কবে পাইব,"এই চিন্তা সার হইল। অপরিচিত লোক দেখিলে কিন্তু ভাবাবেগ সম্বরণ করিয়া শিষ্টের ন্যায় তাহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতেন, তাহাতে বাহিরের লোকের পক্ষে তাঁহার পরিবর্ত্তনের অবস্থা বুঝাই ভার হইত।

"লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়,
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়।
নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে রোদন ;
কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ! বলে অনুক্ষণ।
কখন কখন যেবা হুঙ্কার করয় ;
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয়।
নিদ্রা নাহিক প্রভুর কৃষ্ণানন্দ রসে ;
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে, পড়ে, বৈসে।
ভিন্ন লোক দেখিলে করেন সম্বরণ।
ঊষাকালে গঙ্গা স্নানে করেন গমন।"

চৈঃ ভাঃ

অধ্যাপনা শেষ।

গুরুর অনুরোধে ও পূর্ব্বকৃত স্বীয় অঙ্গীকার রক্ষার্থে, ইচ্ছা না থাকিলেও, নিমাই পণ্ডিত আবার অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু এবারে আর সে মন নাই, সে আসক্তি নাই ; প্রাণ,মন, আসক্তি, সকলই ভগবানে অর্পিত হইয়াছে ; সুতরাং যাহা পড়াইতে যান, কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছু আইসে না। চিরপদ্ধতি অনুসারে শিষ্যগণ হরিনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক পুঁথির ডোর খুলিতে লাগিল ; এই হরিধ্বনি নিমাইয়ের কর্ণে কতবার প্রবেশ করিয়াছে ; তখন ইহাতে কোনই ভাবান্তর হইত না। এবারে কাণের শক্তি ফিরিয়া গিয়াছে ; তাই শ্রবণমাত্রেই ভাবাবেশ ও মত্ততা ; বাহ্যজ্ঞান নাই ; যে যে প্রশ্ন করে ও যাহার যে পাঠ ব্যাখ্যা করেন, তাহাতেই হরিনামের মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

"প্রভু বলে সর্ব্বকালে সত্য কৃষ্ণনাম ;
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বই না বলয়ে আন।
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর ;
অজ ভব আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর।
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে ;
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য কথনে।
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন ;
সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণপদে ভক্তিধন।
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায় ;
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে ধায়।
করুণাসাগর কৃষ্ণ জগতজীবন ;
সেবক-বৎসল নন্দ গোপের নন্দন।
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি মতি ;
পড়িয়াও সর্ব্ব শাস্ত্র তাহার দুর্গতি।
দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণ নাম ;
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম।
এই মত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায় ;
ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায়।
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে ;
সে অধমে কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে।
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে ;
গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি মরে।
পড়িয়া শুনিয়া লোকে গেল ছার খারে ;
কৃষ্ণ মহামহোৎসব বঞ্চিত তাহারে।"

এই বলিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন যে, "যাঁহার পবিত্র সংস্পর্শে ছলনারূপিনী পূতনা উদ্ধার হইয়াছে, অঘাসুর আদি দুষ্ট পাপী সকল পরাজিত হইয়াছে, যাঁহার নামে জগৎ পবিত্র হয় ও সন্তাপিত জীবের দুঃখ দূর হয় ; যাঁহার পবিত্র নাম কীর্ত্তনে ব্রহ্মাদি দেবগণ বিহ্বল ও যাঁহার প্রভাবে মহাপাপী অজামিল পরিত্রাণ লাভ করিল ; হায়! জীব বৃথা ধন-কুল-বিদ্যামদে মত্ত হইয়া তাহার আস্বাদ বুঝিল না ; কেবল অমঙ্গলময় গীত বাদ্যে মুগ্ধ হইয়া থাকিল। ভাই সকল! আমার কথা শুন! আর কেন বৃথা সময় নষ্ট কর। অমূল্য ধন কৃষ্ণ-পদারবিন্দ ভজন করিয়া কৃতার্থ হও।" পড়ুয়াগণ অধ্যাপকের নবজীবন লাভের বিষয় কিছুই জানিত না। অকস্মাৎ তাঁহার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেল এবং পরস্পরের মুখচাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। এই সময়ে বিশ্বম্ভর বাহ্য জ্ঞান লাভ করিয়া শিষ্যদিগকে বলিলেন, "এতক্ষণ আমি কি বলিতেছিলাম?" পড়ুয়াগণ বলিয়া উঠিল—"আজ আমরা আপনার কথা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। সকল পাঠেতেই আজ আপনি কেবল কৃষ্ণনাম ব্যাখ্যা করিলেন।"

বিশ্বম্ভর ভাবব্যঞ্জক হাসি হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা! আজ তবে পুঁথি বন্ধ কর ; চল সকলে গঙ্গাস্নানে যাওয়া যাক্ ; অন্য সময় আবার পাঠ ব্যাখ্যা করা যাইবে।"

"হাসিয়া বলে গৌরচন্দ্র শুন সব ভাই,
পুঁথি বাঁধ আজি চল গঙ্গাস্নানে যাই।"

সে দিনকার পড়ান সেই পর্য্যন্ত। গঙ্গা-স্নানান্তে শিষ্যগণ চলিয়া গেলে, বিশ্বম্ভর যথাবিধি পূজা অর্চ্চনার পর মাতৃ-সন্নিধানে ভোজন করিতে বসিলেন। পুত্রের মনের অবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্য জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা নিমাই? আজ কি পুঁথি পড়াইলে ; কাহারও সঙ্গে ত কোন্দল কর নাই?" পুত্র উত্তর করিলেন,—"আজ কেবল কৃষ্ণনাম পড়ান হইল।"

"প্রভু বলে আজি পড়িলাম কৃষ্ণনাম ;
সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণধাম।"
সত্য কৃষ্ণ নাম গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন ;
সত্য সত্য কৃষ্ণের সেবক যেই জন।

সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণ ভক্তি কহে যায় ;
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়।
চণ্ডালী চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বলে ;
দ্বিজ নহে দ্বিজ যদি অসৎ পথে চলে।"

বলিতে বলিতে ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসিত হইয়া বিশ্বম্ভর জননীকে, ভগবদ্ভক্তিই মানব জীবনের সার, এই বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মা, শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ কর ; কৃষ্ণ-ভক্তের জীবনই ধন্য। কালচক্রেও কৃষ্ণ-দাসের কিছুই করিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ গর্ভবাসে জীবের যে দুর্গতি, তাহা ত জান ; এই দুঃখ হইতে নিস্তার পাওয়ার উপায় একমাত্র হরিভক্তি। অতএব হরি-পদাম্বুজ আশ্রয় কর।"

"জগতের পিতা কৃষ্ণ ; যে না ভজে বাপ ;
পিতৃ দ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ।"

পর দিন প্রাতে শচীনন্দন আবার বিদ্যামন্দিরে যাইয়া বসিলেন ; পড়ুয়াগণ আসিয়া আবার পাঠ চাহিতে লাগিল। কোন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল—"সিদ্ধবর্ণ সমন্বয় কি ?" "গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপ্রেমে বাহ্য জ্ঞান-শূন্য। উত্তর করিলেন "সকল বর্ণে নারা-য়ণই সিদ্ধ।"

শিষ্য। "কিরূপে বর্ণ সিদ্ধ হইল ?"

উত্তর। "শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিপাত হেতু।"

শিষ্য। "আপনি কি বলিতেছেন, বুঝিতে পারিলাম না"।

উত্তর। "সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ কর ; আদি, মধ্য, অন্ত্যে, সর্ব্বত্রে শ্রীকৃষ্ণ ভজনই বুঝা যাইতেছে।"

ঈদৃশ প্রলাপবাক্য শুনিয়া শিষ্যগণ হাসিতে লাগিল ও পরস্পর বলা বলি করিতে লাগিল যে, "পণ্ডিতের বিষম বায়ু রোগ উপস্থিত, নৈলে এমন প্রলাপ বকিবেন কেন ?" হায় রে! সংসার তুই না পারিস এমন কাজ নাই। তোর চক্ষে সোণা রাং, আর রাং সোণা। তা না হইলে কি আর দেবনন্দন ঈশার ক্রুশে প্রাণ যায় ? হরি-দাস ঠাকুর বাইশ বাজারে প্রহারিত হন ? শৃগাল কুকুরের ন্যায় শাক্যকে গ্রামে গ্রামে তাড়াইয়া লইয়া বেড়ায় এবং গৌরা-ঙ্গকে পাগল সাজায় ? সাবাস্ তোর বুদ্ধি। তোর বুদ্ধি তোতেই থাকুক ; ভগবান্ উহা হইতে আমাদের দূরে রাখুন। এই সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত করিয়া গৌরের শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—"পণ্ডিত মহাশয় ! আপনি আজ কি আবল তাবল বকিতেছেন ? আমরা শাস্ত্রার্থ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। "গৌরাঙ্গ একটু অপ্রতিভের ন্যায় উত্তর করিলেন "কেন আমিতো ঠিক ব্যাখ্যা করিতেছি ; তবে তোমরা যদি বুঝিতে না পার, এখন থাকুক। বিকালে আসিও, ইহার মধ্যে আমিও পুঁথি দেখিয়া ঠিক করিয়া রাখিব ; তখন ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শিষ্যগণ পুঁথিতে ডোর দিয়া উঠিয়া গেল, এবং দলবদ্ধ হইয়া বিশ্বম্ভরের অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট যাইয়া আদ্যো-পান্ত নিবেদন করিয়া উপদেশ চাহিল।

"সর্ব্ব শিষ্য গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে ;
কহিলেন যত সব ঠাকুর বাখানে।
এবে যত বাখানেন নিমাই পণ্ডিত ;
শব্দ সঙ্গে বাখানেন কৃষ্ণের চরিত।
প্রতি সূত্রের শব্দ অর্থ একত্র করিয়া,
প্রতিদিন কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন বসিয়া।
এবে তাঁর বুঝিবারে না পারি চরিত ;
কি করিব আমি সববল হে পণ্ডিত।"

এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গঙ্গাদাস ওঝা ঈষৎ হাস্য করতঃ বলিলেন, "বিকালে তোমরা বিশ্বম্ভরকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিও, আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব, যেন পূর্ব্বের ন্যায় ভাল করিয়া অধ্যাপনা করেন।" ছাত্রেরা নিমাইকে গুরুর ইচ্ছা জানাইলে, তিনি অপরাহ্ণে গঙ্গাদাসের গৃহে আসিয়া অধ্যাপকের চরণবন্দনা করিলেন। গঙ্গাদাস সাদাসিদে লোক; সংসারে থাকিয়া শাস্ত্রানুসারে গৃহস্থের কর্ত্তব্য সকল সাধন করিতেন; এবং তাহার মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানও ছিল, না ছিল, এমন নয়। কিন্তু নিমাইকে যে সাপে দংশন করিয়াছে, তাহার তিনি ওঝা ছিলেন না; সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি খুলে নাই; সুতরাং যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। সংসারের মুরুব্বিগণ চিরকালই ঐরূপ উপদেশ দিয়া আসিতেছে; তিনি বলিলেন:—

"—বাপ বিশ্বম্ভর শুন বাক্য!
ব্রাহ্মণের অধ্যাপনা অল্প নহে ভাগ্য।
মাতামহ যার চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর;
বাপ যার জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
"উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার;
তুমিও পরম যোগ্য ব্যাখ্যাতে টীকার।
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্ত হয়;
বাপ মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয়?
ইহা জানি ভাল মতে কর অধ্যয়ন;
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ দ্বিজ জানিব কেমনে?
ইহা জানি কৃষ্ণ বলি কর অধ্যয়নে।
ভাল মতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও;
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও॥"

গুরুর উত্তেজনায় ও উপদেশে আবার একবার বিশ্বম্ভরের পূর্ব্বভাব উদয় হইল। বিদ্যাগৌরবে নবজীবনের প্রেমজ্যোতি একবার মাত্র আচ্ছন্ন হইল; কালো মেঘে প্রাতঃসূর্য্য কিরণ একবার ঢাকা পড়িল। তিনি অহঙ্কারব্যঞ্জক বিনয়ের সঙ্গে উত্তর করিলেন "দেব! আপনার শ্রীচরণকৃপায় এই নবদ্বীপে এমন পণ্ডিত দেখি না, যে, আমার সঙ্গে বিচারে আঁটিয়া উঠিবে; আমি যে ব্যাখ্যা করিব, দেখি দেখি কে আসিয়া তাহা দূষিতে পারে? আপনার আজ্ঞায় শিষ্যবৃন্দ লইয়া এই আমি অধ্যাপনায় চলিলাম।" এই বলিয়া গুরুর পদধূলি লইয়া নিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যাপনা করিতে চলিলেন। গুরুর আনন্দের সীমা রহিল না; শিষ্যবৃন্দ উৎসাহ-ধ্বনিতে চারি দিক পূর্ণ করিল। গঙ্গাদাস! সাবধান, এ পড়ান তো পড়ান নয়; এ যে নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপশিখার আলো, অস্তমিত সূর্য্যের প্রখর কিরণ। যে হৃদয় অনন্তের দিকে ছুটিয়াছে, তোমার সাধ্য কি যে, তাহার আবেগ ফিরাও। ভাই শিষ্য বৃন্দ! তোমাদেরও বলি, এই বার মরণ খাওয়া খাইয়া লও; যত দূর পার পাঠ চাহিয়া লও; আর কিন্তু হবে না।

শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া গৌরচন্দ্র পূর্ব্বের ন্যায় গর্ব্বের সহিত পড়াইতে লাগিলেন। ছাত্রদের আনন্দের সীমা নাই; যাহার যত সন্দেহ ছিল ও নূতন পাঠ লওয়ার প্রয়োজন হইল, সকলই সম্পূর্ণ হইল। নিমাইয়ের মুখশ্রীতে পূর্ব্বের ঔদ্ধত্য আবার দেখা দিল; ছাত্রেরা মনে করিল, অধ্যাপকের বায়ুরোগ আরোগ্য হইয়াছে। সকলের পাঠ দেওয়া সমাপ্ত হইলে, গৌরচন্দ্র প্রচলিত বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতে

লাগিলেন ;—

"প্রভু বলে সন্ধিকার্য্য জ্ঞান নাহি যার ;
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার।
শব্দ জ্ঞান নাহি যার সে তর্ক বাখানে ;
আমারে তো প্রবোধিতে নারে কোন জনে
যে আমি খণ্ডন করি, যে করি স্থাপন ;
দেখি তাহা অন্যথা করুক কোন জন।"

ও কিও! বিদ্যাগৌরবের মধ্যে ও কি হলো! সর্ব্বনাশ! নিমাই পণ্ডিত মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দেন কেন? শিষ্যেরা অবাক্ হইয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া এদিক্ ওদিক্ দেখিতে লাগিল। অবশেষে মূর্চ্ছার কারণ বাহির হইয়া পড়িল। যে দরজায় বসিয়া নিমাই পণ্ডিত পড়াইতেছিলেন, রাস্তার অপর পার্শ্বে আর এক দরজায় রত্নগর্ভ আচার্য্য নামে একজন শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ একাকী বসিয়া সুমধুরস্বরে ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার উচ্চারিত ভক্তিরসাত্মক শ্লোকের আভাস বিশ্বম্ভরের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল। আর যাবে কোথায়! প্রচ্ছন্ন অগ্নি উদ্দীপিত হইয়া উঠিল ; কৃপাবাতাসে দম্ভের মেঘ কাটিয়া গেল ; আর মহাভাবে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। নিমাই! তুমি যে প্রভুর ফাঁদে পড়িয়াছ,আর কি তোমার স্বাধীনতা আছে? বৃথা অধ্যাপনায় চেষ্টা। যা করিতে প্রেরিত হইয়াছ, তাহা না করিয়া কি তুমি থাকিতে পার? ধন্য প্রভু! তোমার লীলা বুঝে কে? মূর্চ্ছাভঙ্গে গৌরচন্দ্র কতক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণসুখসাগরে নিমগ্ন থাকিলেন ; রত্নগর্ভও দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত শ্লোকাবৃত্তি করিতে লাগিল। পুলক, অশ্রু, কম্পে গৌরাঙ্গ বিভোর হইয়া গেলেন। পথে রথের লোক জুটিল। একটা মহাব্যাপার হইয়া গেল। বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া গৌরচন্দ্র শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি কি চাঞ্চল্য করিলাম?" তাহারা উত্তর না করায়,তিনি সকল বুঝিলেন ও তাহাদিগকে লইয়া ভ্রমণার্থে জাহ্ণবী তীরে চলিলেন।

বার বার তিন বার। পড়ুয়াগণ আজ্ দেখিয়াই পড়া ছাড়িবে। প্রাতে তাহারা আসিলে গৌরচন্দ্র পড়াইতে বসিলেন। পূর্ব্বদিনের ভাবে তখনও বিভোর। ইহার মধ্যে এক জন ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল"ধাতুর সংজ্ঞা কি?" নিমাই উত্তর করিলেন "হরি শক্তিতেই ধাতু প্রকাশিত হয়।"

"পড়ুয়া সকল বলে ধাতু সংজ্ঞাকার?
প্রভু বলেন হরিশক্তি ধাতুর প্রচার।
ধাতু সূত্র বাখানিয়ে শুন সর্ব্ব জন ;
দেখি কার শক্তি আছে করুক খণ্ডন।
যত দেখ রাজা প্রজা দিব্য কলেবর ;
অনেক শোভিত গন্ধ চন্দনে সুন্দর।

*　　*　　*

ধাতু গেলে শুন তার যে অবস্থা হয়।
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া ;
কেহ হয় ভস্ম কারে এড়েন গাড়িয়া।
সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বসে হরিশক্তি ;
তাহারে যে করি স্নেহ, তাহারে যে ভক্তি।
বিদ্যাবান অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দিয়া।
এবে যারে নমস্কার করি মান্য জ্ঞান ;
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান।
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহাসুখে ;
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেয় মুখে।
এমন পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি ;
হেন হরি ভাই সব কর দৃঢ় ভক্তি।"

বলিতে বলিতে উৎসাহে প্রাণ নাচিয়া উঠিল ; তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া দশমুখে

ভগবানের মহিমা বর্ণন করিতেলাগিলেন, এবং ব্যাকুলতা ও আগ্রহ সহকারে শিষ্যদিগকে হরিপাদপদ্মপূজা করিতে উপদেশ দিলেন। অল্পক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কিরূপে ধাতু ব্যাখ্যা করিলাম ? শিষ্যগণ উত্তর করিল, যাহা "বলিলেন, তাহার একটুও মিথ্যা নয়। কিন্তু আমাদের যে উদ্দেশে পড়া, তাহার অর্থ সে নয়।"

নিমাই। "আচ্ছা! তোমরা কি মনে কর, আমার বায়ুরোগ হইয়াছে ?"

শিষ্য। "এক হরিভক্তি ও হরিনাম ভিন্ন আপনার মুখে আসিতেছে না। ইহাতে যা মনে করুন।" এই বলিয়া গয়া হইতে আগমনের পর তাঁহার যে যে ভাব তাহারা দেখিয়াছিল, সকল বিবৃত করিল। গৌরচন্দ্র শিষ্যদিগের কথা শুনিয়া বলিলেন "তোমরা যাহা বলিতেছ, সকলই সত্য। আমি দিবা রজনী সর্ব্বত্রে কেবল শ্রীহরির বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতেছি; সমস্ত জগতে তাহার পবিত্র মন্দির লক্ষিত হইতেছে; শ্রবণ-বিবরেও তাঁহার নাম ভিন্ন আর কিছু প্রবেশ করে না। সেই জন্য সকল কথাতেই হরিনাম বাহির হইয়া যায়। এ কথা অন্যত্রে বলিলে কে বিশ্বাস করিবে ? তোমাদের কাছে না বলিলে নয়, তাই বলিলাম। অতএব ভাই সকল! আমাকে ক্ষমা কর; আমা হইতে আর অধ্যাপনা চলিবে না। তোমরা অন্যত্র যাইয়া আপন আপন অভীষ্টসিদ্ধ কর।" এই বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে পুস্তকে ডোর দিলেন।

"তোমা সবা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার।
তোমা সবাকার যার স্থানে চিত্ত লয়;
সে স্থানে পড়হ আমি দিলাম বিদায়।"

শিষ্যগণ তখন গৌরের অবস্থা কিছু বুঝিতে পারিল এবং সজলনয়নে বলিতে লাগিল "পণ্ডিত! আমরা আপনার কাছে যাহা পড়িলাম তাহাই ভাল; অন্য ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিতে ইচ্ছা নাই, আর পড়িবারও খেদ নাই।" তাহাতে বিশ্বম্ভর উত্তর করিলেন "যদি তোমাদের ইহাই অভিলাষ, তবে আর পড়ায় কাজ নাই; এসো সকলে একত্রে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করি। তাঁহার কৃপায় আমাদের সকল শাস্ত্রের জ্ঞানস্ফূর্ত্তি হইবে।"

"দিব সে কে যদি আমি হই হরিদাস,
তবে সিদ্ধ হউক তো সবার অভিলাষ।
তোমরা সকলে লও হরির শরণ;
হরিনামে পূর্ণ হউক সবার বদন।
যে পড়িলে সেই ভাল আর কার্য্য নাই
সবে মিলি কৃষ্ণ ভজিবাও এক ঠাঁই।
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফূরুক সবার;
তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার।"

শিষ্যগণও তদনুরূপ আচরণ করিল। পাঠক মহাশয় এ অধ্যায়ে যে চিত্রটী দেখিলেন, তাহা কি অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় ? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের কোন সিদ্ধান্ত নাই; আপনারা স্ব স্ব আলোকে মীমাংসা স্থির করিবেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম।

"সবাই এক মায়ের ছেলে কারে দেব ছোটে ফেলে
ভাই বলে সকলেরে হৃদয় মাঝে দিব ঠাঁই।"

চিরঞ্জীব শর্ম্মা।

পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত প্রকার ধর্ম্ম মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ সংগ্রহ কিছু সোজা কথা নয়। এতদ্ভিন্ন আরো কত মত অপ্রচারিত রহিয়াছে। আকাশের নক্ষত্র এবং পাতালের বালুরাশির পরিমাণ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু মানব সমাজের বিভিন্ন ধর্ম্ম মতের পরিমাণ হয় না। সংখ্যাতীত ধর্ম্মসম্প্রদায় এ জগতে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে,একথা বলিলেও কিছু অত্যুক্তি হয় না। এত বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মমতের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও, সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই আশা করেন যে, তাহাদের ধর্ম্ম মতই জগতের ভাবী ধর্ম্মমত হইবে। কথাটা আরো একটু স্পষ্ট করিয়া লিখি। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিশ্বাসীগণ মনে করেন, জগতের সকলেই খ্রীষ্টীয়ান হইবে, মুসলমানেরা মনে করেন, জগতের ভাবী ধর্ম্ম ইস্‌লাম ধর্ম্ম। হিন্দু মনে করেন, হিন্দু ধর্ম্মই জগতের সার ধর্ম্ম, বৌদ্ধ মনে করেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মই এক মাত্র সত্য ধর্ম্ম। যে যে মত মানে, সেই মতই জগতের ভাবী মত হইবে, স্বতঃ এবং পরত ইহাই তাহার প্রাণগত বিশ্বাস। জগতে যখন যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত বা প্রচারিত হইয়াছে, তখন সেই ধর্ম্মকেই সত্য ধর্ম্ম নামে অভিহত করা হইয়াছে। মিথ্যা জানিয়া কেহ কোন ধর্ম্মমত মানে না। সুতরাং সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট আপনাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতই সত্য ধর্ম্ম বলিয়া ধারণা থাকা সম্ভব। অতএব প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে,সকল ধর্ম্মই লোক বিশেষের নিকট সত্য ধর্ম্ম। সকল ধর্ম্মই যদি সত্য ধর্ম্ম হয়, তবে কোন্ ধর্ম্ম জগতের ভাবী ধর্ম্ম? কোন্ মত সকল মতকে উপেক্ষা বা পরাস্ত করিয়া জগতে স্থায়িত্ব লাভ করিবে? একথার উত্তর দেওয়া বড় সোজা নয়।

মানুষ বড়ই কল্পনার উপাসক। কল্পনার উপর পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত। এই কল্পনাটা পৃথিবীতে অনেক স্থানে বিশ্বাস নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। যুক্তি তর্ক—এ সকল যা কিছু বল, এ সকল অধিকাংশ স্থলেই কল্পনার সহচর। তুমি খুব যুক্তি দেখাইয়া বলিতেছ, পরকাল আছে; আর এক জন ততোধিক যুক্তি দেখাইয়া বলিতেছেন যে,পরকাল নাই। এক জন খুব যুক্তি দেখাইয়া বলিতেছেন, ঈশ্বর আছেন, আর একজন ততোধিক যুক্তি সহকারে বলিতেছেন যে—ঈশ্বর নাই। একজন খুব যুক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করিতেছেন, পূজা বা উপাসনার আবশ্যকতা আছে, আর একজন ততোধিক যুক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করিতেছেন যে, পূজার প্রয়োজন মোটেই নাই। কার কথা সত্য বলত? যুক্তি উভয়েরই সমান তেজপূর্ণ, কেহ কাহাকে হটাইতে পারেন না। নিজের মনকে প্রবোধ দিবার জন্য, যিনি যাহাই মনে ধরিয়া লউন

না কেন, যুক্তি তর্কতে লোকদিগকে হটান বড়ই শক্ত। আমি মনে করি, তুমি হটিতেছ, তুমি মনে করিতেছ, আমি হটিতেছি। সচরাচর এইরূপেই হইয়া থাকে। বাস্তবিক কেহই হটিবার নয়, কেহই হটে না। অন্ততঃ লোকের বিশ্বাস এইরূপ। আপন মত লইয়াই সকলে বসিয়া থাকে। সে মতটা কি? অধিকাংশ স্থলেই আপনার কল্পনা-প্রসূত কিছু। কল্পনা ভিন্ন সারবস্তুও কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা অতি বিরল। অধিকাংশ মানুষই কল্পনাকে লইয়া জীবিত। প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া, কষ্টি পাথরে কষিয়া লইয়া ধর্ম্মমত গ্রহণ করে, অতি অল্প লোকে। ভাসা ভাসা ভাব, ভাসাভাসা ধর্ম্ম মত। কল্পনার ভিত্তি, বালির ভিত্তি। কল্পনা লইয়া মানুষ জন্মিতেছে, কল্পনার সেবা করিয়াই মরিতেছে। খাটী ধর্ম্ম পৃথিবীতে বড়ই বিরল।

কল্পনার ধর্ম্মও যাহা, পৌত্তলিকতাও তাহা। কল্পনার ধর্ম্মের আর এক নাম পৌত্তলিকতা। জগতের প্রথম অবস্থায় অধিকাংশ লোকই পৌত্তলিক ছিল। পৌত্তলিকতা বা কল্পনার ধর্ম্ম লইয়া মানুষ অনন্ত জীবনের পথে যাইতে পারে না, সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে ভয়ানক ধর্ম্ম-সংগ্রাম উপস্থিত হয়। মানুষের প্রাণের ভিতরে যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, সমাজে কোন না কোন সময়ে তাহারই ফুটন্ত ছবি প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসের কথা যাহা শুনা যায়, সে সকল আর কিছুই নয়, সে সকল কেবল সত্যের সহিত কল্পনার সংগ্রামের ফুটন্ত কাহিনী মাত্র। সত্যের সহিত অসত্যের সংগ্রাম চিরকাল চলিতেছে, আজিও তাহার বিরাম হইল না। সার পাইবার জন্য মানুষ কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত করিয়াছে, কিন্তু আজিও সারধর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইল না। আজিও কল্পনার পুজাই অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে। পৌত্তলিকতা যে পৃথিবী হইতে কবে যাইবে, কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন না।

নিরাকার একেশ্বরবাদ কি পৃথিবীতে আর কখনও প্রচারিত হয় নাই? হইবে না কেন? যথেষ্ট হইয়াছে। খ্রীষ্ট ধর্ম্মই বল, আর ইস্‌লাম ধর্ম্মই বল, উপনিষদের ধর্ম্মই বল, আর শিক ধর্ম্মই বল—এসকলই খাটী একেশ্বরবাদে পরিপূর্ণ। কিন্তু এ সকল ধর্ম্মের অবস্থা আজ এরূপ পঙ্কিলময় কেন? কলঙ্কিত মানুষের হৃদয়ে স্বর্গের পবিত্র জিনিষ কেমনে খাটী থাকিবে? মানুষের ব্যক্তিগত কল্পনা এই সকল ধর্ম্মের মধ্য স্থান পাইয়া সারকে কত মলিন করিয়া ফেলিতেছে, একবার চিন্তার চক্ষে চাহিয়া দেখ। সত্যে অসত্য, সারে অসার মিশ্রিত হইয়া কত কদাকার ধারণ করিয়াছে, ভাবিলেও কষ্ট হয়! কল্পনার এতই আধিপত্য।

আবার একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইতেছে, আবার নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু এখানেও কল্পনা আসিয়া সত্যের স্থান অধিকার করিতেছে। তাই আবার দলাদলির সৃষ্টি হইতেছে। দল ভাঙ্গিতে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদয় তাহা আবার নূতন নূতন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে! দলের মূল কোথায়? কেবল ব্যক্তিগত ভাবে। ব্যক্তিগত ভাব কি? না অনেক স্থলে কল্পনার সমষ্টি। কল্পনাটা কি? নামোহ; আসক্তি। ব্যক্তিত্বপ্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছাতেই পৃথিবীতে দলের অভ্যুদয়। এক ঈশ্বর, সকল শাস্ত্রে বলে; অথচ পৌত্তলিকতা জগতে থাকে কেন?—এই জন্য যে, ব্যক্তির

প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা ক্রমাগত চলিতেছে। যার একটু ক্ষমতা, যার একটু প্রতিভা, সেই অন্যকে দলস্থ করিয়া আপনার মতে গ্রাস করিতে চায়। আপনার মত প্রচারের চেষ্টা ভাল কি মন্দ, সে কথা এখানে তুলিব না। কিন্তু একথা অবশ্যই বলিব, আপন মতে না চলিলে অন্যকে অপদার্থ ভাবা বড়ই অন্যায়। এই অন্যায় হইতেই পৃথিবীতে দলাদলির সৃষ্টি হইতেছে। মানুষের প্রাণে ভগবান যে সত্য প্রচার করেন, সে জিনিষ অনাবিল, অতি পবিত্র, অতি সুন্দর, অতি মনোহর। কিন্তু সেই পবিত্র স্বর্গের কুসুমে সংসারের মোহ ও আসক্তিরূপ কল্পনাকীট প্রবেশ করিয়া তাহাকে গোপনে গোপনে মলিন করে। জগতে মানুষের দ্বারা যে সত্য প্রচারিত হয়, তাহা সেই মলিনতা মিশ্রিত জিনিষ। অর্থাৎ স্বর্গের পবিত্র জিনিসের সহিত মানুষ আপন স্বাধীনতা-অর্জ্জিত অনেক নরকের পূতিগন্ধময় কালিমা মিশ্রিত করিয়া জগতে ঢালে। এই উভয়ের সংমিশ্রনে ধর্ম্মমত নূতন আকার ধারণ করিয়া জগতে শোভা পায়। এক নিরাকার চিৎস্বরূপই যদি ধর্ম্মের প্রস্রবণ, তবে ধর্ম্মমত এত বিভিন্ন প্রকার কেন? তাহার কারণ এই, সত্য জিনিষ অসত্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া কিছু নূতন হয়। এই নূতন কীর্ত্তি যখন জগতে যায়, তখন মনের গতির বিভিন্নতানুসারে তাহা জগতে বিভিন্ন রূপ প্রতীয়মান হয়। অথবা একই জিনিষ ভিন্ন২ পাত্রের দোষে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখায়। খাটী ধর্ম্মমতের সহিত ব্যক্তিগত মত প্রচারের যদি এত চেষ্টা না হইত, তবে পৃথিবীতে এত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইতে হইত কি না, সন্দেহ। স্বর্গের ধর্ম্মমতের সহিত ব্যক্তিগত মত প্রচারিত হওয়াতে জগতের যে অনিষ্ট হইয়াছে, একথা বাধ্য হইয়া আমাদিগকে বলিতে হইতেছে। ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিগত প্রভুত্ব প্রচারের চেষ্টাতে, খাটী জিনিষের সহিত অনেকস্থলে ব্যক্তিগত দূষিত মত বা কল্পনার খেয়াল মিশ্রিত হইয়া অন্য ব্যক্তির বিষম অনিষ্ট করিতেছে। এ কথা অনেকেই জানেন, মানুষ অন্যের স্কন্ধে নির্ভর করিয়া চলিতে সর্ব্বদাই লালায়িত। বড় বড় লোকদিগের প্রচারিত মত অনেকেই শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছে। এইরূপে গুরুবাদ বা অবতারবাদের সৃষ্টি হইতেছে। মানুষ আপনার চিন্তা ও বিবেকের কথায় জলাঞ্জলি দিয়া, অপরের প্রদর্শিত পথে অবনত মস্তকে চলিতেছে। এই হইতেই দলাদলি ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতেছে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শেষে কত ঝগড়া বিবাদ চলিতেছে। সে সকল কথা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

এইরূপে দেখিতেছি, ক্রমে ক্রমে পৃথিবী খাটী ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে আসিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। নানা মত, নানা ভাব, নানা প্রণালী, নানা অনুষ্ঠান,—কোন্‌টা মানি, কোন্‌টাকে উপেক্ষা করি, বল ত? যাঁহারা সত্যের সেবক হইতে চান, তাহারা এইরূপ বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন। জগতে বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্বাসহীনতা, নানা প্রকার সন্দেহবাদ মানুষকে বিষম আক্রমণ করিতেছে। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগের প্রাণ সদা সশঙ্কিত, বুঝি বা ধর্ম্ম আর জগতে টিকে না। ধর্ম্ম-প্রচারকেরা হতবুদ্ধি হইয়া এই প্রবল স্রোতের

সম্মুখে আপন শক্তির লঘুতা অনুভব করিয়া স্থিরভাবে সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন! এই আন্দোলনের ভিতরে আবার কত চটুল ব্যক্তি গোপনে গোপনে নূতন ধর্ম্মমত দ্বারা নূতন দল গঠনে চেষ্টা পাইতেছেন! হা বুদ্ধি, তোমার সীমা কোথায়? দলে দলে পৃথিবী উচ্ছন্ন গিয়াছে, আবার দল!! পৃথিবীতে এক বিষম হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। জগত সচকিত হইয়া উঠিয়াছেন। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে সার ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা যাহা ভাবিয়াছি, নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, পৃথিবীর গতি ক্রমাগত স্বাতন্ত্র্যের দিকে চলিতেছে। পৃথিবীতে দলের পরে ক্রমাগত যে দলবৃদ্ধি হইতেছে, ইহাতেও প্রমাণ করে যে, স্বাতন্ত্র্যই জগতের লক্ষ্য। অনন্ত প্রকৃতির সকলই বিভিন্ন, একথা আমরা অনেক বার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। সকলই পৃথক পৃথক, ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ভিন্ন ভিন্ন রূপ হওয়াতেই সকলের যেন সৌন্দর্য্য ও বিশেষত্ব রক্ষা পায়। একটী গোলাপ তুমি দেখ একরূপ, আমি দেখি অন্যরূপ। তোমার ভাব, তোমার দেখা আমা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সকলই পৃথক পৃথক। বিভিন্ন বিভিন্ন শোভায়, বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকৃতিতে, সেই এক অনাদি অনন্তের অনন্ত সৌন্দর্য্য এবং অনন্ত রূপ প্রতিফলিত হইতেছে। পৃথিবীর কোন দুটী বস্তু একরূপ নয়। সকলের ভিতরেই যেন কিছু কিছু বিশেষত্ব রহিয়াছে। একটী ফুল অন্য ফুল হইতে বিভিন্ন, একটী মানুষ অন্য মানুষ হইতে বিভিন্ন। প্রতি বস্তুতে, প্রতি কীট পতঙ্গে কত আকাশপাতাল বিভিন্ন রূপ শোভা পাইতেছে। খুব ধীর ও সূক্ষ্ম ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্থির রূপে ধারণা হয়, ভগবানের এই যেন বিধান যে, প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক পথে হাটিবে, প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক চিন্তার পথ ধরিবে। এই যে দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতা চলিতেছে, অনুসন্ধান কর, দেখিবে, ইহার ভিতরের লোকদিগের ধর্ম্ম মতেও কিছু বিভিন্নতা আছেই—কিছু কিছু পার্থক্য আছেই। দুই জনের সকল মত একরূপ নয়। ইহার কারণ কি? মানুষ মানুষের সহিত মিলিয়া একমত হইয়া যাইবে, ইহা যেন বিধাতার ইচ্ছা নয়। বিধাতা প্রত্যেকের ভিতরেই যেন কিছু নূতনত্ব প্রতিনিয়ত ঢালিয়া দিতেছেন। প্রতিনিয়তই যেন বৈষম্যের ভেরী বাজিতেছে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমাদের স্থির বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, পৃথিবীতে কোন একটা ধর্ম্ম মত চিরকাল স্থায়িত্ব লাভ করিবে না, সময়ের গতিতে সকলই নূতন হইবে। অনন্ত জড় প্রকৃতির যেমন অনন্ত ধর্ম্ম, অনন্ত মানুষের তেমনি অনন্ত ধর্ম্মমত। সকলই ক্রমবিকাশের অধীন। এই যে দলাদলি, বোধ হয়, ইহাও থাকিবে না, অনন্তের তরঙ্গাঘাতে অনন্তে যাইয়া বিলীন হইবে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম উঠিয়া যাইবে এবং বিধাতার অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্তস্বরূপে দীক্ষিত হইয়া সেই অনন্তের দিকে সকলে ধাবিত হইবে। কিন্তু সে দিন কবে আসিবে, কে জানে?

এইরূপই যদি হয়, তবে কি সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমত প্রচারের আর প্রয়োজন নাই? আছে,

আবার নাইও। আছে, এই জন্য বলি, প্রকৃতির বিনাশ সাধন করিবার আমরা পক্ষপাতী নই। প্রকৃতির ভিতর দিয়া বিধাতার যে খাটী জিনিষ বাহির হয়, তাহা হউক, বাধা দিতে বলি না। কিন্তু ব্যক্তিত্ব প্রচার না হয়। আবার নাইও, এই জন্য বলি, ব্যক্তিত্ব ছাড়িয়া স্বর্গের মত প্রচার করা বড় কঠিন, অতি অল্প লোকেই তাহা পারে। বিশেষত, লোক ধরিয়া দল বাঁধিবার জন্য প্রচার করিলে কিছুই পুণ্য লাভ হয় না। লোক আসুক বা না আসুক, সেদিকে মানুষের লক্ষ্য রাখা উচিত নয় ; লক্ষ্য এই— "বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" তিনি প্রচার করিতে বলেন, কর ; কিন্তু অন্য কোন কারণ সন্মুখে রাখিও না। তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া যে চলে, ফলাফলের দিকে তাঁর দৃষ্টি যায় না। আমি দল করিব? আমি বাহাদুরী দেখাইব—ছি, এ নরকের কথা দূর হউক। তাঁর যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হউক। বিশ্বাসী ব্যক্তির এইরূপ উক্তি। তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, জগতকে বিশ্বাসের পথে রাখিবেন, কেহ অবিশ্বাস-বিষ দিয়া প্রকৃতিকে জর্জ্জরিত করিতে পারিবে না। আর তাঁর যদি ইচ্ছা হয়, সকলকে অবিশ্বাসী করিয়া রাখিবেন, কাহারও শক্তি নাই, জগৎকে বিশ্বাসের পথে স্থায়ী করিয়া রাখে? প্রকৃত ধর্ম্মই এ নয়। তর্ক যুক্তি করিয়া যে ধর্ম্ম বিশ্বাস উৎপন্ন, তাহাই কল্পনার ধর্ম্ম। তিনি আপনি যদি মানুষের প্রাণে প্রকাশিত না হন, কেহ তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারে না। বিধাতার কৃপায় বিধাতাকে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া তাঁর প্রদর্শিত পথে চলাই প্রকৃত ধর্ম্ম। প্রকৃত ধর্ম্মে সমাজ নাই, দল নাই, ঝগড়া নাই, বিবাদ নাই, কিছুই নাই। আছেন,—প্রত্যক্ষ জীবন্তভাবে কেবল এক অবিনাশী সত্য পুরুষ। তাঁতেই সঞ্জীবিত, তাঁতেই নিমগ্ন, বিশ্বাসী সন্তান। তিনি উঠিতে বলিলে, ভক্ত উঠেন, তিনি বসিতে বলিলে, ভক্ত বসেন। তিনি বিপদে ফেলিলে, তাহাই ভক্তের নিকট স্নেহের আশীর্ব্বাদ। তাঁর কথা যে শুনে নাই, তাঁর সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, সেই ব্যক্তিই অন্যের প্রদর্শিত কল্পিত ধর্ম্মপথে চলিতে চায়, চলিতে পারে ; কিন্তু যে তাঁকে দেখিয়াছে, তাঁকে যে প্রাণে পাইয়াছে, সে আর কাহারও কথা শুনিয়া, বা কল্পনা লইয়া জীবন পথে চলিতে চায় না। সে প্রতিনিয়ত কেবল একের ইচ্ছাতেই ডুবিয়া থাকিতে চায়। সে আর কিছু জানে না, আর কিছু বুঝে না। বিধাতার ইচ্ছাকেই সে জয়যুক্ত হইতে দেখিতে চায়।

কিন্তু তাঁকে সকলে কিছু একভাবে পাইবে না। অনন্তরূপিনীর সকল স্বরূপ একজনে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে কি না, সন্দেহ। তিনি যাহাকে যা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহাই হইতে হইবে,—কাহাকে ভক্ত, তাহাকে জ্ঞানী, কাহাকে কর্ম্মী—কাহাকে সংসারী, কাহাকে সন্ন্যাসী ইত্যাদি। তিনি কাহাকে কি করিতেছেন, আমরা জানি না। সুতরাং কে তাঁর প্রিয় সন্তান, কে নয়, সে বিচারও আমরা করিতে পারি না। যাকে আমরা ভয়ানক পাপী বলিয়া ঘৃণা করিতেছি, সে যে বিধাতার কৃপাস্রোতে পড়ে নাই, একথা আমরা মনে করিতে পারি না। সুতরাং তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখা উচিত নয়। লীলাময়ের অনন্ত লীলা, মানুষ কি বুঝিবে? অমুক বড়, অমুক

ছোট, অমুক পুণ্যাত্মা, অমুক পাপী, এ সকল গণনা না করিয়া,আমাকে তিনি যে আদেশ করেন, তদনুসারে চলাই উচিত। তাঁর আশীর্ব্বাদ সকলের প্রতি। আমাকে উদ্ধার করিতেছেন, তোমাকে মারিয়া ফেলিবেন? না—এ বিশ্বাস আমরা রাখি না। তিনি সকলকেই উদ্ধার করিবেন। তিনি সকলকেই কৃপার হস্তে রক্ষা করিতেছেন। মোট কথা, তাঁর হাতের পুতুল হইতে না পারিলে, কিছুতেই মঙ্গল নাই। তাঁকে কে কি ভাবে পূজা করিবে, কে কিরূপে দেখিবে, আমরা কিছুই জানি না। তিনি যাহার নিকট যেরূপে প্রকাশিত, মানুষ সেই রূপেরই পূজা করুক। অন্যথা করিলেই কল্পনার পূজা হয়। সাম্প্রদায়িকতা জগতের লক্ষ্য নয়, দলাদলিও লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য—এই অনন্ত স্বাতন্ত্র্য, এই অনন্ত দেবতার অনন্ত বিভিন্নস্বরূপে অনন্ত লোকমণ্ডলীর দীক্ষা। এই অনন্ত প্রকৃতি ভাঙ্গিয়া যিনি একত্ব সাধনে যত্নবান, তিনি যে বিধাতার লীলা-মাহাত্ম্যের কি ভয়ানক অনিষ্টকারী জীব, আজ জগত না বুঝিলেও, এক দিন তাহা বুঝিবে। এই অনন্ত স্বাতন্ত্র্যের ভিতরেই এক-চিন্ময়ত্ব বিদ্যমান। মানুষ যখন তাঁতে নিমগ্ন হয়, তখন মানুষ সকল ঘটেই তাঁকে দেখে, অন্য কিছুই দেখে না। একমেবাদ্বিতীয়ম নামের গভীর সত্য তখনই উপলব্ধি হয়। তখনই মানুষ কল্পনা ছাড়িয়া,উপধর্ম্ম ছাড়িয়া,একের কোলে মাথা রাখিয়া অটল বিশ্বাসী হয়। তখন আর কেহকেই পর বলিয়া মনে হয় না তখন সকলকেই একের হাতের জিনিস জানিয়া সে মধুর ভাবে প্রেমালিঙ্গন করে। তখনই একতা এবং সাম্যের ভেরী প্রাণে বাজিয়া উঠে, তখনই জাতিভেদ উঠিয়া যায়। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন পৌত্তলিকতা, উপধর্ম্ম,কল্পনার রাজত্ব এবং দলাদলি, কাটাকাটী, রক্তারক্তি থাকিবেই থাকিবে। হাজার চেষ্টা করিলেও জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে না।

আমরা এই যে উদার জীবন্ত ধর্ম্ম মতের কথা বলিতেছি, ইহাকে যে কথায় অভিহিত করিতে চাও, কর, আপত্তি নাই। আমরা ইহাকেই অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া বুঝি। ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম,—দলাদলির ধর্ম্ম নয়। দল ভাঙ্গিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি। দল ভাঙ্গিবার জন্য যে ধর্ম্মের অভ্যুদয়, স্বতন্ত্র দলে পরিণত হওয়া তাহার পক্ষে উচিত কি না, এই এখন প্রশ্ন। আমাদের বিবেচনায়, উচিত নয়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ভাবে, যে রূপে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে ইহা দল গঠনেই যে অধিক মনোযোগী, ইহাই বোধ হয়। দল গঠনে মনোযোগী হওয়ায় ইহা একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে। এই এক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সৃষ্টি হইতেছে। এখন এত দূর শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, এখন আদান প্রদান, আহারাদি সম্বন্ধেও বাদ বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষে নিরাকার একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য যে সকল সম্প্রদায়ের উত্থান হইয়াছিল, কালে জাতিভেদের এক নূতন শাখায় তাহাদের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমাদের মনে আশঙ্কা হয়, সময়ে এই ব্রাহ্মসমাজের অবস্থাও বুঝি বা সেইরূপ হয়। উদারতা দিন

দিনই লোপ পাইতেছে, তৎস্থানে দল গঠনের সঙ্কীর্ণ সামাজিকতা আসিয়া স্থান লইতেছে। বড়ই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত। অহঙ্কার, আত্মাভিমান হাড়ে হাড়ে জড়িত।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আকাশ হইতেও মহান, অতি পবিত্র, অতি সুন্দর। যাহার ভিতরে যাহা ভাল, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। পৃথিবীর যেখানে যে সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের। পৃথিবীর সমস্ত নর নারী—এই ধর্ম্মভুক্ত ;—এখন এবং অনন্তকাল। আমি, তুমি, সে, সকলেই বিধাতার ইচ্ছা-স্বরূপ-সাগরে নিমগ্ন, সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে তাঁর ধর্ম্মে দীক্ষিত। শাক্ত, বৈষ্ণব, খ্রীষ্টান, মুসলমান, সকলেই কতক ব্রাহ্ম। ভেদাভেদ মানি না, ভেদাভেদ জানি না। একের ধর্ম্ম—বিশ্বব্যাপিয়া রহিয়াছে। ভাষার বিভিন্নতায় তাঁকে নানা জনে নানা কথায় ডাকিয়াছে, কিন্তু এক বই আর দুই নাই। সকল ডাকের লক্ষ্যই তিনি। তাঁর ধর্ম্মই জগতের ধর্ম্ম। এই উদার ধর্ম্ম অনন্তকাল ধরিয়া সেই উদার দেবতা প্রচার করিতেছেন। অনন্ত প্রকৃতিতে ইহা পরিস্ফুট। কেহই এ ধর্ম্ম ছাড়া নয়। অনন্ত দেবতার অনন্ত লীলা অনন্তভাবে প্রকৃতিতে পরিস্ফুট। যে ইহাকে নূতন দলরূপ গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ রাখিতে চায়, সে মূর্খ বই কি? যে এই উদারধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়াও অহঙ্কারী হয়, এবং পৃথিবীর অপর সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে, সে ভ্রান্ত বই আর কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম নয়—ইহা উদার সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। পৃথিবীর সকলেই কোন না কোন রূপে এই ধর্ম্ম ভুক্ত। এক দেবতা জগন্ময়—এক ধর্ম্ম ভুবনময়। অনন্তের অনন্তত্ব, মহানের মহত্ত্ব যে সম্প্রদায়ের গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবার নয়, একথা আবার বলিতে হইবে কি?—যে ব্যক্তি ইহাকে সম্প্রদায়ের নিগড়ে, দলাদলির সংকীর্ণ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে চায়, সে আজও ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মতে দীক্ষিত হয় নাই। মানুষ, একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া, অনন্ত দেবতার অনন্ত লীলার পানে তাকাও, একবার হৃদয়পুরে প্রবেশ করিয়া তাঁকে চিনিয়া লও ; ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মতে তবেত মজিতে পারিবে। ছি, বালকের ধূলা খেলা, ঝগড়া বিবাদ লইয়া চিরকাল থাকিবে? খুটী নাটী ছাড়িয়া এখন একবার অনন্তরূপিনীর অনন্ত স্রোতে ডুব দিয়া পবিত্র হও, সমাহিত হও। কল্পনা ছাড়িয়া একবার সারধর্ম্মের গভীরতায় ও উদারতায় নিমগ্ন হও।

জীবন নহেক স্বপ্ন—উদার মহান্।

সে যে দেশে গেছে সেথা নাহি অভিমান্,
ম্লানতার নাহি লেশ,
সরল পবিত্র দেশ,
চালে কুসুমের গন্ধ কুসুম পরাণ।

জীবন লতিকা সেথা মায়া তরুমূলে—
জড়াইয়া শত পাকে,
এক ভাবে নাহি থাকে,
আঁধারে বিভোর হয় আপনারে ভুলে।

জীবন হয়েছে তার ধ্যানের সমান!
চিরস্তব্ধ ধ্যানে তার
চন্দ্র সূর্য্য বার বার,
যাচে জ্যোতি সমুজ্জল করিতে বয়ান।

তারি অন্ধকারে ফোটে নক্ষত্র নিচয়,
যামিনীর এত হাসি,
এত স্নেহ শান্তি রাশি,
পরশ করিয়া তার পবিত্র হৃদয়।

অবিচল নির্ব্বিকার হর্ষ বিভাসিত,
সুমহান প্রাণ লয়ে,
দেব ভাবে ভোর হয়ে,
ব্রহ্মানন্দ সুখে চিত্ত করিছে মোহিত।

ভালবেসে শিক্ষা এক করে গেছে দান,
তাই যেন আগে ভাগে
আসিয়া মনেতে জাগে,
জীবন নহেক স্বপ্ন—উদার মহান্।

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ। (৫ম)

আমরা গতবারে বিবাহ-প্রস্তাব সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করার কথা বলিয়াছি, তাহার কোন্‌টী অগ্রে পালনীয়, কোন্‌টী পরে, সে সম্বন্ধে কোন নিয়ম থাকিতে পারে না। মোট কথা, অভিভাবকের মত জানা, ভগবানের বিধান বুঝা, বর কন্যার মতামত গ্রহণ করা, এ সকলই প্রয়োজনীয়। তবে কোন্‌টী অগ্রে কোন্‌টী পশ্চাতে, সে সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম রাখা সম্ভব নয়। যে স্থলে যেরূপ দাঁড়ায়, সেস্থলে সেই রূপই হইবে। মোট কথা, ঐ সমস্ত কথা গুলি প্রতিপালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করা একান্ত উচিত।

কেহ কেহ এ প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এই স্বাধীনতার যুগে স্থান বিশেষে যে বিবাহ হইতে পারিবে না, ইহা ধার্য্য করা কি উচিত? ইহাতে ত স্বাধীনতার খর্ব্ব হয়! বলেন, শিক্ষক ও ছাত্রীর সহিত, অভিভাবক ও তাহার অধীনস্থ পাত্রীর সহিত বিবাহ হইতে পারিবে না কেন? স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিলে বিবাহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে কিরূপে?

এসকল কথার উত্তর দিতে আমাদের ইচ্ছাও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। আমরা এরূপ স্বাধীনতার বড় পক্ষপাতী নই। যে খানে রক্ত মাংসের সংশ্রব আছে, সেখানে বিবাহ হইতে পারা যদি বিজ্ঞান সম্মত না হয়, এবং তাহাতে যদি স্বাধীনতার খর্ব্ব না হয়, তবে যেখানে একটা সম্বন্ধ ভগবানের বিধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেখানে সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া অন্য সম্বন্ধ পাতানও নীতি-বিজ্ঞান-সম্মত হইতে পারে না। সে ব্যক্তির স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হওয়া অন্যায়, যে ব্যক্তি ছাত্রীকে পবিত্রচক্ষে দেখিতে না পারে, এবং সে ব্যক্তির কোন বালিকার অভিভাবক স্থানীয় হওয়া উচিত নয়, যে ব্যক্তি বালিকাকে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহের চক্ষে দেখিতে না পারে। এরূপ নিয়ম না থাকিলে বিশ্বাসের একটী ভিত্তি থাকে না—সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়। একটী ছাত্রীকে যখন স্কুলে দেওয়া হইয়াছে, তখন একথা ভাবিয়া কিছু দেওয়া হয় নাই যে, শিক্ষকের সহিত তাহার বিবাহ হইবে। স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান লাভ করিবে, এই উদ্দেশ্য। এখানে

সুযোগ পাইয়া যদি শিক্ষক তলে তলে ছাত্রীর সহিত প্রণয় পাতায়, তবে তাহা যে পবিত্র নীতিবিগর্হিত কার্য্য হয়, এবং সে ব্যক্তিকে যে আর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে কি না, জানি না। স্থানে স্থানে এইরূপ অনুরাগ সঞ্চার হইতে দেখা গিয়াছে বলিয়া, আজ কাল অনেক ব্যক্তি বালিকাদের শিক্ষার জন্য পুরুষ-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে অত্যন্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক খুব সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, এ সকল স্থলে স্বাধীনতাকে একেবারে খর্ব্ব না করিলে, কোন মতেই নীতি রক্ষার সম্ভাবনা নাই। পিতা মাতা, ও ভ্রাতা ভগ্নীর সম্বন্ধ যেরূপ ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট, শিক্ষক ও ছাত্রীর, অভিভাবক এবং তাহার অধীনস্থ বালিকার সহিত সেইরূপ সমাজ-নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ,মনে করা উচিত। সমাজ অনেক স্থলে ঈশ্বরেরই দূতের ন্যায় কার্য্য করেন, সুতরাং এ সম্বন্ধও প্রকারান্তরে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট। যাহারা তাহা মনে করিতে না পারে, সে শিক্ষক বা সেই অভিভাবকের হস্তে কোন বালিকার ভার দেওয়া উচিত নয়। এস্থলে স্বাধীনতা যত শীঘ্র কর্ম্মনাশার জলে প্রক্ষিপ্ত হয়, ততই ভাল।

আর একটী স্থলে স্বাধীনতার কথা শুনিতে২ পাওয়া যায়। পাত্র ক্রমাগত দুই দশটী পাত্রী দেখিতেছেন, কিন্তু কোন পাত্রী মনোনীত হইতেছে না। পাত্র অন্যত্র আবার অন্য পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতেছেন। এইরূপ ক্রমাগত নূতন নূতন পাত্রী দেখিয়া বেড়ানে স্বাধীনতা আছে কি না? একথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে একটী প্রশ্ন করি। মনে কর, পাত্রীর বর পছন্দ হইতেছে, কিন্তু পাত্রের পাত্রী পছন্দ হইতেছে না, —এরূপ স্থলে পাত্রীর মন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? ক্রমাগত নূতন বর আসিতেছে, কিন্তু যাকে পছন্দ হইতেছে, তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না, এস্থলে মনে দুশ্চিন্তা বা অভিমানের উদয় হওয়া সম্ভব কি না? যদি সম্ভব হয়, তবে ইহার জন্য দায়ী কে? এদেশ এবং অন্য দেশের কাহিনীতে এরূপও শুনা গিয়াছে, বরের নিকট আশ্বাস পাইয়া, মনের মধ্যে একটী বাসনাকে বসাইয়া, এবং সময়ে সেই বরকে না পাইয়া কত বালিকা আজন্মের জন্য অবিবাহিতা থাকিয়াছেন। এইরূপ আশ্বাসিতা কত বালিকা,অন্যত্র বিবাহিতা হওয়া স্বত্বেও, স্বামীকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারে নাই। এসকল যে কি গভীর চিন্তার বিষয়, ধারণাও করা যায় না। আমরা দেখিয়াছি, কোন কোন বালক, স্বীয় বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, ক্রমাগত নূতন নূতন পাত্রী দেখিয়া ফিরিতেছেন; জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—"পছন্দ হয় না কি করিব? যাকে তাকে ত আর বিবাহ করিতে পারি না। স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতে বলেন"? এইরূপ স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কি না? ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়ে বিবাহ বিষয়ক আন্দোলনে একটা প্রধান যুক্তি এই ধরিয়াছেন যে, বর কন্যার মনোনয়নে ঈশ্বর-প্রদত্ত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবার কি অধিকার আছে? এই স্বাধীনতা যে মানুষের কত দূর আছে, সে বিষয়ে একটু চিন্তা করা উচিত। ১৪ বৎসরের সময় না ১৮ বৎসরের সময়, কোন্ সময় বালক বালিকারা স্বাধীন? মনে কর, আমি স্বাধীন মতে একজনকে

এক ব্যক্তি বিবাহ করিল। পাঁচ বৎসরের পর স্বাধীন স্বামী আর স্ত্রীতে মন বাঁধিতে পারিতেছেন না; তার মন অন্য পাত্রীতে পড়িয়াছে। এরূপ স্থলেও কি স্বাধীনতার কথাই জয়যুক্ত হইবে? একথাও নয় ছাড়িলাম। মনে কর, একটী পাত্র একটী পাত্রীকে প্রলোভন দেখাইয়া আপনাতে অনুরক্ত করিয়াছে, তাঁর সহিত এমন সকল ব্যবহার করিয়াছে, যাহাতে কিছু নীতি-শিথিলতার পর্য্যন্ত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিছুদিন পর সেই যুবক আর পাত্রীকে বিবাহ করিতে চায় না—সে বলে, আমি মন বাঁধিতে পারিতেছি না। এরূপ স্থলেও তার স্বাধীনতাকে পূজা করিয়া চলা উচিত কি না? আমরা জানি না, এমন কোন ব্যক্তি আছেন কি না, যিনি এই সকল স্থলেও বলিবেন যে—স্বাধীনতার পূজা করাই উচিত। আমরা এরূপ স্বাধীনতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। ইহা স্বাধীনতা নয়, ইহা স্বাধীনতার আচ্ছাদনে স্বেচ্ছাচারিতা বিশেষ। ইহা যত শীঘ্র বিদূরিত হয়, ততই মঙ্গল। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে বুঝিতে পারা বড়ই কঠিন। আমরা পূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে এ সকল কথার অনেক আলোচনা করিয়াছি। আমরা স্বাধীনতা ও অধীনতা নামক প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি, মানুষ কেবল স্বাধীনতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই—সে অধীনও। মানুষ পিতা মাতার অধীন, ভ্রাতা ভগ্নীর অধীন, আত্মীয় বন্ধুর অধীন, সমাজের অধীন, দেশের অধীন, রাজার অধীন। অধীন হইতেও অধীন। পরস্পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াই আমরা যেন উন্নতি লাভ করিতেছি। পরস্পরের সাহায্য, পরস্পরের সদুপদেশ, পরস্পরের উপকার ভিন্ন মানুষ, মানুষ হইতে পারে না। রাজার বল প্রকাশ করিলেও এই বিশ্বব্যাপী অধীনতার শৃঙ্খল—সংসারের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা যায় না। এই মোহময় পৃথিবী, এই মায়াপূর্ণ গৃহ পরিবারের কেন্দ্র—দাস-ব্যবসায়ের আড্ডা মাত্র। এমন দেশ নাই, যেখানে এই দাসত্ব প্রথা চলে না। যেখানে মনুষ্য, সেই খানেই পরিবার, সেই খানেই সমাজ, সেই খানেই রাজা। শাসন ভিন্ন, উপদেশ ভিন্ন, সাহায্য ভিন্ন, এক দিনও মানুষের চলে না। অন্যান্য স্থলে পরস্পরের সাহায্য পরস্পরে লইব, কিন্তু এই বিবাহের সময় নয়? একথা, কথাই নয়। সর্ব্ব দেশে—বিবাহের সময় সমাজের শাসন, অভিভাবকের আদেশ বা রাজার অনুজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইয়াছে।

ইউরোপ খণ্ডে খুব স্বাধীনতার প্রচার হইয়াছে, কিন্তু সে দেশ সম্বন্ধে ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদক বলেন, "It is certainly not in India only, that parents choose the life partner of their children. Over the greater part of Europe young people have we suspect little practical choice in the matter." ভারতবর্ষে যেরূপ অভিভাবকেরা পাত্রী মনোনয়ন করেন, ইউরোপেও প্রায় তদনুরূপ হয়। আমরা বলি, ইহা সুপ্রণালী। তবে যাহারা বিবাহ করিবে, তাহাদের মতামতকে একেবারে উপেক্ষা করা উচিত নয়। ধর্ম্মহীন অল্প বয়স্ক বালক বালিকাকে সম্পূর্ণরূপ স্বাধীনতার উপর ছাড়িয়া দিলে, তাহারা যে কতদূর দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া উঠিবে, কল্পনাও করা যায় না। যে পর্য্যন্ত জ্ঞান লাভ না হয়, যে পর্য্যন্ত চরিত্র গঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত মানুষ পদে পদে অন্যের অধীন। বয়স

অধিক হইলেই মানুষ স্বাধীনতা পাইবার অধিকারী হইতে পারে না। ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাজাকে বাধ্য হইয়া বয়সের উপর উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম রাখিতে হইয়াছে, কিন্তু সেটা আদর্শ নয়। যে সমাজের লক্ষ্য ধর্ম্ম,সে সমাজে চরিত্র, এবং ধর্ম্মজ্ঞানের উৎকর্ষতার উপরই স্বাধীনতা ও অধীনতার প্রশ্ন নির্ভর করা উচিত। যে যত ধর্ম্ম ও চরিত্রহীন, সে তত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, সমাজ ও রাজার অধীন। চরিত্রহীন ব্যক্তির স্বাধীনতা—স্বেচ্ছাচারিতা বিশেষ, তাহার কথা মুখে আনিও না। তাহাদের সম্মতি বা অসম্মতির কোন একটা মূল্য নাই। দেখা যায়, আজ যে কার্য্যে তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কাল সে কাজে তাহারা শিথিল-প্রতিজ্ঞ। আজ যাতে তাদের সম্মতি, কাল তাতে তাদের অসম্মতি। চরিত্রহীন,ধর্ম্মভিত্তিহীন লোকের দাঁড়াইবার ঠাঁই নাই। তাহারা ক্রমাগত স্রোতের শৈবালের ন্যায় এদিক সেদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। তাদের সম্মতি বা অসম্মতির কোনই মূল্য নাই। বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে আরো যে শত সহস্র যুক্তি আছে, সেই গুলি প্রয়োগ করিতে চাও, কর, কিন্তু ১৪, ১৫ বা ১৮ বৎসরের বালক বালিকার সম্মতির অধিকারের কথা তুলিও না। তাহাদিগকে অধিক স্থলেই অভিভাবক এবং সমাজের কথা মান্য করিয়া চলিতে হইবে। তাদের পক্ষে, তাহা অধর্ম্মও নয়। অভিভাবক এবং সমাজকে উপেক্ষা করিতে যদি শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহাদের যে কি শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিবে, কল্পনা করিলেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। আমরা এরূপ স্থলে সমাজকে উদাসীন দেখিয়া সময়ে সময়ে মর্ম্মে দারুণ আঘাত পাইয়াছি, লোকের উপর আর বিশ্বাস স্থাপন করিতে ইচ্ছা হয় না। খুব যাহাদের প্রতি আশা ছিল,পরীক্ষারূপ ঝটিকার দিনে দেখিয়াছি,তাহারা স্রোতের শেওলার ন্যায় কোন্ পূতিগন্ধময় নরক প্রদেশে ভাসিয়া যাইতেছে! নীতির বন্ধনে, সমাজ বন্ধনে মানুষকে আঁটিয়া না বাঁধিলে, সমাজকে ধর্ম্মের অনুকূল করিয়া রাখিবার আর কি উপায় আছে, আমরা জানি না।

যাঁহারা এই সকল বিষয়ে অপরাধী, তাঁহারা আমাদের কথার প্রতিবাদ করিবেন, আমাদের উপর বিরক্ত হইবেন,সন্দেহ নাই। যাঁহারা অবিবাহিত রহিয়াছেন, তাঁহারাও এই সকল বাঁধাবাঁধির কথা শুনিলে বিরক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু চরিত্রবান, যাঁহারা চিন্তাশীল, যাঁহারা সংসারের অভিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যে কেন আমাদের প্রতি বিরক্ত হইবেন, আমরা আজও তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; তাঁহাদের বিরক্তি দেখিয়া, আমরা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কিছু আশা-শূন্য হইয়া পড়িতেছি।

যে উপলক্ষে যৌবনবিবাহ ও ব্রাহ্মসমাজ নামক প্রবন্ধ আমরা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে উপলক্ষটী মালাবারি মহোদয়ের বাল্য বিবাহ রহিতের জন্য আইন করার প্রস্তাবের আন্দোলন। ক্রমে রুক্মাবাই সংক্রান্ত মকদ্দমা উপস্থিত হইল। আন্দোলনের পর আন্দোলন চলিতে লাগিল অবশেষে, বর কন্যার বিনা সম্মতিতে যে বিবাহ হইয়াছে, কিম্বা বিবাহের পর যাহাতে কোন সম্মতিসূচক কার্য্য ঘটে নাই, সেই বিবাহ রহিত করিবার জন্য

গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা উচিত কিনা, এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই প্রশ্ন লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে। এক পক্ষ বাল্য বিবাহের পোষকতা করিতেছেন, অন্য পক্ষ তাহার বিরুদ্ধে লিখিতেছেন। যাহা হউক, যে উদ্দেশ্যে আমরা এই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা কতক সংসিদ্ধ হইয়াছে। উভয় পক্ষের মধ্যেরই অনেক ব্যক্তি বিবাহ ভঙ্গের জন্য আইন করার বিরোধী। এটী একটী সুলক্ষণ, সন্দেহ নাই। বিবাহভঙ্গ-প্রথা প্রচলিত হইলে, যে বিবাহে সম্মতি ছিল, তাকেও অসম্মতিসূচক বিবাহ বলিয়া প্রতিপন্ন করা বড় কঠিন কথা নয়। ইচ্ছা হইলে, সন্তান উৎপন্ন হইলেও, চরিত্রে দোষারোপ করিয়া অসম্মতিসূচক বিবাহ বলিয়া তাহা ভঙ্গ করিতে লোক প্রস্তুত হইতে পারে। মোট কথা, বিবাহ ভঙ্গ প্রথায় দোষের ভাগই অধিক, গুণের ভাগ থাকিলেও অতি অল্প। খামখেয়ালির প্রশ্রয় পায়, ইহা কখনই উচিত নয়। এক বাক্যে এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট সাধারণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা উচিত। ইহাতে হিন্দু বিবাহের মূল ভিত্তিহীন হইবে। এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোবিন্দ সোম মহাশয় যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, সে সমস্ত অতি উদার এবং চিন্তা পূর্ণ কথা। "What god hath joined together let no man put sunder". এটী খ্রীষ্টের অতি সুন্দর কথা। ভগবান দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাকে ভঙ্গ করিও না। কি জলন্ত বিশ্বাসের কথা। সেণ্টপল বলিয়াছেন, "The woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth." খ্রীষ্টান সমাজ, খ্রীষ্ট এবং সেণ্টপলের এই মহৎ বাক্যকে অমান্য করিয়া চলিয়া যে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। সে কথা থাকুক। জয়গোবিন্দ বাবুর কথার সহিত এ পর্য্যন্ত আমরা খুব ঐক্য। কিন্তু যে সকল বিবাহে ভগবানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় নাই, সে স্থলে কিরূপ হইবে?—এসম্বন্ধে তিনি বলেন, ("In after times God has accomplished this union through human agencies") পরে ভগবান মনুষ্যের দ্বারায় এই মিলন সংঘটন করিয়াছেন। বিধাতা, কোন কোন সময়ে, মানুষের ভিতর দিয়া সমাজের ভিতর দিয়া বা রাজার ভিতর দিয়া কার্য্য করেন, সত্য, কিন্তু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা (free-will) স্বীকার করিতে গেলে, মানুষের সকল কার্য্যই যে বিধাতার কার্য্য, তা কখনই মনে করা যায় না। মানুষ স্বেচ্ছা, স্বার্থ, বা খামখেয়ালির বশবর্ত্তী হইয়া যে কার্য্য করে, তা বিধাতার কার্য্য নয়। যদি তা হয়, তবে যাহারা বিবাহ ভঙ্গ করে, তাহাদের সে কার্য্যকেও বিধাতার কার্য্য বলিয়া মনে করিতে হয়। যাঁহারা পাপ পুণ্য স্বীকার করেন, তাঁহারা মানুষের সমস্ত কার্য্যকে কখনই বিধাতার কার্য্য বলিয়া মনে করিতে পারেন না। অনেক স্থলে দেখা যায়, ৫০।৬০ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির সহিত, টাকার লোভে, কেহ বা অন্য স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ১১।১২ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ দিতেছেন। এইরূপ কার্য্যও কি বিধাতার কার্য্য? না—তাহা কখনই নয়। এই রূপ স্থলে কি করা কর্ত্তব্য, বিবাহ-ভঙ্গ হইতে দেওয়া উচিত কি না, আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। এ সম্বন্ধে

তিনিও একরূপ নির্ব্বাক। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এরূপ স্থলে বিবাহ ভঙ্গ প্রথা যদি প্রচলিত থাকে, তাহাতে দোষের বিষয় না থাকিলেও, আমরা ইহাকেও আদর্শ বলিয়া মনে করিতে পারি না। কেন পারি না, সে সমস্ত বিস্তৃত কারণ এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর নয়। সুবিধা পাইলে পরে আলোচনা করিব। তারপর তিনি বলিতেছেন—"In the case of the first marriage on record, God actually brought the woman unto the man and gave her unto him, to be his wife, &c."—এ স্থলে তাঁর কথার সামঞ্জস্য কেমন করিয়া রক্ষা পায়, তাহা বুঝিলাম না। বিধাতা যখন রমণীকে প্রথম পুরুষের নিকট আনিয়াছিলেন, তখন কি রমণী এবং পুরুষ বালক বালিকা ছিল? সে কথার স্পষ্ট মীমাংসা জয়গোবিন্দ বাবু করেন নাই। আমাদের বিবেচনায়, তাহারা তখন বালক বালিকা ছিলনা। কারণ—বিধাতার বিধান সেরূপ নয়। জীবনে এমন একটা সময় আছে, যে সময়ে বিধাতা পুরুষকে রমণীর প্রতি আকৃষ্ট করেন। যে সময়টী যৌবনকাল। এই যৌবন কালের পূর্ব্বে বিধাতা রমণীকে পুরুষের নিকট আনিতেছেন, একথা কথাই নয়। তাহা হইলে, যৌবন নামক একটী বিশেষ সময় মানুষের জীবনে ঘটিত না। শরীরের বিকাশের সহিত মনের বিকাশ, মস্তিষ্কের পরিপুষ্টির সহিত ধর্ম্মজ্ঞানের উন্মেষ, রিপুর বিকাশের সহিত দাম্পত্য প্রেমের বিকাশ, এই যৌবন কালেই হয়। এ সকল প্রত্যক্ষ সত্য। ইহার প্রমাণের জন্য আর ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হয় না। পিতা মাতাকে বালক বালিকা ভালবাসে, সুতরাং বালক স্বামী বালিকা স্ত্রীকে ভালবাসিতে পারিবে না কেন? জয়গোবিন্দ বাবুর এটা যে কিরূপ যুক্তি, বুঝিলাম না। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যৌবনকালের পূর্ব্বে বালক বালিকার সন্তান হয় না কেন? পিতা মাতাকে ভালবাসা ও দাম্পত্য প্রেম, এদুটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ; উভয়ে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই অযৌক্তিক কথার উত্তর দিতেও ইচ্ছা করে না। একমাত্র উত্তর এই—ঈশ্বরের ইচ্ছা এই,—বাল্যকাল হইতে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের অনুরাগ ও ভক্তি জন্মিবে; এবং যৌবন কাল হইতে দাম্পত্য প্রেমের উদয় হইবে। বিধাতার এই ইচ্ছার ইঙ্গিত স্পষ্ট বুঝিতে পারে না, এমন লোক পৃথিবীতে বিরল, সুতরাং এসম্বন্ধে আর কিছু অধিক বলিতে চাই না। আমরা জয়গোবিন্দ বাবুর সহিত যখন একবাক্যে বলি যে, বিবাহ ঈশ্বরের বিধান; ঈশ্বর যে মিলন সংঘটন করেন, তাহা ভঙ্গ করা যাইতে পারে না, (Marriage is a heaven-ordained relation, that the union is effected by God Himself, that it is in its very nature indissoluble &c.)—তখন এ-কথাও বলি যে, এই বিবাহ শৈশবকালে হইতেই পারে না। এ সম্বন্ধে অনেক যুক্তি আমরা ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। আর প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় কথা জয়গোবিন্দ বাবু এই বলেন যে, এদেশে বাল্য বিবাহে কি কি অপকার হইয়াছে, তাহার কোন তালিকা নাই। এটা তাঁর কি রূপ যুক্তিযুক্ত কথা? তালিকা থাকুক বা না থাকুক, দোষ ঘটুক, আর না ঘটুক, সে পৃথক কথা। বাল্য বিবাহে যখন

বিধাতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, তখন একজন খ্রীষ্টধর্ম্ম বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বিবাহকে প্রশ্রয় দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত? বাল্যবিবাহে শারিরীক অপকার হয় কি না, সে পরের কথা। ধার্ম্মিক সর্ব্বাগ্রে দেখিবেন, বিবাহ ভগবানের আদেশ বা ইঙ্গিত সম্মত হইতেছে কি না। তারপর বিজ্ঞান, তারপর দর্শন। ভগবানের ইঙ্গিত বা আদেশের সহিত দর্শন বিজ্ঞানের অমিল হইতে পারে না। তাঁর ইঙ্গিতে যে বিবাহ হয়, তাহাতেই সুফল ফলে। তাঁর যাতে ইঙ্গিত নাই, তাতেই কুফল ফলিবে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষের সকল কার্য্যই বিধাতার কার্য্য নয়, সুতরাং সকল বিবাহই যে বিধাতার ইঙ্গিতে হয়, একথা মনে করিতে পারি না। অদ্বৈতবাদী ভিন্ন, কোন দ্বৈতবাদী বা ত্রিত্ববাদীদিগের মধ্যে কেহ মনে করিতেপারেন কিনা,তাতেও আমাদের সন্দেহ আছে। তাহা যদি হইত, তবে আর কোন কাজেই দোষ ঘটিত না। সুতরাং যে বিবাহ মনুষ্যকৃত, যাহাতে বিধাতার আদেশ নাই, তাহা যে অধর্ম্মের কার্য্য, তাতে আর সংশয় কি? অধর্ম্ম অপেক্ষা, ধার্ম্মিকের পক্ষে আর কোন্ দোষ অধিক? যাতে অধর্ম্ম, তাতেই সকল দোষ প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত। বাস্তবিকও তাই। বাল্য বিবাহে যে সকল অনিষ্ট হইতেছে, তিনি চক্ষু ও বুদ্ধি থাকিতে, অনিষ্টের বিবরণ সংগ্রহ নাই বলিয়াই সে সকল কেমনে অস্বীকার করিবেন, আমরা বুঝি না। দিন রাত্রি চক্ষের সম্মুখে যে সকল বীভৎস ঘটনা ঘটিতেছে,তাহা দেখিয়াও কে অস্বীকার করিতে পারেন যে, বাল্য বিবাহে অনিষ্ট হয় না? এই রূপ অনিষ্ট দেখিয়া দেখিয়াই, সাধারণত ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকদিগের অধিকাংশ ব্যক্তি বাল্য বিবাহের বিরোধী হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে, বাল্য বিবাহ সম্বন্ধে ভারতের সর্ব্ব শ্রেণীর মতামতের যে একখানি বিবরণ-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠে জানা যায় যে, অধিকাংশ ব্যক্তিই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বলিয়াছেন। তাতেই এ কথা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, বাল্যবিবাহে এদেশের ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে। নচেৎ এত গণ্য মান্য ব্যক্তি কখনই বিরোধী হইতেন না। তারপর ডাক্তারদের কথা। ডাক্তারেরাও বাল্য বিবাহের কুফল পরীক্ষা করিয়াই এক বাক্যে সকলেই বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ পাওয়া যায়, বাল্য বিবাহে এদেশে যথেষ্ট অনিষ্ট হইতেছে। আর প্রমাণ-তালিকার প্রয়োজন কি?

তারপর একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার যুক্তি। এ যুক্তি সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবু যাহা বলিয়াছেন, জয়গোবিন্দ বাবু তাহাপেক্ষা একটীও নূতন কথা বলিতে পারেন নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর বাক্য ব্যয়ের প্রয়োজন নাই।

তার পরের যুক্তি এই—বাল্য কালে বিবাহ হইলে চরিত্রহীনতা ঘটে না। দেখা যাউক, ইহা কতদূর সত্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এক বাক্যে বাল্য বিবাহের দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা এ স্থলে তুলিব না। উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহ দিতে মনুও নিষেধ করিয়াছেন।* সুতরাং

* "I admit that infant-marriage is an evil; I also admit Manu only enjoined that a girl should be married when she was fit for marriage." &c.—Max Muller.

উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বে যে বিবাহ, হিন্দু শাস্ত্রেও তাহা গ্রাহ্য নয়। মনুর কথা হিন্দু সমাজের শিরোধার্য্য। তারপর সুশ্রুত-সংহিতায় "পুরুষের পঞ্চবিংশতি বর্ষ এবং স্ত্রীলোকের ষোড়শ বর্ষ অবধি বয়সই পরস্পর সহবাসের উপযুক্ত কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ উক্তকালে উভয়ের বীজই সম্যক পক্ক ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। ইহার ন্যূন বয়স্ক পুরুষ কিম্বা স্ত্রীর সংযোগে গর্ভ সঞ্চার হইলে তদ্গর্ভজ সন্তান গর্ভাশয়েই মৃত হয়। অথবা ভূমিষ্ঠ হইয়াও অধিক কাল জীবিত থাকে না। কিংবা জীবিত থাকিলেও নিতান্ত দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। কারণ পূর্ব্বোক্ত বিহিত কালের ন্যূন বয়সে উভয়েরই বীজের সম্যক পরিপক্কতা বা পরিপুষ্টি সাধিত হয় না।*" বালক বালিকাকে অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া সহবাস হইতে বঞ্চিত রাখা যাঁহাদের মত, তাঁহারা একথা কোন মতেই বলিতে পারেন না যে, বাল্য বিবাহে চরিত্রহীনতা ঘটে না। কারণ, অসময়ে দাম্পত্য সুখের চিন্তাকে মনে স্থান দিয়া, নূতন আস্বাদনে দীক্ষিত করিয়া, তাহা হইতে দূরে রাখিলে আরো চরিত্রহীনতা ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক হয়, বালকেরা ঘর ছাড়িয়া বাহিরে রিপু চরিতার্থ করে। তারপর বিধাতার ইঙ্গিত যাঁহারা মানেন, কিন্তু শাস্ত্র যাঁহারা মানেন না, তাহারাও যৌবন কালের পূর্ব্বে বিধাতার সে ইঙ্গিতের নিদর্শন দেখিতে পান না।

তারপর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে ত কত অনিষ্টের কথা স্মরণ হয়। রাশি রাশি অনিষ্টের সম্ভাবনা যে বাল্য বিবাহে, এবং শাস্ত্রেও যাহা নিষিদ্ধ, তাহাতে চরিত্রহীনতা ঘটিবে না, এ কিরূপ কথা? চরিত্রহীনতা কাহাকে বলে? সে সময়ের যে কর্ত্তব্য, সে সময়ে তাহা পালন না করিলেই চরিত্রহীনতা ঘটে। বাল্যকালে বিবাহ না করাই যদি কর্ত্তব্য হয়, তবে তাতে চরিত্রহীনতা নিবারণ করিবে কিরূপে? বরং তাতেই আরো চরিত্রহীন করে। বাস্তবিক, বাল্যকালে বিবাহ হইলে, বালক বালিকারা অসময়ে পরিপক্ক হয়, জ্যেষ্টতাতত্ত্বে দীক্ষিত হয়, অসময়ে রিপু চালনা করিয়া নীতিহীন ও চরিত্রহীন হয়। এ সকল কিছু নূতন কথা নয়। সুতরাং বাল্যবিবাহেতে চরিত্রহীনতা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

তারপর মনে কর, বাল্যবিবাহে চরিত্রহীনতা না জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। তাতেই বা কি? যে বাল্যবিবাহে শত শত অনিষ্ট, তাহা দ্বারা চরিত্র রাখা কি উচিত? একটা অন্যায় দ্বারা একটা ন্যায়কেও রক্ষা করা উচিত নয়। একটা অনিষ্ট নিবারণের জন্য বালক বালিকাকে চিরকালের জন্য রোগের অধীন, শোকের অধীন, চিন্তাবিহীন, জ্ঞানবিহীন করিয়া রাখা কি উচিত? অকাল মৃত্যু-মুখে ফেলা কি উচিত? বাল্যবিবাহে অনেক রোগ জন্মে, অসময়ে পুত্রশোক পাইতে হয়, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়, বিদ্যাশিক্ষায় শিথিলতা জন্মে, এ সকল অতি পুরাতন কথা। অন্যান্য কাগজে এ সকল কথায় যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। অনিষ্ট নিবারণের

---

* "উন ষোড়শ বর্ষায়ায় প্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ সবিপদ্যতে।
জাতোবা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ
তস্মদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।"
সুশ্রুত সংহিতা।

জন্য আরো অনিষ্ট ডাকিয়া আনিতে পরামর্শ দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয়।

তারপর তিনি বলেন, বাল্যকালে বিবাহ না দিলে পাত্র জুটিবে না।—এটা কোন কাজেরই কথা নয়। সকল বালিকাই যদি উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, তবে পাত্র জুটিবে না কেন, বুঝি না। পাত্রীর সংখ্যার অল্পতাই যদি ইহার কারণ হয়, তবে সে অভাবেও বাল্যবিবাহেও দূর হয় না।

তারপর কথা হইতেছে, যৌবন বিবাহে অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। বাস্তবিক সে কথা সত্য। ধর্ম্মহীনতাই তাহার প্রধান কারণ। ইয়ুরোপ এবং অন্যান্য যে সকল প্রদেশে যৌবন বিবাহে কুফল ফলিতেছে, ধর্ম্মহীনতাই সে সকল স্থলে প্রধান কারণ, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এজন্য মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি? যাহাতে লোক ধার্ম্মিক হয়, জীতেন্দ্রিয় হয়, ইহাই কর্ত্তব্য। আগুনে বাড়ী ঘর পুড়িয়া যায় বলিয়া আগুনের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা কি উচিত? যাহাতে বাড়ী না পুড়ে, বরং তাহাই করা উচিত। রিপুর অত্যাচারে মানুষ ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় বলিয়া, অঙ্গ বিশেষ ছেদন করিতে কোন ক্রমেই ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে না। সাবধান হওয়া উচিত, এই পর্য্যন্ত বলা যায়। আমরাও এই ব্রাহ্মসমাজের অল্পদিনের অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি, বাস্তবিক খুব সতর্ক না হইলে যৌবন বিবাহে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা আছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা ভিন্ন আর উপায় দেখা যায় না। ধর্ম্মের বিশুদ্ধ বায়ু যাহাতে দেশ মধ্যে প্রবাহিত হয়, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহারই চেষ্টা করা উচিত। অন্যরূপ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়।

তারপর বাল্য বিবাহের পোষকতায় জয়গোবিন্দ বাবু আর সে সকল কথা বলিয়াছেন, তাতে না আছে যুক্তি, না আছে তর্ক, না আছে চিন্তাশীলতা। সে সকল, কথা সম্বন্ধে আর আলোচনা করিব না। তবে তিনি যে উদ্দেশ্য এই সকল কথা বলিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য অতি মহৎ। সে উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের প্রাণের গভীর সহানুভূতি আছে। এ সম্বন্ধে তিনি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি। হিন্দু সমাজের বিরোধী ব্যক্তি এরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের উপকারের চেষ্টা করিতেছেন, ভাবিলেও আনন্দ হয়। ঈশ্বর তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। কি কারণে বিবাহ ভঙ্গ প্রথা সমাজে চলা উচিত নয়, এ সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা অনেক স্থলেই যুক্তিযুক্ত। তাহার সে সকল কথার সহিত আমাদের মতের বড় অনৈক্য নাই। ১৩।১৪ বৎসরের বালিকা বা ১৫।১৬ বৎসরের বালকের সম্মতি বা অসম্মতির যে কোন একটা মূল্য নাই, সে সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে তাঁর সহিত এক বাক্যে বলি, এরূপ বিবাহ ভঙ্গ প্রথায় মত দেওয়া কাহারও পক্ষে উচিত নয়।

অন্যান্য কথা ক্রমে ক্রমে লিখিব।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। হিমাদ্রি-কুসুম।—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী, এম্. এ, প্রণীত। মূল্য এক টাকা। ভাল গ্রন্থ পড়া সমালোচকের ভাগ্যে বড় ঘটে না। গ্রন্থকারেরা সে জন্য হয়ত সমালোচককেই নিন্দা করিবেন। আমরা বলি যে, সমালোচকের আর কিছু নিন্দনীয় হউক আর না হউক, ভাগ্যটা নিন্দনীয় বটে। সে যাহাই হউক, চারিদিকের রাশি রাশি অসার পদ্য গ্রন্থের মধ্যে হিমাদ্রি-কুসুম পড়ার সুখ, বড় সুখ। শিবনাথ বাবু সুকবি বলিয়া সর্ব্বত্রই পরিচিত; পল্লিগ্রামের বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পর্য্যন্ত তাঁহার অতি সুন্দর, অতি মনোহর "ফুল" "পাখী" "চৈতন্যের সন্ন্যাস" প্রভৃতি পড়িয়া,সৌন্দর্য্য কি, নৈতিক বল কি, ইহা বুঝিতে শিখিতেছে। মনোহর ছন্দে একটা দুইটা ভাল কথা ভাল করিয়া বলিতে পারিলেই লোকে কবি হয় না। সৃষ্টি দেখিয়া যদি কবিত্বের গুজন করিতে হয়, তবে শিবনাথ বাবু একজন প্রকৃত কবি। যে মহান উদ্দেশ্য তাঁহার "উৎসর্গ" নামক কবিতায় পড়িয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্য,সেই শিষ্টাচার ও সেই পবিত্র ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠার সংকল্প হিমাদ্রি-কুসুমের ছন্দে ছন্দে স্ফুরিত হইয়াছে। ভাল কথা, ও ভাল ভাব শুনিলে বা বুঝিলে যে সকল সময়েই একটা বড় ফল হয়, তাহা নয়; কিন্তু কবিত্বের মধুময় বীণার রবের সঙ্গে যখন তাহারা হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন যে ফল হয়, তাহা বর্ণনারও অতীত। "দীক্ষা" হইতে "বিদায়" পর্য্যন্ত এমন একটী কবিতা নাই, যাহা পড়িয়া উঠিলে সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ-সুখের সঙ্গে সঙ্গে সৎভাব ও সাধু সংকল্প হৃদয়ে উদিত হয় না। যদি স্থানাভাব না হইত, তবে আমরা অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু ভরসা করি, পাঠক মহাশয় নিজে নিজেই সেগুলি দেখিয়া লইবেন।

২। অযোধ্যার বেগম।—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। প্রতি ভাগের মূল্য ৮০। শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। চণ্ডী বাবু নব্যভারতের পাঠকদিগের নিকট খুব পরিচিত। তাঁহার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান বেশ আছে। হেষ্টিংসের সময়ে এদেশে কিরূপ অত্যাচার হইত, তাহা চণ্ডী বাবুর মহারাজা নন্দকুমার, অযোধ্যার বেগম প্রভৃতি পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালার যে সময়ের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন, ইংরেজ ঐতিহাসিকের মিথ্যা বর্ণনে পূর্ণ, চণ্ডী বাবু সেই সময়ের ইতিহাস বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া এদেশের শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকার করিতেছেন। তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ক্রটী লক্ষিত হইলেও একথা বলিতে পারি যে, অযোধ্যার বেগম পাঠকেরা উপন্যাসের মত পড়িতে পারিবেন এবং স্থান বিশেষের বর্ণনায় খুব উত্তেজিত হইবেন। "এমানুষ নহে,রাক্ষস" নামক অধ্যায় পড়িতে পড়িতে আমরা গভীর উত্তেজনা অনুভব করিয়াছিলাম।

৩। শক্তিকানন।— (উপন্যাস) শ্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত, মূল্য ১৷৷০। গ্রন্থকারের বাঙ্গালা ভাষা লিখিবার বেশ

ক্ষমতা আছে। উপন্যাসের বর্ণনার বিষয়টীও অতি সুন্দর; কিন্তু গল্পটীতে খুব জমাট বাঁধে নাই। এই শ্রীশবাবুর প্রথম গ্রন্থ; ভরসা করি, ভবিষ্যতে তাঁর গ্রন্থে খুব সুপক্কতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

৪। আশালতা।—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী প্রণীত।—এখানি পদ্য গ্রন্থ। স্থানে স্থানে কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু এখনও পরিপক্কতা জন্মে নাই। অনেক স্থানেই ভাষার দোষ, ছন্দের দোষ, এবং কোটেসনের অসংলগ্নতা দেখা যায়।

৫। গীতগোবিন্দ।—শ্রীহরিমোহন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত; মূল্য ১।০ মাত্র। কবি জয়দেবের নাম এবং তৎপ্রণীত গীতগোবিন্দের কথা জানে না—ভারতের সভ্য সমাজে এমন লোক নাই। কিন্তু নাম জানে বলিয়াই সকলেই যে জয়দেবচরিত বা গীতগোবিন্দের কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু জানেন, এমন নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত জয়দেব-চরিত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই বিস্তৃত গ্রন্থে জানিবার মত কথা অতি অল্পই আছে, এবং যাহাও বা আছে, তাহারও অধিক কথারই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বড় কম। তাহার পরে গীতগোবিন্দ গ্রন্থ। যদিও বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় এই গ্রন্থের অপরিসীম আদর; কিন্তু কোন দেশেই এমন ভাবে এগ্রন্থ এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই, যাহার সাহায্যে সকলেই গীতগোবিন্দের কবিত্বরস আস্বাদন করিতে পারে। কিন্তু শুভক্ষণে এ বঙ্গদেশে আবার সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে; কাব্য গ্রন্থাদি হইতে বেদ বেদান্ত পর্য্যন্ত সকলই সাধারণের দৃষ্টি ভূমিতে আনীত হইতেছে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার এই গ্রন্থে যে বিজ্ঞাপন, জয়দেবের জীবনী, টীকা, অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রজনী বাবু এক বিস্তৃত গ্রন্থে জয়দেবের যে জীবনী দিয়াছেন, ইহার ১০ পৃষ্ঠার জীবনীর নিকট তাহা অকিঞ্চিৎকর। এক কথায় বলি, যদি কেহ জয়দেব চরিত জানিতে চান, গীতগোবিন্দ ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িতে চান, তবে হরিমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই গ্রন্থই তাঁহার পক্ষে সমধিক উপযোগী হইবে। পাথুরিয়াঘাটায় ৭ নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটে প্রকাশক স্বয়ং এ গ্রন্থ বিক্রয় করেন।

৬। সাম্যবাদী।—মাসিক পত্রিকা, উড়িয়া ভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু ললিত মোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। সাম্যবাদী প্রকৃতই সাম্যবাদী। ইহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে খুব উদার মত প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন আমরা প্রার্থনা করি।

৭। কর্ণধার।—মাসিক পত্র ও সমালোচন; বার্ষিক মূল্য ২৲—শ্রীহারণ চন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। আমরা তৃতীয় সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। সম্পাদকের অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ দিই। যেরূপ উৎসাহের সহিত এ পত্রিকাখানি প্রকাশিত হইতেছে, স্থায়ী হইলে দেশের মঙ্গল হইবে, আশা করা যায়। মধ্যে মধ্যে লেখা ভাল।

ক্রমশঃ।